হরর কাহিনি

শাঁখিনী

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত



প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৪

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

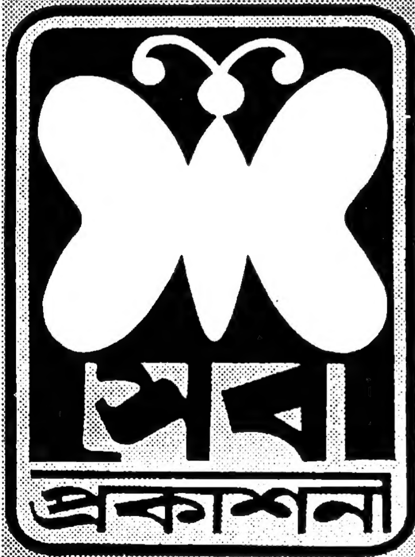
পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

SHANKHINI
A Collection of horror stories
Edited by: Anish Das Apu



একশ' দুই টাকা

সূচি

মাহবুব আজাদ
শাঁখিনী ৯

রুমানা বৈশাখী
প্রেত ৩২

রুমানা বৈশাখী
বাজনা ৪৭

আহ্সানুল করিম
ওরা ৬০

প্রিন্স আশরাফ
অপচ্ছায়া ৭৮

মুহম্মদ আলমগীর তৈমূর
কালো পাথর ৯৬

আসমার ওসমান
যারা কালো চশমা পরে ১২০

আসমার ওসমান
খাটের নীচে কী থাকে? ১২৮

সাইফুল আরেফিন অপু
খাদক ১৩৫

প্রিন্স আশরাফ
অশুভ প্রভাব ১৪২

মিজানুর রহমান কল্লোল
পিশাচ বাড়ি ১৫৭

হাসানুজ্জামান মেহেদী
রিকদানুস বাদশা ১৭২

মোঃ মুশফিকুর রহমান মিঠুক
নারকীয় ২০২

তাহমিনা সানি
অবাঞ্ছিত আবাস ২২২

অনীশ দাস অপু
সংকেত ২৪০

অনীশ দাস অপু
গুঞ্জন ২৬২

অনীশ দাস অপু
থাংগি ২৭৯

মাহবুবুর রহমান শিশির
ফেরা ২৮৮

খসরু চৌধুরী
মাদাম জান ৩০৩

সরওয়ার পাঠান
অপ্রাকৃত ৩১১

ভূমিকা

সেদিন দুপুরে বসে বসে লিখছি, এমন সময় আমার মুঠোফোনে হেলেনা পাপারিজু সুরেলা কণ্ঠে গান গেয়ে উঠে জানান দিল 'কল' এসেছে। তাকিয়ে দেখি টিংকু ভাই। তিনি ব্যস্ত মানুষ। নিশ্চয় প্রয়োজনে ফোন করেছেন। কুশল বিনিময়ের পরে একটি বিষয় নিয়ে তিনি জানতে চাইলেন। সে বিষয়ে কৌতূহল নিরসন শেষে আকস্মিকভাবেই প্রস্তাব দিয়ে বসলেন আমার সম্পাদনায় আরেকটি হরর সংকলন করার জন্য। মনে পড়ে গেল নানান কারণে গত বছর সেবা'র জন্য কোন বই লেখা হয়নি, সম্পাদিত কোন গ্রন্থও জমা দিতে পারিনি। এমনকী রহস্যপত্রিকায় লেখালেখির বিষয়েও অনিয়মিত হয়ে পড়েছিলাম। মনে পড়ল গত বছর রহস্যপত্রিকার এক নবীন লেখকের একটি হরর গল্প পড়ে এতটাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে তখনই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলাম ভবিষ্যতে আবার যখন হরর কাহিনি সম্পাদনা করব, ঐ লেখকের গল্পের প্রধান চরিত্রটি দিয়েই বইয়ের নামকরণ করব। টিংকু ভাইকে লেখাটির কথা বললাম। তিনিও স্বীকার করলেন হ্যাঁ, গল্পটি সত্যি চমৎকার লিখেছেন ভদ্রলোক। বইয়ের নামকরণের ব্যাপারেও রাজি হয়ে গেলেন। আমাকে কাজে নেমে পড়তে বললেন। আমি গল্প বাছাইয়ের কাজে নেমে পড়লাম।

আমার সম্পাদনায় এ পর্যন্ত ডজনখানেক হরর ও পিশাচ কাহিনি বেরিয়েছে। প্রতিটি বই-ই পাঠকপ্রিয়তা এবং ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে। নবীন ও প্রবীণ লেখকদের প্রচুর ভাল ভাল হরর কাহিনি ছেপেছি আমি ওইসব বইতে। কিন্তু এবারে গল্প বাছাই করতে গিয়ে একটু মুশকিলেই পড়ে গিয়েছিলাম। কারণ মনের মত ভাল গল্প পাচ্ছিলাম-না। নবীনরা ভাল লেখেন। আমি আমার সম্পাদিত গ্রন্থগুলোতে নবীনদেরকেই প্রাধান্য দিই বেশি। তবে এবারে তাঁরা আমাকে হতাশই করেছেন বলা যায়। অল্প কয়েকজন ছাড়া খুব ভাল মানের গল্প কারও কাছেই পাইনি।

ভাল, উৎকৃষ্টমানের হরর গল্প লেখা খুবই কঠিন। বিশেষ করে তা যদি হয় মৌলিক। আমি হরর গল্প পড়ার সময় নিজেকে প্রস্তুত করে নিই ভয় পাবার জন্য। আমি চাই লেখক এমন ভয়াল একটা আবহ তৈরি করবেন যা আমার শরীর হিম করে দেবে, কাহিনির শেষে থাকবে এমন চমক যা আমাকে বিহ্বল করে তুলবে। হরর কিংবা ভৌতিক গল্পে বীভৎসতা থাকলেই তা মানোত্তীর্ণ হরর কাহিনি হয়ে ওঠে না। আর গল্পের গাঁথুনি হওয়া চাই টানটান, যেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখে পাঠককে। এখন কেউ যদি গা ছমছমে হরর গল্প লিখতে গিয়ে হাস্যরসের ঝাঁপি খুলে বসেন কিংবা এমন আজগুবি কাহিনি ফাঁদেন যার আগা-মাথা কিছু নেই, সেগুলো আর যা-ই হোক 'হরর' অভিধায় অভিহিত হতে পারে না। আর সমস্যা হলো নিজেদেরকে রহস্যপত্রিকার অতিশয় জনপ্রিয় (!) বলে দাবি করা কোন কোন লেখক এ কাণ্ডটিই করেছেন যাদের 'কমেডি' হরর ভয়ের বদলে হাসি পাইয়েছে, যুক্তিহীন ফ্যাণ্টাসি আমাকে বিষম খাইয়েছে! সে যা-ই হোক, এ সমস্যায় যখন আমি পড়লাম তখন দ্বারস্থ হতে হলো আসমার ওসমান, রুমানা বৈশাখী, প্রিন্স আশরাফ, মুহম্মদ আলমগীর তৈমূর এবং মিজানুর রহমান কল্লোলদের কাছে; যাদের ওপর আমি সত্যি ভরসা করতে পারি। এঁরা কখনও নিজেদেরকে তথাকথিত 'জনপ্রিয়' বলে দাবি করেননি। কারণ চেনা বামুনের পৈতা লাগে না এবং এঁরা জানেন তাঁদের পাঠকপ্রিয়তা যথেষ্ট, ফলে নিজের ঢাক নিজে পেটানোর কোন প্রয়োজনই নেই!

পাঠক লক্ষ করবেন এবারে আমি কয়েকজন লেখকের একাধিক গল্প ছেপেছি। এর কারণ এঁদের গল্পগুলো আমার খুবই ভাল লেগেছে। এঁরা দীর্ঘদিন ধরে রহস্যপত্রিকায় লিখছেন। আমি আমার অনেক সংকলনে এঁদের গল্প ছেপেছি। কাজেই এ লেখকদের গল্পের মান সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। শুধু বলি রুমানা বৈশাখীর *বাজনা* এবং *প্রেত* আপনার গা হিম করে দেবে, প্রিন্স আশরাফের *অপচ্ছায়া* ও *অশুভ প্রভাব* দারুণ চমকিত করবে, হতচকিত হয়ে যাবেন মুহম্মদ আলমগীর তৈমূরের *কালো পাথর* পড়েও। রহস্য পত্রিকার পাঠকরা যাঁর বিচিত্র কাহিনিগুলো পড়ে রোমাঞ্চিত হতেন সেই সরওয়ার পাঠানের একটি রোমহর্ষক বিচিত্র কাহিনি *অপ্রাকৃত* এই সংকলনে সন্নিবেশিত হলো। সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা এই কাহিনিটিও আশা করি পাঠকদেরকে রোমাঞ্চিত করে তুলবে। দারুণ

শিহরিত হবেন মিজানুর রহমান কল্লোলের *পিশাচ বাড়ি* পাঠ করে। বিশেষ করে এ গল্পটির শেষাংশ গায়ের রোম খাড়া করে দেয়। কল্লোলদার কাছ থেকে এ ধরনের মৌলিক পিশাচ কাহিনি আরও চাই। তাহমিনা সানি'র *অবাঞ্ছিত আবাস* গল্পটিও বেশ ভাল।

আমি আমার সংকলনে যার গল্প সব সময় আগ্রহ নিয়ে ছেপেছি তিনি আসমার ওসমান। খুব কম লেখেন তিনি, তবে যা লেখেন তাতে রোমাঞ্চিত হওয়ার বিষয় থাকেই। এ সংকলনে দেয়া তাঁর *খাটের নীচে কী থাকে* এবং *যারা কালো চশমা পরে*-ও এর ব্যতিক্রম নয়।

এ সংকলনে আমার সবচেয়ে পছন্দের গল্পটি হলো টাইটেল স্টোরিটি। জার্মান প্রবাসী লেখক মাহবুব আজাদের কোন লেখা এর আগে আমি পড়িনি। দুর্দান্ত একটি পিশাচ কাহিনি লিখেছেন তিনি–*শিকার*। যেমন ভাষা, তেমন বর্ণনা– গায়ে কাঁপ ধরিয়ে দেয়! টিংকু ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করেই তাঁর গল্পের নাম পরিবর্তন করে *শাঁখিনী* রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ লেখকের কাছ থেকে এরকম রোমহর্ষক হরর কাহিনি আরও আশা করছি।

সেবা'র পাঠকদের কাছে আহসানুল করিম কিংবা হাসানুজ্জামান মেহেদী কম পরিচিত মনে হতে পারে তাঁরা রহস্যপত্রিকায় খুব কম লিখেছেন বলে। তবে তাঁদের গল্প দুটি (*ওরা* এবং *রিকদানুস বাদশা*) কিন্তু আমার কাছে চমৎকার লেগেছে! টিংকু ভাইও আমার সঙ্গে একমত হয়েছেন।

এ বইতে মৌলিক গল্পের পাশাপাশি কিছু বিদেশী অনুবাদ এবং বিদেশী কাহিনির ছায়াবলম্বনে লেখা গল্পও ছাপা হয়েছে। বিদেশী এই গল্পগুলো খুবই দারুণ।

প্রসঙ্গত সেবার সুলেখক খসরু চৌধুরীর অনূদিত *মাদাম জান*, রহস্যপত্রিকায় একসময় যার লেখা পড়ে মুগ্ধ হতাম সেই মাহবুবুর রহমান শিশিরের *ফেরা* কিংবা এ সম্পাদকের *থাংগি*, *গুঞ্জন* ও *সংকেত* পাঠকদের ভাল লাগবে বলেই আশা রাখি।

আমার ভক্ত-পাঠকরা গত এক বছর ধরে অনুযোগ করে আসছিলেন আমি সেবা বা রহস্যপত্রিকায় কেন অনিয়মিত হয়ে পড়েছি। আমি তাঁদের প্রতি ভালবাসা জানিয়ে বলতে চাই, আবার আমি সেবা এবং রহস্যপত্রিকায় নিয়মিত হব। আবার আপনারা আমার কাছ থেকে দারুণ দারুণ হরর,

পিশাচ কাহিনি এবং অনুবাদ উপহার পাবেন। তবে বর্তমান বইটি প্রকাশের জন্য আমার বন্ধু, সুলেখক কাজী শাহনূর হোসেন ওরফে টিংকু ভাইকে কৃতজ্ঞতা না জানালে এ ভূমিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে আমাকে হরর ও পিশাচ কাহিনি সম্পাদনায় উৎসাহ দিয়ে আসছেন। তাইতো দেখতে দেখতে বারোটি সম্পাদিত হরর গ্রন্থ বেরিয়ে গেছে। আমার নিজের লেখা বইয়ের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। তবে তাঁর উৎসাহ ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে, যেটি না থাকার কোন কারণই নেই, এ সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলবে!

অনীশ দাস অপু

শাঁখিনী

এক

হাসানুজ্জামান টের পায়, তার মুখে একটা হাসি ফুটে আছে। সেটা এই পরিস্থিতিতে তাকে খুব একটা সাহায্য করবে না, তা সে জানে, কিন্তু হাসিটা মুছতে গিয়ে কষ্ট হচ্ছে তার।

হাসানুজ্জামান দাঁড়িয়ে আছে জয়দেবপুর মোড় থেকে একটু পশ্চিমে, রাস্তার পাশে একটা অঘোষিত স্ট্যাণ্ডে। উত্তরের হিমেল হাওয়া বড় বড় কারখানার ভবনের ফাঁকে একটু খোলা জায়গা পেয়ে এসে হামলে পড়ছে তার ওপর। তবে হাসানুজ্জামানের গায়ে মোটা উলের সোয়েটার, গলায় মাফলার, কান পর্যন্ত ঢাকা টুপি, শীত তাকে কাবু করতে পারবে না। রাতের এই অন্ধকারকেও ভয় পাচ্ছে না সে, হাসানুজ্জামান নিজেও নিশাচর।

তাকে যেতে হবে এলেঙ্গা বাজার। এখন অনেক ট্যাক্সি চলাচল করে টাঙ্গাইল রোড ধরে, মাথাপিছু একটা ভাড়া দিতে হয়। বাসে চড়ার ঝক্কি পোষায় না যাদের, কিংবা কোনও কারণে ভরসা পায় না, তারাই ট্যাক্সি বেছে নেয়। আর এ চর্চাটা আছে বলেই হাসানুজ্জামান মাঝে মধ্যে হাতে কাজ না থাকলে এই সড়কে ছিনতাই করে।

তার ব্যাগের মধ্যে একটা বিদেশি পিস্তল আছে। গুলিভরা, ব্যবহারের জন্য তৈরি। তবে আজ রাতে রাস্তায় ছিনতাইয়ের জন্যে দাঁড়ায়নি সে। এলেঙ্গা বাজারে গিয়ে একটা খ্যাপ নিয়ে কথাবার্তা সারতে হবে। কালিহাতিতে এক দুর্ভাগার বডি ফেলার খ্যাপ, মক্কেল অনেক পয়সাওয়ালা লোক, আশ্বাস দিয়েছে এলেঙ্গা বাজারের পার্টি, হাসানুজ্জামানকে টাকা নিয়ে দরাদরি করতে হবে না বেশি।

সব ট্যাক্সি অবশ্য এই স্ট্যাণ্ডে থামে না। নানা হিসাব কিতাব আছে। ভেতরে মস্তান প্যাসেঞ্জার থাকলে লাইনের ট্যাক্সিও না থেমে চলে যায়। অনেক সময় লাইনের অন্য লোক ট্যাক্সি নিয়ে এসে এসব স্ট্যাণ্ড থেকে

বোকাসোকা লোকজনকে তোলে, কালিয়াকৈর পৌঁছানোর আগেই কাজ হাসিল করে নির্জন কোনও জায়গায় মারধর করে নামিয়ে দেয় শিকারকে। বেশি তেড়িয়াপনা করলে বডি ফেলে দেয় অনেকেই। হাসানুজ্জামানকেও একবার ফেলতে হয়েছিল। তবে সবকিছু সিস্টেম হয়ে গেছে এখন।

ছোটখাটো দাঁও মারলে যাত্রী-পুলিশ-সাংবাদিক কেউ গা করে না। লাইনে নতুন আসা রুস্তমরা কিছু না বুঝেই মেশিন চালিয়ে বডি ফেলে দেয়, তখন কয়েকদিনের জন্য একটু সমস্যা হয়। ঘাপলার কোনও শেষ নেই, এসব ঠেলেই কাজ চালিয়ে যেতে হয়।

পর পর দুটো লোকবোঝাই ট্যাক্সি সাঁ-সাঁ করে স্ট্যাণ্ড পেরিয়ে চলে যায়। হাসানুজ্জামান শরীরের ভর বাম পা থেকে ডান পায়ে নিয়ে দাঁড়ায়। সে একটা হোটেলে মুরগি দিয়ে ভাত খেয়েছে ঘণ্টাখানেক আগে, কিন্তু আবার মৃদু খিদে পাচ্ছে তার। স্ট্যাণ্ডের পাশে একটা চায়ের দোকান আছে, কিন্তু এখন সেটা বন্ধ। হয়তো দোকানি এই ঠাণ্ডার রাতে আজ একটু জলদি বাড়ি ফিরে কাঁথার নীচে ঢুকে বউকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাতে চায়। আর দোকানটা বন্ধ বলেই হয়তো হাসানুজ্জামানের চায়ের তৃষ্ণাটা এক লাফে অনেকখানি বেড়ে গেছে।

দূরে একটা গাড়ির আলো দেখে আবার একটু এগিয়ে দাঁড়ায় সে। আয় বাবা ট্যাক্সি, এলেঙ্গা বাজার নিয়ে যা জলদি জলদি। বাজার থেকে গরম এক কাপ চা খেয়ে পার্টির সাথে আলাপ-সালাপ শুরু করি।

নাহ, এটা প্রাইভেট গাড়ি। উল্কাবেগে স্ট্যাণ্ড পেরিয়ে চলে যায় গাড়িটা টাঙ্গাইলের দিকে। দামী জিনিস, হয়তো কোনও বড়লোকের ছেলে, যমুনা ব্রিজের রাস্তায় বেশি জোরে গাড়ি চালানোর লোভে বেরিয়েছে।

হাসানুজ্জামানকে চায়ের জন্যে আর মনে মনে হা-হুতাশ করার সুযোগ না দিয়ে এবার স্ট্যাণ্ডে এসে থামে একটা ট্যাক্সি। ইয়েলো ক্যাব, তার মানে ভেতরে যারা আছে তারা ভালো পয়সা খরচ করেই যেখানে যাওয়ার যেতে ইচ্ছুক। কালো ক্যাবের ভাড়া ইয়েলো ক্যাবের তুলনায় অনেক কম হয়, হাসানুজ্জামান যে শ্রেণীর মানুষের পরিচয় ভাঁড়িয়ে ছিনতাই করে, তারা কখনও ট্যাক্সি চড়লে কালো ক্যাবেই চড়ে।

গাড়ির ভেতর থেকে নারী কণ্ঠের চড়া প্রশ্ন শুনতে পায় হাসানুজ্জামান, 'এইখানে থামাইলেন ক্যান? অ্যাই ড্রাইভার, এইখানে থামাইলেন ক্যান?'

হাসানুজ্জামান একটু ঝুঁকে নিজের গোবেচারা চেহারাটা দেখায় গাড়ির

চালক আর পেছনের সিটে বসা আরোহীদের। সে দেখতে একেবারেই নিরীহ, মোটাসোটা, একটু খাটো, চোখে বিনা পাওয়ারের রূপালি ফ্রেমের চশমা, জড়সড় ভিতু অভিব্যক্তি চোখেমুখে। ছিনতাই করতে বেরোলে সে শিকারের সাথে আগে গল্প জমিয়ে তার ভেতরে জমে থাকা শঙ্কাটা গলিয়ে দূর করে, নিজেকে তখন দূরের কোনও মিল বা ফ্যাক্টরির অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টোরকিপার বলে পরিচয় দেয় হাসানুজ্জামান। নানা গল্পগুজবের পর শিকার যখন একেবারে ঢিল দিয়ে দেয়, তাকে হানিসাধনে অপারগ কোনও কেরানী ধরে নেয়, তখনই ছোবল মারে সে। নিজের কাজে মন্দ নয় হাসানুজ্জামান, চড়থাপড় থেকে খুনখারাপি কোনোটাই সে মন্দ চালাতে জানে না। অ্যাকশনের সময় তার সস্তা রূপালি ফ্রেমের ওপাশে চোখদুটো সরীসৃপের চোখের মতো ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে, সেটাই অর্ধেক কাজ সেরে ফেলে বেশিরভাগ সময়।

পিস্তলটার চেহারা বাকি পঞ্চাশ শতাংশ উসুল করে নেয়। কুড়িটা ঠ্যাক দিলে একটায় হয়তো প্রতিরোধ আসে, তখন পিস্তল কথা বলে।

বিগলিত কণ্ঠে সালাম দেয় হাসানুজ্জামান, 'স্লামালিকুম! ভাই কি এলেঙ্গা বাজার পর্যন্ত যাবেন?'

পেছনে নারী কণ্ঠ আবার উঁচু, চোখা গলায় বলে, 'অ্যাই ড্রাইভার, আপনি এইখানে ক্যান থামাইছেন গাড়ি?'

ড্রাইভার লোকটা সাধারণ ক্যাব ড্রাইভারের মতই দেখতে, সে পেছনে না ফিরেই বিরক্ত হয়ে বলে, 'আপা, আমার এক সিট এখনও খালি। আরেকজন প্যাসেঞ্জার লমু।'

নারীকণ্ঠ আরেক পর্দা চড়ে বলে, 'প্যাসেঞ্জার নিবেন মানে? আমরা আপনার সাথে চুক্তি করছি, আপনি আবার আরেকজনরে লইবেন ক্যান?'

হাসানুজ্জামান একটু ঝুঁকে পেছনের সিটে আরোহীদের দেখে। ট্যাক্সিতে চড়ে এই রোডে মেয়ে নিয়ে ফূর্তিতে বের হওয়া খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তবে পেছনের সিটে যারা বসে, তাদের দেখে ওই কেস বলে মনে হয় না। বছর তিরিশেকের এক যুবতী বসে, তার পাশে শান্ত শিষ্ট গোবেচারা চেহারার এক মাঝবয়সী লোক। মেয়েটার সাজগোজ বেশ্যাদের মত নয়, বেশ মার্জিতই বলা চলে, রইস ঘরের মেয়েদের মতই, দুইজন বসেও আছে ভদ্র দূরত্বে। অবশ্য আগে কী হচ্ছিলো কে জানে?

হাসানুজ্জামান সালাম দেয় আবার। 'স্লামালিকুম। ম্যাডাম, আমি একটু এলেঙ্গা বাজার যাব। আপনারা যদি পারমিশন দেন, তা হলে আপনাদের গাড়িতে একটু শেয়ারে যেতাম। আমার খুব জরুরি দরকার, ইমার্জেন্সি আছে একটা।' কথায় ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে দেয় সে সযত্নে, ভদ্রলোকের ছদ্মবেশে তুলির শেষ দাগ হিসেবে।

মহিলা তবুও একঘেয়ে চিৎকার করে, 'আমরা আপনার সাথে চুক্তি করছি, আপনি তবুও রাস্তার মাঝখানে থামাইলেন ক্যান? এইসব কী?'

পাশে বসা লোকটা ভারি গলায় বলে, 'সোনিয়া, থামো তো!'

ড্রাইভার বেশি কথা বলে না পেছনের আরোহীদের সাথে। হাসানুজ্জামানের দিকে তাকিয়ে বলে, 'এলেঙ্গা বাজার পর্যন্ত দুইশো ট্যাকা। যাইবেন?'

হাসানুজ্জামান চোখেমুখে একটা হতাশ বিরক্তি আর অনুনয়ের মিশেল ফোটানোর চেষ্টা করে। 'দুইশো টাকা? দেড়শোতে চলেন ভাই...' দুইশো টাকা খরচ করতে তার তেমন আপত্তি নেই, কিন্তু দরাদরি না করে উঠে পড়লে এরা সন্দেহ করবে।

ড্রাইভার মাথা নেড়ে গাড়িতে স্টার্ট দেয় আবার।

হাসানুজ্জামান হতাশ মুখে ক্যাবের দরজা খুলে ড্রাইভারের পাশের আসনে বসে। ড্রাইভার বলে, 'দরজা জোরে টান দেন, লাগে নাই পুরাপুরি।'

হাসানুজ্জামান দুর্বল হাতে আবার টান দেয় দরজাতে। গাড়ি এবার ঢাকা-টাঙ্গাইল রোডে উঠে পড়ে।

পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে হাসানুজ্জামান বলে, 'আপনাদের বিরক্ত করার জন্য খুব দুঃখিত। কিন্তু আমার একটা ইমার্জেন্সি...'

মাঝবয়েসী লোকটার চেহারা ক্ষণিকের জন্য একটা কারখানার সদর দরজায় জ্বলতে থাকা আলোয় দেখতে পেয়ে একটু থতমত খায় হাসানুজ্জামান। লোকটার চেহারা শান্ত, কিন্তু সে টের পায়, লোকটা নিরীহ নয়। মজবুত চোয়াল, শীতল চোখ, ঘন ভুরু। নিচু, ভারি গলায় লোকটা বলে, 'আমাদের কোনও সমস্যা হচ্ছে না।'

হাসানুজ্জামান লোকটার পাশে বসে থাকা যুবতীর দিকে ক্ষমা প্রার্থনার হাসি হাসে। 'ম্যাডাম বোধহয় খুব বিরক্ত হয়েছেন।'

সোনিয়া নামের মহিলার চেহারা রাস্তার পাশের বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত আলোয়

এক এক ঝলক দেখতে পায় সে। দেখতে ভালোই, কোনো বাড়তি সাজগোজ নেই, কিন্তু মনে হয় ক্ষেপে আছে, পিঠ সোজা করে বসে আছে, লোকটার মত হেলান দিয়ে আয়েশ করছে না।

হাসানুজ্জামানের কথার কোনও জবাব দেয় না সোনিয়া। ড্রাইভারের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে হাসানুজ্জামান। ড্রাইভারের অভিব্যক্তি বোঝার উপায় নেই আবছা আলোয়, নিবিষ্ট মনে গাড়ি চালাচ্ছে সে। সামনের পৃথিবীর অন্ধকার কয়েক গজ দূরে ঠেলে রেখেছে হেডলাইটের আলো।

পেছনে বসা লোকটা নিচু গলাতেই বলে, 'আপনি কি একাই যাচ্ছেন এলেঙ্গায়?'

হাসানুজ্জামান কিছুটা বিস্মিত হয় কথাটা শুনে। লোকটা কি ভাবছে সে আরও সাঙ্গপাঙ্গ ডেকে আনবে পেছন পেছন? নাকি নিতান্তই সাধারণ কৌতূহল থেকেই প্রশ্নটা করল?

ঘাড় ফিরিয়ে হাসানুজ্জামান বলে, 'জী। একটা ফ্যামিলি সমস্যা। খুব ইমার্জেন্সি কাজ। তাই রাতেই যেতে হচ্ছে।'

লোকটা সিটে হেলান দিয়ে বসে ছিল, খুব ধীর ভঙ্গিতে পিঠটা সিট ছেড়ে তুলে ঝুঁকে বসে হাসানুজ্জামানের মুখের কাছে মুখ এনে অনুচ্চ গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনার সঙ্গে আর কেউ যাচ্ছে এখন? নাকি আপনি একাই যাচ্ছেন?'

হাসানুজ্জামান বাম হাতে গোপনে নিজের ব্যাগের ভেতরে রাখা পিস্তলটার স্পর্শ নিল একবার। এই লোক আসলে কী জানতে চায়? এরা ছিনতাই পার্টি না তো? এই লাইনে ছিনতাই করে এমন সবাইকেই সে কমবেশি চেনে, আর সাথে মেয়ে নিয়ে ছিনতাই করার মত লোক খুব বেশি নেই এদিকটায়।

তার মুখের হাসিটা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল বলেই বোধহয় লোকটা একটু আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসে, কিন্তু হাসানুজ্জামানের অস্বস্তিটা দূর হয় না। সে ঘাড় ঘুরিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'জী একাই যাচ্ছি। আর কেউ নাই সাথে।'

সোনিয়া মুখ খোলে এবার, 'আপনি এত রাতে ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, আপনার ভয় লাগে না?'

স্বাভাবিক কথার দিকে আলাপ মোড় নিচ্ছে জেনে হাসানুজ্জামান একটু স্বস্তি অনুভব করে। 'জী, ম্যাডাম, রাতের বেলা একটু ভয় তো লাগেই। কিন্তু

মাঝেমধ্যে যেতে হয় তো, অভ্যাস আছে।'

সোনিয়া বলে, 'আমি প্রায়ই পেপারে পড়ি, এদিকে ছিনতাই হয়।'

হাসানুজ্জামান বলে, 'জী, ম্যাডাম। আমাকেও একবার ছিনতাই করেছিল কয়েকজন ইয়াংম্যান। তা ছাড়া...' নাটকীয় একটা বিরতি দেয় সে।

সোনিয়া বলে, 'তা ছাড়া কী?'

হাসানুজ্জামান ঘাড় ঘুরিয়ে সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে বলে, 'এদিকে কিছু খারাপ জায়গা আছে, ম্যাডাম।'

লোকটা বলে, 'খারাপ জায়গা মানে?'

হাসানুজ্জামান বলে, 'নানা রকম কথা শুনি, স্যর! ভূতপ্রেত, জিন-পিশাচ, এই সব আর কী।'

লোকটা চুপ করে যায়। সোনিয়া খনখনে গলায় বলে, 'হাইওয়েতে ভূতপ্রেত থাকে নাকি? ওগুলো তো জানতাম গ্রামে-গঞ্জে থাকে!'

হাসানুজ্জামান হাসে। বলে, 'হাইওয়ের দুই পাশে গ্রামই তো, ম্যাডাম! ভিলেজ এরিয়া।'

লোকটা বলে, 'খারাপ জায়গায় কী হয়?'

হাসানুজ্জামান এই গল্প তার অনেক শিকারের সাথেই করেছে। কিছু লোকের ভেতরে সহযাত্রীকে নিয়ে ভয় দূর হয় না, তখন তার মনে জিন-ভূতের ভয় ঢুকিয়ে দিতে হয়। শিকার তখন গায়েবী শত্রুকে নিয়ে চিন্তিত থাকে, তখন এক ঝটকায় পিস্তল বের করে গলায় চেপে ধরে তার জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিতে হয়। মাঝেমধ্যে অবস্থা বুঝে কয়েকটা কিলঘুসি, কপাল খারাপ থাকলে গুলি। সে সোৎসাহে বহুল ব্যবহৃত গল্পগুলো বলে যায়।

'আমি চাক্ষুষ কিছু দেখিনি, স্যর। মানে, সবসময় তো লোকজন থাকে সাথে। বাসে বা ট্যাক্সিতে করে একা একা তো যাওয়া যায় না। কিন্তু শুনেছি মাঝেমধ্যে জিন এসে লোক তুলে নিয়ে যায়। মানে, একা যদি পায়। আবার কিছু গাছ আছে রাস্তার পাশে, সেটাতে পিশাচ বাস করে। আশপাশ দিয়ে একা কাউকে যেতে দেখলে তুলে নেয়।'

সোনিয়া জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। লোকটা ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে।

হাসানুজ্জামানের ভালো লাগে এদের অস্বস্তিতে ফেলতে পেরে। লোকটা শুরুতেই একটা আচানক প্রশ্ন করে তাকে চমকে দিয়েছিল। এখন কেমন

লাগে, চান্দু?

'আমার এক কলিগের ফ্রেণ্ড, স্যর, এইখানেই হাইওয়ের পাশে একটা মিলে, স্যর, চাকরি করত। ব্যাচেলার মানুষ, স্যর, মিলের একটা হোস্টেলেই থাকত। একদিন সে রাতে একটু হাঁটতে বের হয়েছিল, স্যর। একটু বেসামাল ছিল আর কী হেঁ-হেঁ-হেঁ, মানে একটু ড্রিঙ্ক করেছিল আর কী। তো তাকে, স্যর, একটা গাছের উপর পাওয়া যায় পরে। ডেড অবস্থায়। একদম ডেড।'

লোকটা বলে, 'সোনিয়া, বাসায় বাজার আছে?'

সোনিয়া বলে, 'না, বাজার করা দরকার ছিল। করব?'

প্রসঙ্গ থেকে এরা সরে যাওয়ায় হাসানুজ্জামান একটু মনক্ষুণ্ন হয়, কিন্তু মনোযোগটাকে পেছনের সিটের দিকে রেখে সে ঘাড় ঘুরিয়ে সামনে তাকায়। শুনতে পায়, লোকটা বলছে, 'হ্যাঁ, বাজার করো। ড্রাইভার সাহেব, আমরা বাজার করব।'

হাসানুজ্জামানের কাছে একটু অদ্ভুত লাগে কথাগুলো। এত রাতে কোথায় বাজার করবে এরা? কালিয়াকৈরের আগে তো বাজার নেইও ধারেকাছে। ড্রাইভারের অভিব্যক্তিও বোঝা যায় না অন্ধকারে, সে শুধু সংক্ষেপে বলে, 'আচ্ছা।'

প্রশ্নটা হাসানুজ্জামানকে ভাবায়, এবং চিন্তায় ক্ষণিকের জন্যে ডুবে গিয়েছে সে। পেছনের সিট থেকে হঠাৎ ভেসে আসে কড়া মিষ্টি একটা গন্ধ। ওটার প্রতি এই পৃথিবীতে যতটুকু মনোযোগ দিলে বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার মধ্যে টানা দাগটা খেয়াল করা যায়, ততটুকু মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয়।

পেছনের সিট থেকে চুড়ি পরা একটা হাত সাঁড়াশির মত হাসানুজ্জামানের গলা আঁকড়ে ধরে, আরেকটা হাতে ধরা রুমাল চেপে বসে তার নাকের ওপর। রুমালটা ভেজা, তাতে একটা অসহ্য মিষ্টি গন্ধ।

হাসানুজ্জামান টের পায়, যতটুকু বাধা সে দিতে পারত, ততটুকু বাধা দেয়ার ক্ষমতা তার আর নেই। ক্রমশ তার কাছে ভারী হয়ে আসছে পৃথিবী, হাতের ওজন মনে হচ্ছে একশো কেজি। সে দুর্বলভাবে তার বাম হাতটা দিয়ে ব্যাগটা খোলার চেষ্টা করে, ওর ভেতরে আছে তার পিস্তলটা, গুলিভরা, শুধু সেফটি ক্যাচটা অফ করে ট্রিগারে টান দিলেই হবে। কিন্তু বাম হাতটা

চলতেই চাইছে না, পৃথিবীটাও মনে হচ্ছে একটা বিরাট ঢেউয়ের ওপর ভাসছে, কানে আসছে আবছা শোঁ-শোঁ শব্দ।

হাসানুজ্জামান টের পেল, ড্রাইভার লোকটা বাম হাতে একটা প্রচণ্ড কিল মারল তার পাঁজরের ঠিক নীচে, ফুসফুসের সব বাতাস বেরিয়ে গেল সে আঘাতে। হাসানুজ্জামান আবারও নিজের অজান্তেই বুক ভরে শ্বাস নেয়, সেইসাথে বুকে টেনে নেয় রুমালের অনেকখানি ক্লোরোফর্ম।

ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক ছেড়ে সে তলিয়ে যায় অচৈতন্যে।

দুই

ঠাণ্ডা।

চৈতন্য ফিরে পাবার পর হিমের অনুভূতিই হাসানুজ্জামানের সমস্ত মনোযোগ গ্রাস করে। অন্ধকার এসে হিমের জায়গাটা দখল করে কয়েক সেকেণ্ড পর। হাসানুজ্জামান অনুভব করে, ঠাণ্ডা আর অন্ধকার কোথাও শুয়ে আছে সে। তার চোখের সামনে একেবারে নিকষ অন্ধকার। সে কি অন্ধ হয়ে গেল?

উদ্বেগটা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল রক্তস্রোতে। হাসানুজ্জামান একটা হাত দিয়ে নিজের চোখ স্পর্শ করতে গিয়ে শিউরে উঠল ব্যথায়। তার ঘাড়ের পেশিতে প্রচণ্ড ব্যথা। কিন্তু ঘাড়ে আঘাত লাগার কথা স্মরণ করতে পারছে না সে।

চোখে কোনও বাঁধন নেই। কিন্তু চোখের সামনে গাঢ় অন্ধকার। হাসানুজ্জামান নিজের আঙুল দেখার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

একটা চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, ঘাবড়ে গেলে চলবে না। শুরু থেকে চিন্তা করতে হবে আবার। সে হাসানুজ্জামান, এলেঙ্গাবাজারে এক পার্টির সাথে দেখা করতে যাচ্ছিল, কালিহাতিতে একজনকে মার্ডার করার ব্যাপারে। পথে ট্যাক্সিতে তার নাকে ওষুধ ঠেসে ধরে অজ্ঞান করে ফেলে সোনিয়া নামের

মেয়েটা। এই কাজে ট্যাক্সি ড্রাইভার সোনিয়াকে সাহায্য করছিল। তার মানে পেছনের সিটের ওই লোকটা, সোনিয়া আর ড্রাইভার, তিনজন একই পার্টির লোক। তারা অজ্ঞান পার্টি, সন্দেহ নেই। বাজার করার কথা বলছিল লোকটা। ওটাই সঙ্কেত। বাজার করতে বললেই রুমালে ওষুধ ঢেলে শিকারের নাকে চেপে ধরবে সোনিয়া।

কিন্তু সে এমন অন্ধকার জায়গায় কেন? মনে হচ্ছে এটা কোনও ঘর। অজ্ঞান পার্টির লোক তাকে রাস্তার ধারে ফেলে রেখে যাবে, এমনটাই স্বাভাবিক। সে এখন কোথায়?

হাসানুজ্জামানের শরীর কেঁপে উঠল ঠাণ্ডায়। সে আবিষ্কার করল, তার হাতটা নগ্ন। সোয়েটার নেই, শার্টও নেই।

হাসানুজ্জামান হাতড়ে হাতড়ে একটা কাঁথা পেল শরীরের ওপর। একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে সে। তার নীচে তার শরীর বিবস্ত্র। হাত বাড়িয়ে জাঙ্গিয়া স্পর্শ করে থেমে গেল হাসানুজ্জামান। না, ওটা আর খোলেনি বদমায়েশগুলো। কিন্তু তার সোয়েটার, শার্ট, প্যান্ট, সবই খুলে নিয়ে গেছে। এ কেমন অজ্ঞান পার্টি? ওগুলো তো মোটেও দামি কিছু ছিল না।

উঠে বসতে গিয়ে ঘাড়ের ব্যথাটা বিদ্যুতের গতিতে ছোবল দিল গোটা পিঠে। এভাবে কতক্ষণ শুয়ে ছিল সে?

হাসানুজ্জামান টের পেল, তার শরীরের নীচে মাটি নেই। স্বাভাবিক বিছানাও নেই। খসখস শব্দ আর খোঁচা তাকে স্মরণ করিয়ে দিল খড়ের কথা। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলো সে একবার, হ্যাঁ, খড়-ই।

খড়ের গাদার ওপর তাকে প্রায় ন্যাংটো করে কাঁথা পেঁচিয়ে ফেলে রেখে গেছে অজ্ঞান পার্টির দল। একটা ক্ষীণ গোঙানির শব্দ শুনতে পেল হাসানুজ্জামান। 'উঁ!'

ডানদিকে ঘাড় ঘোরাতে গিয়ে ব্যথাটা হাসানুজ্জামানের ঘাড়ের পেশির ওপর দংশন করল আবার। অনেক দূরে কয়েকটা কমলা বিন্দু ধিকিধিকি জ্বলছে। গোঙানির আওয়াজটা সেখান থেকেই আসছে।

অন্ধকার ইতিমধ্যে হাসানুজ্জামানের চোখে খানিকটা সয়ে এসেছে, আগুন দেখে তার মনে একটা হালকা স্বস্তি ছড়িয়ে পড়ল, যাক, তার চোখের কোনও ক্ষতি হয়নি। একই সাথে হাসানুজ্জামান টের পেল, সে অনেক বড় একটা ঘরের মাঝে আছে। জ্বলতে থাকা আগুনটুকু ঘরের অন্ধকার দূর করার বদলে

তা আরও ঘন করে তুলেছে।

বাম হাত বাড়িয়ে দিতে গিয়ে পিঠের ব্যথাটা খচ করে ঘাই দিয়ে উঠল, কিন্তু হাতের তালুতে ঠাণ্ডা, কঠিন ও শুকনো দেয়ালের স্পর্শটা সে ব্যথার উপস্থিতিকে ম্লান করে দিল। হাসানুজ্জামান দেয়ালে হাত বোলাল। ইঁট নয়, পাথুরে দেয়াল, একেবারে ঢালাই করা। কোনও খাঁজ নেই। বরফের মত শীতল।

কোথায় এনে ফেলেছে ব্যাটারা তাকে?

গোঙানির শব্দটা আবার ভেসে এল আগুনের কাছ থেকে, 'হুঁ-হুঁ!'

হাসানুজ্জামান মুখ খুলে ডাক দিতে গিয়ে আবিষ্কার করল, কোনও শব্দ বেরোচ্ছে না তার গলা দিয়ে। ঠাণ্ডা ঘরে উদোম গায়ে একটা মেটো কাঁথা গায়ে শুয়ে থাকলে গলা বসে যাওয়াই স্বাভাবিক। কেশে গলা পরিষ্কার করে নেয় সে একবার, তারপর গলা চড়িয়ে ডাকে, 'কে ভাই? কে ওখানে?'

গোঙানির শব্দটা এক পর্দা চড়ে যায় এবার, 'উঁ! উঁ! উঁ!'

হাসানুজ্জামান ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত বেদনা আর মনভরা অস্বস্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, কাঁথাটা ভালমত জড়িয়ে নেয় শরীরে, তারপর এগোতে গিয়ে চমকে ওঠে। তার পায়ের নীচে বরফের মত শীতল মেঝে। শালারা তার জুতো আর মোজাও খুলে নিয়ে গেছে। সে আরও অনুভব করে, মাটি নয়, পাথুরে মেঝে তার পায়ের নীচে। দেয়ালের মতই, হিম আর শুষ্ক।

অন্ধকার চোখে সয়ে গেলেও ঘরের পরিসর আন্দাজ করতে পারে না হাসানুজ্জামান। ডানে বা বাঁয়ে ঘরটা কতদূর গেছে, বোঝার উপায় নেই। শুধু বেশ খানিকটা দূরত্বে কয়লার মিটিমিটি আগুন জ্বলছে, তার পেছনে আবার গাঢ় অন্ধকার। কোনও গুদাম ঘর হতে পারে, কোনও কারখানার স্টোর হয়তো। কিন্তু আলো নেই কেন?

'কে ভাই, ওইখানে?' আবার গলা চড়িয়ে ডাকে সে, তার পা বেয়ে মেঝের হিম উঠে আসে কণ্ঠস্বর পর্যন্ত। 'কে আপনি?'

গোঙানির শব্দটা আগের মতই মৃদু হয়ে ভেসে আসে, 'হুঁহুঁ!'

হাসানুজ্জামান অস্বস্তিভরে দুই পা এগোয়। কী ব্যাপার? মুখ বেঁধে রেখেছে নাকি লোকটার? গোঙাচ্ছে কেন? কথা বলে না কেন? 'কে? আপনি কে? এখানে কী করেন?'

এবার দূর থেকে একটা রিনরিনে, কাঁপা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আমি!'

হাসানুজ্জামান চমকে ওঠে কথাটা শুনে, কারণ কণ্ঠস্বরটা নারীর। অল্পবয়স্কা কোনও মেয়ের গলা।

এখানে মেয়ে আসবে কোত্থেকে? এরা কি নারী-পুরুষ সবাইকে অজ্ঞান করে নিয়ে আসে নাকি?

হাসানুজ্জামানের বুকটা আবারও ধুকধুক করে ওঠে, রক্তস্রোতে মিশতে থাকে অ্যাড্রেনালিন। ট্যাক্সির আবছায়ায় দেখা সোনিয়ার অবয়ব আর সেই লোকটার গম্ভীর চেহারা মনে পড়ে যায় তার। এরা সাধারণ অজ্ঞান পার্টি নয়।

নানা গুজবের কথা তার একসাথে মনে পড়ে। মানুষজনকে ধরে নিয়ে গোপনে অপারেশন করে কিডনি, কলিজা খুলে বিক্রি করে দেয়া হয়, এমন একটা খবর এসেছিল না কাগজে? হাসানুজ্জামান শুনেছে, লাশও নাকি এসিডে ধুয়ে কঙ্কাল বের করে বিক্রি করে দেয়া হয়। অনেক রকম বিজনেস নাকি আছে মানুষের বডি নিয়ে। এরা কি সেরকম কোনও পার্টি? মেয়েদের ধরে ভারতে পাচার করা হয়, সে জানে, কিন্তু সেসব মেয়েদের জোর করে বা অজ্ঞান করে ধরে আনে না কেউ, তাদের নিয়ে যাওয়া হয় বেশি বেতনে কাজের লোভ দেখিয়ে, তারপর দালালের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়, সেখান থেকে মেয়েরা চলে যায় বড় শহরের বেশ্যাপাড়ায়। কিন্তু এরা কেন অজ্ঞান করে ধরে আনছে মানুষকে?

বিদ্যুৎচমকের মত নিজের ব্যাগটার কথা মনে পড়ে তার। পরক্ষণেই হতাশায় ডুবে যায় হাসানুজ্জামান। জামা-জুতোই যেখানে খুলে নিয়ে গেছে ব্যাটারা, তো পিস্তলটা যে তার নাগালের মধ্যে রেখে যাবে না, সেটা বলাই বাহুল্য। হাতের কাছে পিস্তলটা থাকলে ভরসা পায় সে, অন্যরকম একটা সাহস পায় বুকের ভেতর। অন্ধকার, ঠাণ্ডা ঘরের ভেতর উলঙ্গ শরীরে কাঁথামুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসানুজ্জামান নতুন করে দুর্বল বোধ করে।

গোঙানির শব্দটা এবার কয়েক পর্দা চড়ে, 'হুঁহুঁ! হুঁহুঁ! হুঁহুঁ!'

হাসানুজ্জামান মাপা পায়ে সাবধানে সামনে এগোয়। অন্ধকারে কোনও কিছুর সাথে ঠোকর বা হোঁচট খেয়ে চোট পেতে চায় না সে। কিন্তু তার কেন যেন মনে হয়, এই ঘরটা একেবারেই খালি। আর কিছু এখানে রাখা নেই।

ঘরের দরজাটা খুঁজে পেতে হবে। সম্ভাবনা শতভাগ যে দরজাটা বন্ধ

থাকবে, তারপরও দেখে রাখা প্রয়োজন। এক সময় না এক সময় দরজা খুলবে ব্যাটারা, তখন একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। স্টোররুমের জানালাগুলো সাধারণত ছাদের কাছে হয়। হাসানুজ্জামান ওপরের দিকে তাকায়, কোনও জানালার আভাস তার চোখে পড়ে না।

আলো দরকার। কয়লার আগুনে কিছু খড় দিলে আগুন পাওয়া যাবে।

হাসানুজ্জামান সাবধানে এগিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কে? এখানে কীভাবে আসছেন?'

রিনরিনে তরুণী কণ্ঠ আবার বলে ওঠে, 'আমি!'

হাসানুজ্জামান সন্তর্পণে এগোয়। কয়লার মিটমিটে আগুনের পাশে একটা অন্ধকারের স্তূপ, কেউ একজন বসে আছে আগুনের পাশে।

আগুন থেকে গজ পাঁচেক দূরে থেমে যায় হাসানুজ্জামান। 'আপনি কে? নাম কী আপনার? এখানে কীভাবে আসছেন?'

আগুনের কাছেই বসে আছে মেয়েটা। হাসানুজ্জামান দেখে, তারই মত একটা কাঁথা জড়ানো মেয়েটার গায়ে। মেয়েটার শরীরের রেখা বোঝা যাচ্ছে, মাথায় চুল অবিন্যস্ত হয়ে আছে, মাথা নিচু করে বসে আছে মেয়েটা।

হাসানুজ্জামান আরও দুই পা এগোয়। 'কী নাম আপনার? বাড়ি কোথায়?'

মেয়েটা কাঁপা গলায় কী যেন একটা নাম বলে, স্পষ্ট শুনতে পায় না সে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করে হাসানুজ্জামান, 'সখিনি? আপনার নাম সখিনি?'

মেয়েটা মাথা ঝাঁকায়, 'হুঁ!'

হাসানুজ্জামান মাথা নাড়ে। গ্রামের মেয়েদের এমন নাম হতো আগে, এখন গ্রামেও মেয়েদের নাম রাখে নায়িকাদের নামে। 'বাড়ি কোথায় আপনার?'

মেয়েটা আবার গোঙায়, 'উঁ!'

হাসানুজ্জামান টের পায়, মেয়েটা শীতে কাঁপছে। একটা সন্দেহ খেলে যায় তার মাথার ভেতর। সে গলা খাঁকরে কয়েক পা সামনে এগিয়ে মেয়েটাকে ভাল মত দেখার চেষ্টা করে। তার মতই একটা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে বসে আছে মেয়েটা, কাঁথার ফাঁক দিয়ে একটা ফর্সা পা দেখা যাচ্ছে হাঁটু পর্যন্ত।

এরা কি এই মেয়েটারও জামাকাপড় খুলে নিয়েছে?

হাসানুজ্জামান একটু তৃপ্ত বোধ করে ভেতরে ভেতরে। অন্ধকার রাতে কাঁথা জড়ানো অপরিচিতা নগ্নিকার সান্নিধ্য তার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা।

সে অভয় দেয়ার জন্যে বলে, 'আমার নাম হাসানুজ্জামান। ঢাকায় থাকি, বাড়ি মানিকগঞ্জে। আপনার বাড়ি কই, বললেন না?'

মেয়েটা একটু গুটিসুটি হয়ে বসে বলে, 'এইখানেই।'

হাসানুজ্জামান হেসে বলে, 'এইখানে মানে? এই জায়গাটা কোনখানে?' এবং প্রশ্নটা তার মাথায় প্রথম বারের মত বাড়ি কষায়। কোন জায়গায় আছে তারা? ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক থেকে কোনদিকে, কতদূরে এই ঘর?

মেয়েটা প্রশ্নের উত্তর দেয় না, নড়েচড়ে বসে আবার গোঙায়, 'উঁ! উঁ! উঁ!'

হাসানুজ্জামান ঘরের চারদিকে তাকায়। সবদিকেই নিকষ অন্ধকার। কয়লা জ্বলছে ঘরের আরেক প্রান্তে, একটা চুলার মত গর্তে। গর্তটা ইঁট দিয়ে পাকা করা। মেয়েটার পেছনে আবার আস্তে আস্তে গাঢ় হয়ে গেছে অন্ধকার। ঘরটা অনেক বড়, সন্দেহ নেই।

খড় এনে কয়লার ওপর ফেললে অনেক ধোঁয়া হবে। এই ঘরের দরজা জানালা কোন দিকে, তখন একটা আন্দাজও হয়তো পাওয়া যাবে। বড় ঘর, ধোঁয়ায় শ্বাস বন্ধ হওয়ার কথা না।

হাসানুজ্জামান গলা খাঁকরে বলে, 'আপনাকে কখন নিয়াসছে এইখানে? আজকে? নাকি আরও আগে?'

মেয়েটা বলে, 'হুঁ! হুঁ-হুঁ!'

হাসানুজ্জামান মনে মনে একটু বিরক্ত হয়। কী আজব রে বাবা! মাথা খারাপ নাকি ছেমরির? একটা কথারও ঠিকমত জবাব দিতে পারে না। নামটা শুধু বলতে পারে, কোত্থেকে আসছে, কবে আসছে কিছুই বলে না ঠিকমত।

অন্ধকারে ফুটে থাকা মেয়েটার ফর্সা পায়ের দিকে চোখ পড়তে হাসানুজ্জামানের রাগ একটু পড়ে আসে। হয়তো কড়া কোনও ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করেছে মেয়েটাকে, সেটার ধকল হয়তো এখনও সামলাতে পারছে না বেচারি। কিংবা হয়তো খিদে লেগেছে তার। কয়দিন ধরে এখানে আছে কে জানে?

খিদের কথা মনে হতেই নিজের পেট মোচড় দিয়ে উঠল

হাসানুজ্জামানের। কতক্ষণ ধরে এখানে আছে সে? রাতে হোটেলে খাওয়া ভাত তো হজম হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

কয়লার আগুনের দিকে চোখ পড়তেই হাসানুজ্জামানের মনে টোকা দিল নতুন প্রশ্ন, আগুনটা জ্বালিয়েছে কে? কয়লায় আগুন ধরতে সময় লাগে, তবে অনেকক্ষণ ধরে জ্বলে। জ্বলতে থাকা কয়লার স্তূপ দেখে মনে হয়, অনেকক্ষণ ধরেই জ্বলছে আগুন। কেউ একজন আগুনটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

হাসানুজ্জামান মাথা নিচু করে বসে থাকা মেয়েটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিল, মেয়েটাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবে না সে। এখন যা জানার, তা তাকে নিজেরই মাথা খাটিয়ে জানতে হবে।

এই ঘরের ভেতর তারা দুইজন মানুষ যখন আছে, তার মানে ঘরের একটা দরজা আছে। দরজাটা খুঁজে বের করতে হবে। তারপর সেটা দিয়ে কীভাবে বের হওয়া যায়, তা ভেবে বার করতে হবে। আপাতত এটাই প্রথম কাজ। আর এই কাজের জন্যে লাগবে আলো। আলো পাবার আপাতত একটাই উপায়, কিছু খড় এনে কয়লার আগুনে ফেলে আগুনটাকে উঁচু করা, তারপর খড় পাকিয়ে মশালের মত বানিয়ে ঘরটা ঘুরে দেখা।

হাসানুজ্জামান গলা খাঁকরে বলল, 'বসেন দেখি, কী করা যায়। আপনার কি খিদা লাগছে?'

মেয়েটা খিদের কথায় একটু যেন চমকে ওঠে। তারপর মুখ তুলে বলে, 'হুঁ!'

কয়লার আগুনের আবছা আলোয় মেয়েটার মুখ দেখে হাসানুজ্জামানের বুকের ভেতরে রক্ত ছলকে ওঠে একবার। চোখ বুজে আছে মেয়েটা, কিন্তু তার প্রতিমার মত সুন্দর, ধারালো চেহারাটা বোঝা যাচ্ছে। মেয়েটা অনেক ফর্সা, সন্দেহ নেই। খাড়া নাক, ভরাট ঠোঁট, সুডৌল চিবুক, কিন্তু অভুক্ত মানুষের মুখে যে ক্লিষ্ট ভাব থাকে, সেটা পুরোমাত্রায় আছে।

হাসানুজ্জামান জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চেটে বলে, 'আপনি বসেন এইখানে। আমি দেখি একটু আগুন জ্বালাই।'

মেয়েটা আবারও মাথা নিচু করে গোঙাতে থাকে, 'উঁ! হুঁ-হুঁ!'

হাসানুজ্জামান পেছন ফেরে, তার খড়ের শয্যার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্যে। তখনই একটা আবছা আলো ছড়িয়ে পড়ে ঘরের ভেতর।

সে ঝট করে ঘুরে তাকায় আলোর উৎসের দিকে। দূরে, ছাদের কাছে একটা চৌকো অংশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একটা জানালা, বাইরে থেকে সামান্য আলো আসছে ঘরের ভেতর।

হাসানুজ্জামান শুনতে পায়, মেয়েটা এখনও গোঙাচ্ছে।

হাসানুজ্জামান শরীরে কাঁথাটা জড়িয়ে একটি গিঁঠ মেরে নেয়। হারামিগুলো ভাল বুদ্ধিই বের করেছে, পালাতে পারলেও ন্যাংটো অবস্থায় বেশি দূর যাওয়ার উপায় নেই এই শীতের মধ্যে। মানুষ কত বদমায়েশ হতে পারে, তা সে ভালো করেই জানে। কিন্তু এই ধরনের বদমায়েশির সাথে সে পরিচিত নয় মোটেও।

আলোটা ঘরের অন্ধকার মোটেও দূর করেনি, কিন্তু অন্ধকারে থেকে হাসানুজ্জামানের চোখ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তার সামনে ঘরের আকার মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে এসেছে এই আলোয়। অনেক বড় একটা ঘর, তার এক কোনায়, ছাদের কাছে জানালাটা। ঘরের দেয়াল এদিকে ইঁটের, ঢালাই করা নয়। এবং এদিকে ঘরটা পুরোই খালি। হাসানুজ্জামান চারপাশে তাকায়, আলোটা খুব বেশিদূর ছড়ায়নি, ঘরের বাকি অংশ অন্ধকারেই ডুবে আছে। কিন্তু তার মনে হয়, এটা একটা প্রকাণ্ড খালি ঘর, ওদিকেও কিছু নেই, খড়ের স্তূপ ছাড়া।

হাসানুজ্জামান দ্রুত পায়ে এগোয়। ইঁটের খাঁজে ভর করে যদি জানালা পর্যন্ত ওঠা যায়, তা হলে জানালা দিয়ে বের হওয়ার একটা উপায় হয় কি না দেখতে হবে। জানালাটা যথেষ্ট উঁচুতে, লাফ দিয়ে নামতে গেলে হাত-পা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সেক্ষেত্রে কাঁথাটা ঝুলিয়ে নামতে হবে। কিন্তু কাঁথার দৈর্ঘ্যও তো বেশি নয়। অবশ্য মেয়েটার গায়ের কাঁথার সাথে তার কাঁথাটা গিঁঠ দিয়ে দিলে বেশ লম্বা একটা দড়ির মত হবে, সেটার একমাথা কোথাও বেঁধে ঝুলে কিছু দূর নেমে বাকিটা পথ লাফিয়ে নামা যাবে।

কাঁথার নীচে মেয়েটার ফর্সা পা হাসানুজ্জামানের চোখের সামনে ভেসে উঠল। তার শরীরের রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠল আবার। মেয়েটা অনেক সুন্দর।

মাথা ঝাঁকিয়ে মেয়েটার চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দিল হাসানুজ্জামান। এখন পালাতে হবে, সবার আগে ওটাই কাজ।

জোর পায়ে এগিয়ে ঘরের কোনায় গিয়ে দাঁড়ায় সে। মেঝে কিছুটা এবড়োখেবড়ো এখানে, ঘরের অন্য অংশের মত সমতল নয়। জানালার

আলো তির্যকভাবে পড়েছে ঘরের ভেতরে, এখানটায় অন্ধকার।

ইঁটের দেয়ালে হাত বুলিয়ে খাঁজ খোঁজে হাসানুজ্জামান। হ্যাঁ, দেয়ালটাও এখানে অমসৃণ। কোথাও ইঁট সামান্য বেরিয়ে আছে, কোথাও আবার গর্ত। জানালা পর্যন্ত এরকম হলেই হয়।

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে ওপরে তাকিয়ে জানালাটা দেখে সে, তারপর হাঁটুর উচ্চতায় দেয়াল থেকে একটু সামনে বেরিয়ে থাকা একটা ইঁটের ওপর পা রেখে সাবধানে নিজের শরীরের ভর চাপায় হাসানুজ্জামান। পুরনো দেয়ালের ইঁট হঠাৎ হড়াস্ করে ভেঙে পড়তে পারে। এখন সেরকম কিছু ঘটলে নাগালের ভেতর পালানোর একমাত্র সুযোগটাও মাঠে মারা পড়বে। আর হাড়গোড় কয়টা ভাঙবে কে জানে?

পেছনে মেয়েটার গোঙানি শুনতে পায় সে আবারও, 'উঁ! উঁ!'

পাত্তা দেয় না হাসানুজ্জামান। গুনগুন করুক মেয়েটা। আগে জানালায় পৌঁছাতে হবে।

একটু একটু করে ঘরের কোণে দুই পাশের দেয়ালে ইঁটের খাঁজে পা রেখে উঠতে থাকে সে। কিছুদূর উঠে সাবধানে হাত বাড়িয়ে খাঁজ খুঁজতে হচ্ছে তাকে, শরীরটাকে মিশিয়ে রাখতে হচ্ছে দেয়ালের সাথে। একটু উনিশ-বিশ হলেই টাল হারিয়ে নীচে গিয়ে পড়তে হবে তাকে। কত উচ্চতা হবে এই ঘরের? পনেরো ফুট? কুড়ি ফুট? এরকম উঁচু থেকে বেকায়দায় নীচে পড়লে হাত-পা ভাঙবে নিশ্চিত।

হাসানুজ্জামান টের পায়, তার হাত আর পায়ের পেশিতে খিল ধরে যাচ্ছে। ইঁটের খাঁজে হাত রেখে উঠতে গিয়ে থরথর করে কাঁপছে তার বাহুর পেশি। এসব কাজের অভ্যাস নেই তার। সে মানুষ হিট করে নির্জনে বা গোপনে, সেখান থেকে শান্তভাবে নিরীহ পথচারীর মত পিস্তল লুকিয়ে হেঁটে চলে আসে। দৌড়ঝাঁপ তাকে তেমন একটা করতে হয় না এই কাজে। দেয়াল বেয়ে ওঠা তো দূরের কথা।

হাসানুজ্জামান দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিজ্ঞা করে, এখান থেকে ভালয় ভালয় উদ্ধার পেলে সে নিয়মিত ব্যায়াম করবে, সকালে উঠে দৌড়াবে কোনও পার্কে।

ওপরে ওঠার সময় নীচের দিকে তাকাতে হয় না, কে যেন বলেছিল, স্মরণ করতে পারে না সে। ঘাড় আর পিঠের পেশিতে ব্যথাটা আবার কামড়

দিয়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিয়ে যায় তাকে। হাসানুজ্জামান দরদর করে ঘামে, পিপাসায় তার গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে, টের পায় সে। ঘরের ভেতরে কোথাও কি পানি আছে? একটু পানি খাওয়া বড় প্রয়োজন।

থেমে থেমে, বিশ্রাম নিয়ে জানালা থেকে একটু নীচে এসে হাতে মসৃণ দেয়ালের স্পর্শ পায় হাসানুজ্জামান। এবড়োখেবড়ো ইঁট আর নেই, তারপর মসৃণ, ঠাণ্ডা পাথুরে সমতল দেয়াল।

একটা অসহনীয় ক্রোধ তার মাথার ভেতরে আগুন জ্বেলে দেয়। শুয়োরের বাচ্চা, দাঁতে দাঁত চেপে ফিসফিস করে গালি দেয় সে। হারামির দল একেবারে তীরের আগে তরী ডোবানোর কায়দা করে রেখেছে!

খুব সন্তর্পণে ইঁটের শেষ খাঁজটায় পা রেখে আরেকটু ওপরে ওঠে হাসানুজ্জামান। জানালার নীচের প্রান্ত ছাড়িয়ে কোনওমতে মাথাটা ওপরে তুলতে পারে সে।

জানালার ওপারে আকাশ দেখার প্রত্যাশা ছিল তার মনে, কিন্তু জানালার ওপাশে একটা ছোট ঘর। ঘরটার অর্ধেক দেখা যাচ্ছে কেবল। বামে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে, আর ডানে একটা সোফা দেখা যাচ্ছে খানিকটা। ঘরটায় আলো জ্বলছে, কিন্তু সে আলো ঘরের অন্য প্রান্তে। আর জানালাটা সাধারণ জানালার মত নয়। একটা কাঁচের পাত দেয়ালের মধ্যে বসানো শুধু, কোনও খাঁজ নেই, কব্জা নেই, কপাট নেই। হাসানুজ্জামানের হাত ইঁটের খাঁজ আঁকড়ে ধরে আছে, তার শরীরের অর্ধেক ভর তার হাতের ওপর, সে হাত আলগা করার সাহস পায় না। কাঁচের জানালায় মাথা ঠোকে সে, ঢপঢপ শব্দ হয়। সাধারণ কাঁচ নয়, টের পায় হাসানুজ্জামান।

জানালার ওপাশে দেখা ঘরটা ভালমত দেখার চেষ্টা করে সে। সোফায় কেউ বসে নেই, কিন্তু একটু পর পর নীলচে আলো এসে পড়ছে সোফার গদির ওপর, সম্ভবত টিভি দেখছে কেউ। সিঁড়িটার পাশে একটা সাইকেলের চাকা দেখতে পাচ্ছে সে, সাইকেলটা দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা। সাইকেল এত উঁচুতে ঘরের ভেতর তুলে এনে রেখেছে কেন?

প্রশ্নের উত্তরটা তাকে চাবুকের মত আঘাত করে। হাসানুজ্জামান হঠাৎ বুঝতে পারে, এই বিশাল ঘরটা মাটির নীচে। এটা একটা পাতালঘর।

ধারণাটা তাকে দুর্বল করে তোলে হঠাৎ। এই লোকগুলো তাকে একটা পাতালঘরে এনে ফেলে রেখেছে একটা মেয়ের সাথে। এতবড় পাতালঘর

যারা ম্যানেজ করতে পেরেছে, তারা সাধারণ অজ্ঞান পার্টি নয়। এরা অনেক গভীর জলের শিকারী মাছ, সে এদের তুলনায় নিতান্তই চুনোপুঁটি। এরা নিশ্চয়ই তার ব্যাগ খুলে পিস্তলটা পেয়েছে। এরা জানে, হাসানুজ্জামান সাধারণ কেউ নয়। নিশ্চয়ই এরা যথেষ্ট তৈরি হয়েই আসবে আবার। উলঙ্গ শরীরে ক্ষুধা আর পিপাসায় কাবু হাসানুজ্জামান কাঁথা জড়িয়ে কী-ই বা প্রতিরোধ করতে পারবে? আক্রমণ করা তো আরও দূরবর্তী বিকল্প বলে মনে হচ্ছে এখন।

হাসানুজ্জামান হিম দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে। তৃষ্ণায় তার বুক জ্বলছে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, বুদ্ধি হারালে চলবে না।

আবার মাথা তুলে ঘরের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করে সে। জানালায় কোনও ভারি কিছু দিয়ে আঘাত করে সেটা ভাঙা যাবে কি? কাঁচটা অনেক পুরু, খালি হাতে আঘাত করে ভাঙার প্রশ্নই আসে না। যদি ভাঙতেও পারে সে, লোকগুলো শুনতে পাবে, পালানোর সুযোগ পাবে না সে। জানালা দিয়ে পালানো যাবে না। দরজাটা খুঁজতে হবে, যে দরজাটা দিয়ে ওরা তাকে আর সখিনিকে ভেতরে ফেলে রেখে গেছে।

সখিনির গোঙানি শুনতে পায় হাসানুজ্জামান, ধীরে ধীরে অতি সাবধানে নীচে নেমে আসতে থাকে সে।

পাঁজরে বাড়ি দিচ্ছে হৃৎপিণ্ড, একটু পানির জন্যে চিৎকার করছে শরীরের সব কোষ। এরা ঘরের কোণে আগুন জ্বালিয়ে রেখে গেছে, একটু পানি কি রেখে যায়নি কোথাও?

লাফিয়ে নীচে নামার ইচ্ছাটা বহু কষ্টে দমন করে সাবধানে নামতে লাগল হাসানুজ্জামান। কিছুক্ষণ পর নেমে আসতে পারল। মাটিটা এবড়োখেবড়ো এখানে, কোথাও কোনও ধারালো কিছুর ওপর লাফিয়ে পড়লে পায়ে চোট পেতে পারে সে। এখন খুব সাবধানে থাকতে হবে, অস্থির হলে চলবে না।

সখিনি আগুনের পাশেই বসে আছে। হাসানুজ্জামান কপাল থেকে ঠাণ্ডা ঘাম মোছে কাঁথার খুঁট দিয়ে। দেরি করা চলবে না। যত সময় কাটবে, তত কাবু হয়ে পড়বে তারা। মেয়েটা তো কথাই বলতে পারছে না খিদের চোটে। আগুন জ্বেলে দরজাটা খুঁজতে হবে এখন।

হাসানুজ্জামান হনহন করে এগিয়ে যায় খড়ের বিছানার কাছে। দরজাটা

মনে হয় এপাশেই কোথাও হবে। অন্তত উল্টোদিকে কোনও দরজা নেই, টের পেয়েছে সে। একটা দরজা থাকবে এদিকে কোথাও, তারপর একটা সিঁড়ি। দরজা খুললেই চলবে না, সেটার ওপারে কারা পাহারায় আছে কে জানে, তাদেরও ফাঁকি দিয়ে পালাতে হবে।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে খড়ের স্তূপ খুঁজে বের করে দুই হাতে পাঁজাকোলা করে এক বাণ্ডিল খড় তুলে নিল হাসানুজ্জামান। খড় পাকিয়ে মশাল বানাতে হবে আগে।

দূর থেকে সখিনির গোঙানি ভেসে এল, 'উঁ!'

হাসানুজ্জামান খড়ের বাণ্ডিল হাতে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় কয়লার আগুনের দিকে। বিপুল উদ্বেগ তার ভেতরে একটু একটু করে বড় হচ্ছে, কুলকুল করে ঘামছে তার শরীর। বিপদ, অনুভব করে সে, মস্ত বিপদের মাঝে রয়েছে সে।

সখিনি চুপ করে বসে আছে, তাকে না ঘাঁটিয়ে কয়লার আগুনের ওপর সাবধানে এক মুঠো এক মুঠো করে খড় চাপায় হাসানুজ্জামান। খড়টা শুকনো, পলকেই লকলকে আগুন জ্বলে ওঠে কয়লার ভিতর। এক মুঠো খড় হাতে নিয়ে পাকিয়ে দড়ির মত তৈরি করার চেষ্টা করে সে, ওটাতে আগুন ধরিয়ে মশাল বানাতে হবে। শুকনো খড় খুব দ্রুত জ্বলে ওঠে, শক্ত করে পাকিয়ে নিলে পুড়তে সময় লাগবে।

আগুনটা উঁচু হয়ে উঠতেই সখিনি চমকে ওঠে, সে ছিটকে সরে যায় দূরে। সখিনির ক্ষিপ্রতা হাসানুজ্জামানকে বিস্মিত করে। মেয়েটা আগুন ভয় পাচ্ছে কেন এই শীতের মধ্যে?

বুকের ভেতর পিপাসাটা আবার টোকা দেয়, হাসানুজ্জামান সখিনিকে বলে, 'এইখানে কোথাও পানি আছে? খাওয়ার পানি?'

সখিনি মাথা দোলায়। 'উঁ!'

হাসানুজ্জামান বড় শ্বাস নেয়, তার বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে তৃষ্ণায়। হাতের খড়-পাকানো মশালটার এক প্রান্ত আগুনে গুঁজে দেয় সে, তারপর বাকি খড়টুকু চাপিয়ে দেয় কয়লার আগুনের ওপর।

গনগনে আগুনের শিখায় অনেকখানি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ঘরের এ প্রান্ত, হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় হাসানুজ্জামান।

সে দেখে, সখিনি উঠে দাঁড়িয়েছে।

হাসানুজ্জামান সবিস্ময়ে দেখে, সখিনি অনেক লম্বা। তার মাথা ছাড়িয়ে আরও হাতখানেক ওপরে উঠে গেছে সখিনির মাথা। প্রায় সাড়ে ছয়ফুটের মত লম্বা মেয়েটা, কাঁথাটা তার শরীরকে ঠিকমত ঢাকেনি, ফর্সা একটি উরু অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, কাঁথার আড়াল থেকে বেরিয়ে আছে সুপুষ্ট একটি স্তনের বলয়ভাগ।

কোথাও সমস্যা আছে, হাসানুজ্জামানের মস্তিষ্ক তাকে ফিসফিসিয়ে বলে।

সখিনির পেছনে আগুনের শিখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ঘরের অনেকখানি। ঘরটা শূন্য। কোনও আসবাব নেই, কিছু নেই, শুধু দেয়াল আর মেঝে। সেই মেঝেতে সখিনির ছায়া লম্বা হয়ে পড়েছে। সেই ছায়ার মধ্যে নড়ছে একটা কিছু।

মশালটা বাড়িয়ে ধরে হাসানুজ্জামান। আগুনের শিখায় সখিনির অপূর্ব মুখশ্রী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

হাসানুজ্জামান প্রথমবারের মতো দেখতে পায়, সখিনি আসলে ফর্সা নয়। সখিনির শরীরটা ফ্যাকাসে, মৃত মানুষের মত। মেয়েটা সটান দাঁড়িয়ে আছে, তার দীর্ঘ হাত দুটি শিথিল, ঝুলছে শরীরের দুই পাশে, কিন্তু সেই হাতের শেষ প্রান্তে লম্বা আঙুলগুলো বাঁকা হয়ে আছে থাবার মত, আঙুলের শেষ প্রান্তে নখ। মানুষের নখের মত নয় সে নখ, শ্বাপদের পায়ের নখের মত।

সখিনির মুখে বিচিত্র একটা হাসি ফুটে আছে, দেখে হাসানুজ্জামান। মেয়েটার চোখ বন্ধ।

খড়গুলো পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে, আগুনের উচ্চতা একটু একটু করে নামছে, সখিনির পেছনে আস্তে আস্তে এদিকে এগিয়ে আসছে ঘরের অন্ধকার। সেই ক্রমবর্ধমান অন্ধকারে সখিনির ছায়ায় নড়তে থাকা জিনিসটা কী, সেটা বুঝতে পেরে হাসানুজ্জামানের হাঁটুর কাছটা দুর্বল হয়ে ওঠে।

একটা লেজ!

সখিনির কোমরের কাছে একবার এসে ঝাপটা মারে লেজটা, সাপের লেজের মত।

সখিনি প্রথমবারের মত চোখ খুলে তাকায় হাসানুজ্জামানের দিকে। মশালের আলোয় সে চোখ দেখে হাসানুজ্জামানের শরীর কেঁপে ওঠে থরথর করে। সখিনির চোখে সাদা অংশের মাঝে উল্লম্ব সরু একটা মণি, মানুষের চোখের মত নয়, সাপের চোখের মত।

সখিনির মুখের বিচিত্র হাসিটা ক্রমশ ভয়াল হয়ে ওঠে, হাসানুজ্জামান দেখতে পায়, ধীরে ধীরে হাঁ করছে সে। তীক্ষ্ণ দুই পাটি শ্বদন্ত বেরিয়ে আসে, তার মাঝে দুই সারি এবড়োখেবড়ো হলদে দাঁত। মেয়েটার অনিন্দ্য সুন্দর চেহারাটাকে ঢেকে দেয় অপার্থিব জান্তব হাসিটা।

একটা খলখল হাসিতে ভরে ওঠে ঘর। সে হাসি মানুষের নয়।

একই সাথে ঘরের ছাদের কাছে জ্বলে ওঠে একটা আলো।

হাসানুজ্জামান এবার সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পায়। বিশাল একটি ঘরের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে সে, তার মুখোমুখি সখিনি নামের ওই জিনিসটা। তার শরীর থেকে কাঁথা খসে পড়েছে, ফ্যাকাসে উলঙ্গ একটা শরীর বেরিয়ে পড়েছে। শরীরটা মানুষের, দীর্ঘদেহী ফ্যাকাসে কোনও তরুণীর, কিন্তু শরীরের অনুপাত মানুষের মত নয়। অনেক দীর্ঘ একটি উদর এই জীবটির।

সখিনি তীক্ষ্ণ, কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'খিদা!'

হাসানুজ্জামান অনুভব করে, তার মাথার পেছনের সব চুল খাড়া হয়ে উঠেছে। এক অপরিসীম আতঙ্কে তার হাত থেকে খড়ের মশালটা মেঝেতে পড়ে যায়।

সখিনি দুই পা সামনে বাড়ে, তারপর পা ফাঁক করে দাঁড়ায়। হাসানুজ্জামান সম্মোহিতের মত দেখে, সখিনির দুই পায়ের ফাঁকে বাতাসে ছোবল দিচ্ছে লেজটা। তার হাত দুটো কনুইয়ের কাছে একটু ভাঁজ হয়ে এসেছে, আঙুলগুলো উদ্যত, তাদের প্রান্তে কর্কশ, পাথুরে নখ।

হাসানুজ্জামান অস্ফুটে বলে, 'শাঁখিনী!'

সখিনি নয়। জীবটা তার আসল পরিচয়ই দিয়েছিল তখন— শাঁখিনী। যারা মানুষ টেনে নিয়ে যায় মাটির নীচে, গাছের গর্তে, জলের নীচে, তারপর কড়মড়িয়ে খায়। ছেলেবেলায় অনেক গল্প সে শুনেছে বটে। ছিনতাই করার সময় শাঁখিনীদের গল্পও সে করেছে তার শিকারদের সাথে।

সখিনি, বা শাঁখিনী, আরও এক পা এগিয়ে এসে একটু ঝুঁকে দাঁড়ায়। তার উরুর পেশীর দিকে তাকিয়ে হাসানুজ্জামান বোঝে, লাফ দেবে জীবটা।

হাসানুজ্জামান মেঝে থেকে মশালটা কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারে শাঁখিনীর মুখের ওপর, তারপর ঘুরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগায় ঘরের কোণের দিকে। জানালাটার কাছে পৌঁছাতে হবে, যে করেই হোক!

পেছনে একটা তীব্র আর্তনাদ শুনতে পায় সে, কিন্তু ঘুরে তাকায় না। ঘরের কোণে এবড়োখেবড়ো ইঁটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাসানুজ্জামান, হাত আর পায়ে খামচে ধরে দেয়াল বেয়ে উঠতে থাকে। যে করেই হোক জানালার কাছে পৌঁছতে হবে।

দেয়াল বেয়ে উঠতে উঠতে হাসানুজ্জামানের মস্তিষ্ক আবার ফিসফিস করে ওঠে। কিছু একটা ঠিক নেই।

বাজার নেই, বলেছিল সেই লোকটা। সোনিয়াকে বলেছিল বাজার করতে। কার জন্যে বাজার?

হাসানুজ্জামানের বুকে বাড়ি খাচ্ছে তার হৃৎপিণ্ড, হাপরের মত হাঁপাতে হাঁপাতে দেয়াল বেয়ে উঠতে থাকে সে। মেঝেতে থপথপ শব্দ শুনতে পায় হাসানুজ্জামান, শব্দটা দ্রুত এগিয়ে আসছে এদিকে। পেছন ফিরে তাকায় না সে, মরিয়া হয়ে উঠতে থাকে দেয়াল বেয়ে। ইঁটের খাঁজে লেগে থেঁতলে যাচ্ছে তার হাত আর পায়ের আঙুল, কিন্তু হাসানুজ্জামান থামে না, সারা দেহের শক্তি সম্বল করে সে উঠতে থাকে।

এটা একটা পাতালঘর। এই ঘরে একটা শাঁখিনী আছে। এই ঘরে তাকে নগ্ন করে ফেলে রেখে গেছে ওরা। হাসানুজ্জামানকে তার মন ফিসফিস করে বলে, এই শাঁখিনীর জন্যেই বাজার করে এনেছে সেই লোকটা, সোনিয়া আর ইয়েলো ক্যাবের ড্রাইভার। বাজার সে নিজে। শাঁখিনীর জন্যে খাবার।

হাসানুজ্জামান দেয়ালে নখের কর্কশ আঁচড়ের শব্দ শুনতে পায়, তার শরীরের সব রোম উদ্যত হয় আতঙ্কে। দেয়াল বেয়ে উঠে আসছে শাঁখিনী, তার পিছু পিছু!

একটা কর্কশ হুঙ্কার ঘরের ভেতরটাকে কাঁপিয়ে তোলে, 'খিদা!'

হাসানুজ্জামানের চোখ ফেটে জল গড়ায়, সে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে আসে জানালা বরাবর।

কাঁচের ওপাশে তিনটা শান্ত, মনোযোগী মুখ দেখতে পায় সে। সেই লোকটা, তার শক্ত চোয়াল, চোখে নির্লিপ্ত দৃষ্টি, তার বাম পাশে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি চালক, একই রকম ভাবলেশহীন চেহারা, কিছু একটা চিবোচ্ছে সে। পান? চুইয়িং গাম? লোকটার ডান পাশে কাঁচের জানালার সাথে কপাল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সোনিয়া, তার পরনে রাতের পোশাক। সোনিয়ার মুখে একটা দুষ্টু হাসি, চোখে সরীসৃপের ক্রুরতা নিয়ে গভীর অভিনিবেশ নিয়ে সে

দেখছে পাতালঘরের ভিতরের দৃশ্য।

হাসানুজ্জামান কপাল ঠোকে জানালায়, তারপর ডান হাত তুলে কিল মারে সে মোটা কাঁচের ওপর।

'বাঁচান!' চিৎকার করে কেঁদে ওঠে সে। 'আল্লাহর দোহাই লাগে, বাঁচান আমারে! ভাই গো, বাঁচান গো ভাই! বাঁচান!'

হাসানুজ্জামানের কয়েক ফুট নীচে ঘড়ঘড়ে কর্কশ একটা রুদ্ধ অস্ফুট হুঙ্কার ঘরের কোণকে অনুরণিত করে, 'খিদা! খিদা! খিদা!'

হাসানুজ্জামান শরীরের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে ঘুসি মারে কাঁচের ওপর, কিন্তু আগের মতই শীতল, কঠিন থেকে যায় কাঁচের পাত। ওপাশে দাঁড়ানো তিনটি মানুষের মুখের অভিব্যক্তিতেও কোনও পরিবর্তন আসে না।

হাসানুজ্জামান উপলব্ধি করে, এই দৃশ্য এরা বহুদিন ধরে দেখছে। এরা জানে, এমনটা হয়। এরা জানে, এমনটাই হয়!

তিনজনই একটু ঝুঁকে আসে সামনে। সোনিয়া জিভ বের করে তার ঠোঁট চাটে, ট্যাক্সি ড্রাইভার চিবানো বন্ধ করে ঢোক গেলে, আর মাঝখানের লোকটার মুখে ফুটে ওঠে একটা পাতলা হাসি।

একটা ধারালো থাবা প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টানে হাসানুজ্জামানকে খসিয়ে আনে দেয়াল থেকে। যন্ত্রণা নয়, একটা বিষাদ গ্রাস করে হাসানুজ্জামানকে, অভিকর্ষের হঠাৎ অস্তিত্ব বিষাদকেও মুছে দেয় তারপর।

ওপরে চকচক করে ওঠে তিনজোড়া চোখ, নীচে পাতালঘরের মেঝেতে হাসানুজ্জামানকে ছিঁড়েখুঁড়ে খায় শাঁখিনী।

মাহবুব আজাদ

এক

এই কংক্রীট শহরের বুকে ঠিকমত আকাশেরই দেখা মেলে না, জোছনার দর্শন কী করে মিলবে? তবু আকাশে চোখ রেখে ব্যাপারটা অনুভব করার চেষ্টা করে রাশেদ। ভীষণ উজ্জ্বল রূপালি চাঁদটা ঠিক মাথার ওপরে। ঠিক এখনই যদি নিভে যেত এই সড়কটার সবগুলো স্ট্রিট ল্যাম্প, মার্কেটগুলোর রঙিন রঙিন আলো আর যানবাহনের হেডলাইট– তা হলে হয়তো জোছনা অবতরণ করতে পারত নগরীর বুকে। দেখতে দেখতে পিচঢালা সড়কটা হয়ে যেত রূপালি ছায়াপথ।

অবশ্য স্বপ্নই দেখা যেতে পারে শুধু। মস্ত বড় এই শহরে লাখো মানুষের লাখো স্বপ্ন যেমন ভাঙে প্রতিদিন, তেমনি পূরণও হয়। কিন্তু জোছনা ভেজার স্বপ্ন পূরণের ক্ষমতা যে এই নগরীরও নেই।

ক্লান্ত, অবসন্ন, বিষণ্ন রাশেদ একা একা হাঁটে বাড়ির পথে। কেন যেন আজকাল মনের শরীরে সরীসৃপের মত বিষণ্নতা জড়িয়ে থাকে সবসময়। দিন শেষে বাড়ি না ফেরার আগ পর্যন্ত কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। আজব সব ইচ্ছা জাগে মনে, যার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারা যায় না। অদ্ভুত অদ্ভুত সব ব্যাপারে মন অকারণ আগ্রহী হয়ে ওঠে...

বাড়ি এসে গেছে। দরজায় দাঁড়ানো আয়শার মুখটা দেখা মাত্র আজেবাজে সব ভাবনা নিমিষে উড়ে যায় মন থেকে। কী ভীষণ মিষ্টি একটা মুখ! টলটলে চোখ জোড়ার দিকে তাকানো মাত্র বুকের মাঝে বর্ষা নামে, ছড়িয়ে পড়ে স্নিগ্ধ প্রশান্তির কণা।

সত্যি বলতে কী, আয়শার মত স্বচ্ছ মনের মানুষ খুব বেশি দেখা যায় না। সোজা-সরল, নির্লোভ, নিরহংকার একজন মানুষ। আশপাশে সবাই যখন যুগের তীব্র গতির সাথে তাল মেলাতে ব্যস্ত, আয়শা তখন ডুবে আছে নিজের ভিন্ন একটা জগতে। কলুষতাবিহীন, অন্যরকম একটা জগৎ। মানুষ প্রাণীটাকে ভীষণ ভালবাসে সে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কিংবা পাড়া-

পড়শী—সকলের জন্যই তার খুব টান।

আলতো হাসে আয়শা। হাত থেকে বাজারের ব্যাগগুলো নিয়ে দরজা বন্ধ করে।

'তোমার অফিস এত কাজ করায় কেন বলো তো?'

'হঠাৎ এ কথা?'

'আজও ফিরতে দেরি হলো তোমার!'

হেসে ফেলে রাশেদ। 'শুধু অফিসকে দোষ দিচ্ছ কেন? এমনও তো হতে পারে অন্য কোথাও ছিলাম আমি। হয়তো কোনও সুন্দরীর সাথে...'

'ইস! অত সোজা? তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসতে পারোই না।'

'এত বিশ্বাস করা ভাল না, ম্যাডাম!...রোকসানা কই?'

'ঘুমাচ্ছে। তুমি ফ্রেশ হয়ে নাও। আমি খাবার দিচ্ছি টেবিলে।'

আয়শা চলে যায় কিচেনে। বাথরুমে ঢোকার আগে রোকসানার ঘরের দিকে একবার উঁকি দেয় রাশেদ। এ কদিনেই মেয়েটার চেহারা একদম ফিরে গেছে। স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে। মুখটায় ফিরে এসেছে শিশুসুলভ স্বাভাবিক চাপল্য।

এই আরেকটা ব্যাপার আয়শার। আশ্চর্য সুন্দর। রাস্তা থেকে এতিম ছেলে-মেয়ে বাড়ি নিয়ে আসে সে। বলে যে কাজের লোক হিসাবে নিয়ে এলাম। কিন্তু আসলে কাজের চাইতে আদরই করে বেশি। ওসব ছেলে-পিলেরা অবশ্য কেউ-ই বেশিদিন থাকে না। রাস্তায় রাস্তায় বেড়ে ওঠা ছেলে-পিলেদের মন কি আর চার দেয়ালের মাঝে টেকে? কিছুদিন ভালমন্দ খেয়ে, নতুন কিছু জামাকাপড় পেলেই পালায় এরা। যাওয়ার আগে চুরি-চামারিও করে বোধ হয়। তবে সেটা নিয়ে আয়শা কখনও উচ্চবাচ্য করে না। এবং হালও ছাড়ে না। আবার একজনকে খুঁজে নিয়ে আসে। এবং আশা করে এইবারের জন হয়তো তাকে ছেড়ে যাবে না। হয়তো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাশেদ।

বিধাতা তাদের একটি সন্তান কেন দিচ্ছেন না? বিয়ের পর একে একে পাঁচটা বছর পার হয়ে গেছে। এখন তো আয়শা এ ব্যাপারে কথা পর্যন্ত বলে না। বোঝাই যায়, আশা করাও ছেড়ে দিয়েছে। এবং এ-ও বোঝা যায় যে রাস্তার অনাথ শিশুগুলোকে ভালবেসে মাতৃত্বের অতৃপ্ত সাধটাই পূরণ করার

চেষ্টা করে সে।

ডাক্তারের কাছে দৌড়াদৌড়ি হয়েছে বিস্তর। দুজনের কারোরই কোনও শরীরিক সমস্যা নেই। কিন্তু...

এই একটা কিন্তুই নীরব সমস্যা হয়ে জেগে আছে পাথুরে দ্বীপের মতন, রাশেদ-আয়শার দাম্পত্যের প্রশান্ত নীল সমুদ্রে!

সম্ভবত আজীবনই থাকবে।

দুই

খিদে পেয়েছে সাংঘাতিক। আয়শা কোথায়? ও হ্যাঁ, মার্কেটে।

নিজেই এসে ফ্রিজ খোলে রাশেদ। সেরকম কিছু নেই, পাঁউরুটি আর কোল্ড ড্রিংকস ছাড়া। আয়শা ফ্রিজে রাখা খাবার কখনও রাশেদের সামনে আনে না। স্বামীর পছন্দ নয়, জানা আছে তার।

একটা প্লেটে কয়েক স্লাইস ভাজা মাংস দেখা যাচ্ছে। কী করা যায়? স্যাণ্ডউইচ করা যেতে পারে...হ্যাঁ, সেটাই সহজ। দু'স্লাইস রুটিতে পুরু করে মেয়োনিজ মাখিয়ে কয়েক স্লাইস মাংস, একটু সেদ্ধ ডিম, একটা লেটুসপাতা আর অল্প গোল মরিচ। ব্যস, রেডি টু ইট!

উম্‌ম্‌ম্‌! দারুণ!

নিজের প্রতিভায় নিজেই বিস্মিত হয় রাশেদ। রান্না করাটা তা হলে খুব বেশি কঠিন কিছু নয়। চাইলেই শেখা যেতে পারে। ইচ্ছা থাকতে হবে।

'তুমি এটা কী খাচ্ছ?' স্যাণ্ডউইচটা হাতে দেখে রীতিমত চিৎকার করে ওঠে আয়শা। 'দেখি! আমাকে দেখাও!'

'আরে, একটা স্যাণ্ডউইচই তো। ফ্রিজে যে মাংসের স্লাইস ছিল...'

'সেই মাংস দিয়ে বানিয়েছ? হায়, খোদা! ফেলে দাও। এক্ষুনি ফেলে দাও। এক্ষুনি!' নিজেই স্যাণ্ডউইচটা ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে আয়শা।

'কী হলো?' বিস্মিত রাশেদ। 'সমস্যা কী?'

'ওই মাংস খাওয়া যাবে না। অনেক দিনের পুরনো। আমি তোমাকে অন্য কিছু করে দিচ্ছি।'

'অনেক দিনের পুরনো তো ফেলে দাওনি কেন?'

'ভুলে গেছি।' উদ্বিগ্ন দেখায় আয়শাকে। 'তুমি কতটুকু খেয়েছ ঠিক করে বলো তো!'

'বেশি না। ৩/৪ টা কামড় দিয়েছি।'

এবার একটু হাসে আয়শা। 'ডায়রিয়া হলে কিন্তু আমার দোষ নেই।'

'নাহ্। এত সামান্যে কারও শরীর খারাপ হয় না।'

'হতেই পারে। মানুষেরই তো শরীর...'

আয়শার কথাই অবশ্য ঠিক হয়েছে। সত্যিই সে রাতে শরীরটা বেশ খারাপ হয়েছিল। ডায়রিয়া হয়নি, তবে বমি-টমি করে যাচ্ছেতাই অবস্থা। দুদিন অফিস কামাই হয়েছিল।

ঘটনাটা বেশ আগের। ৬/৭ দিন তো হবেই। রোকসানাকে যেদিন প্রথম বেড়াতে নিয়ে গেল আয়শা, সেদিনকার ঘটনা। শরীর ভাল হয়ে গেলেও বোধহয় মনটা হয়নি। সেদিনের পর থেকে খাবার টেবিলে বসলেই কেমন যেন অনীহা লাগে। কখনও কখনও বমি পায়। অথচ পেটে রাক্ষুসে খিদে। পুরানো, বাসি মাংস ছিল। না জানি কত রকম জীবাণু বাসা বেঁধে ছিল...

'তুমি আবার ওইসব হাবিজাবি ভাবছ?'

একটু বিব্রতই বোধ করে রাশেদ। প্রসঙ্গ বদলানোর জন্যে বলে, 'তুমি দেখছি কিছুই খাচ্ছ না। এতকিছু আমি একা খাব নাকি?'

'আমি কোন্ কালে বেশি খেতাম?'

'এত অল্প খেয়ে তুমি বেঁচে থাকো কী করে–সেটাই আশ্চর্যের বিষয়।'

কথাটা অবশ্য সত্যি। আয়শা প্রায় কিছুই খায় না। যেন অনেকটা নিয়ম রক্ষার জন্যেই খাবার টেবিলে বসে। ভাত-ডাল-সবজির মত স্বাভাবিক সব খাবারে তার ভীষণ অনীহা। প্রিয় হচ্ছে কোল্ড ড্রিংকস, চকলেট আর কালো কফি। প্রিয় বললেও কম বলা হবে। এই তিনটা আয়শার প্রধান খাদ্য।

'তুমি এটা একটু ট্রাই করে দেখো তো!' ফ্রিজ থেকে ছোট্ট একটা বাটি বের করে দেয় আয়শা। 'একটু খেয়ে দেখো। মনে হয় ভাল লাগবে। কদিন যাবৎ তো একদম না খেয়ে আছ।'

খাবারটা এমন আহামরি কিছু না। ছোট ছোট মাংসের টুকরা। মশলায় কালো রঙ হয়ে গেছে। রঙ আর গন্ধ–দুটোই আচারের মত।

'এটা তো আচার মনে হচ্ছে।'

'আচার-মাংস বলে একে। তুমি একটু খেয়েই দেখো না। ভাল লাগবে।'

সত্যিই তাই। ভীষণ ভাল লাগে রাশেদের। অনেকদিন পর আরাম করে খেতে পারে সে। মন ভরে, পেটপুরে। মাংসটা কাঁচা না রান্না করা, সে নিয়ে মোটেও মাথা ঘামায় না।

একটু লক্ষ করলেই রাশেদ দেখতে পেত যে তার স্ত্রীর চোখে ভর করেছে অন্য রকম আলো। কীসের যেন সংকেত দুচোখের সেই আলোয়!

তিন

অফিসে আজকাল একদম ভাল লাগে না। একটুও মন বসে না কাজে। শরীর খারাপ লাগলে কারই বা কাজ করতে ইচ্ছা হয়?

'তোর চেহারার কী হাল হয়েছে দেখেছিস?' কোমল কণ্ঠে বলে সুমন। বন্ধু, কলিগ। 'আমার মনে হয় ক'টা দিন ছুটি নে। বাসায় শুয়ে-বসে থাক। অথবা ভাবীকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যা।'

'কী লাভ? এত ডাক্তার দেখালাম, কেউ তো কোনও শারীরিক সমস্যা খুঁজে বের করতে পারে না। বলে—সমস্যা আপনার মনে।'

'মনের সমস্যা হলে কেউ এমন শুকিয়ে কাঠ কাঠ হয়ে যায়?'

'আমি জানি না। আমার কিছু খেতে ভাল লাগে না। খাবার দেখলেই বমি পায়। কোনরকম চা-কফি খেয়ে বেঁচে আছি।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে সুমন। তারপর বলে, 'মানসিক চিকিৎসক দেখিয়েছিস?'

'হুঁ। তবে লাভ কী? একগাদা ঘুমের ওষুধ দিল শুধু।'

'ভাবী কী বলে?'

'তোর ভাবী সারাদিন কান্নাকাটি করে। নিজেকে দোষ দেয়। বলে, সে বেখেয়াল বলেই নাকি পচা মাংসগুলো ফ্রিজে রয়ে গেছিল।'

'বেচারী! এমনটা ভাবতেই পারে। তোকে যা ভালবাসে! কপাল নিয়ে এসেছিলি দুনিয়ায়।'

'আর কপাল! আজকাল মনে হয় আয়শাকে একা ফেলে মরে-টরে না যাই।'

'যা ব্যাটা, আজেবাজে কথা বলিস না। সবকিছুই তো করে দেখলি,

এখন আমার সাথে এক জায়গায় যাবি?'

'কোথায়?'

'গেলেই দেখতে পাবি। সন্ধ্যায় যাব। অফিসের পর।'

ঠিক সন্ধ্যায় নয়, অফিস থেকে বেরোতে বেরোতে আটটা বেজে যায়। তবু সুমন নাছোড়বান্দা। ঠিকই রাশেদকে ধরে নিয়ে যায় সে। এমন একটা জায়গা, যেখানে প্রবেশের কথা চিন্তাও করতে পারে না রাশেদ।

সরু, নোংরা গলি। দুপাশে ছাপরা ঘর। ডাস্টবিনের উৎকট গন্ধ বস্তির সর্বত্র। প্যাচপেচে কাদা গলিতে। হাঁটতে গেলে জুতো দেবে যায়।

যে ঘরে লোকটার দেখা মেলে, তারও বাইরের অবস্থা একই রকম। আর ভেতরে প্রবেশ করতেই সম্পূর্ণ অন্য পৃথিবী। মোটা কার্পেট পাতা মেঝেতে। বিবর্ণ, পুরানো। সিলিংয়ে ঝোলানো পুরানো ঝাড়বাতিও ছড়াচ্ছে ম্লান আলো। এ ছাড়া ঘরটিতে আসবাব বলতে শেলফের পর শেলফ ভরা বই আর ঝাড়বাতির নীচে পাতা সেগুন কাঠের চওড়া টেবিলটা। যার অপর প্রান্তে বসা বৃদ্ধও সাজসজ্জার মতই প্রাচীন।

'আসসালামু ওয়ালাইকুম, বাবারা।' ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে বলেন তিনি। ইশারায় বসার ইঙ্গিত করেন।

সুমনের সাথে বৃদ্ধের সৌজন্য বিনিময়সূচক কথা হয় কিছু সময়। রাশেদকে নিয়েও কথাবার্তা হয় বিস্তর। কিন্তু কিছুই পৌঁছায় না রাশেদের মস্তিষ্ক পর্যন্ত। নিজেকে কেমন জড় পদার্থের মত লাগে।

একসময় রাশেদের দুটো হাত ধরেন বৃদ্ধ। আর হাত দুটো ধরে ঝিম মেরে বসে থাকেন দীর্ঘসময়। ঘরের কোথায় যেন ধূপ জ্বেলে দিয়ে গেছে একজন। জঘন্য লাগছে গন্ধটা!

'তোমার বাসার মানুষদের মাঝে একজন আছে...'

কথা শেষ করতে পারেন না বৃদ্ধ। তার আগেই সুমন বলে ওঠে, 'ওর বাসায় আর মানুষ কই! স্রেফ ও আর ভাবী।'

'আর কেউ নেই?' এবারও রাশেদকেই প্রশ্ন করেন তিনি।

'আছে। একটা মেয়ে আছে এখন। রোকসানা।' ক্ষীণ সুরে বলে রাশেদ। 'আমরা নিঃসন্তান। মাঝে মধ্যেই আমার স্ত্রী রাস্তার ছেলেমেয়েদের নিজের কাছে এনে রাখে। ভীষণ ভালবাসে তাদের। ওদের নিয়েই আয়শার দিন কাটে।'

'তোমার কিছু খেতে ভাল লাগে না, তাই না?'

'সেদিন সেই পচা মাংস খাওয়ার পর থেকে...সবসময় মনের ভেতর অস্থির লাগে। কোন কাজে আগ্রহ পাই না। অসম্ভব ক্লান্ত শরীর।'

'তা হলে সবার আগে তোমার প্রয়োজন খাদ্য এবং বিশ্রাম।' বলতে বলতে ভেতর বাড়ির দিকে রওনা হন বৃদ্ধ।

সাথে সাথে বাধা দেয় রাশেদ।

'আপনি কষ্ট করবেন না, চাচা। আমি সত্যি কিছু খেতে পারি না।'

মৃদু হাসেন তিনি, 'দেখা যাক, আমি পারি কি না তোমার পছন্দসই কিছু খাওয়াতে!'

চার

টেবিল ভরে সাজানো হয় নানান পদের খাদ্য সামগ্রী। অতিথি আপ্যায়নের চূড়ান্ত আয়োজন। সুমন তো খুশি হয়েই প্লেট টেনে নেয় কাছে, কিন্তু রাশেদের দেখেই অসহ্য লাগতে শুরু করে। কয়েক রকমের কাবাব, নানরুটি, নানা রকম মিষ্টি-ফিরনী কিংবা শরবত–সব দেখেই বমি বমি ভাব হয়। ইচ্ছা হয় ছুটে পালিয়ে যেতে।

মৃদু হাসেন বৃদ্ধ। ভেতর বাড়ি থেকে পৃথক একটা প্লেট এনে রাখেন রাশেদের সামনে। মাথায় হাত রাখেন কোমল ভঙ্গিতে।

'তুমি ক্ষুধার্ত, বাবা। খাও! নিঃসংকোচে খাও। না খেলে মানুষ বাঁচবে কী করে? তুমি খাও।'

সত্যিই তাই করে। খাবারটুকুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রাশেদ। খাবারটা ভালই। সেদিন রাতে আয়শার দেয়া মাংসের মত অত ভাল না। তবে ভালই। অন্তত দীর্ঘদিন পর কিছু খেতে তো পারা যাচ্ছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হয়। রাক্ষুসে খিদেটা মিটে যেতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রাশেদ। রাত হয়েছে অনেক, সুতরাং বিদায় নেয় সুমন। সত্যি বলতে কী, বৃদ্ধ তাকে সরাসরিই বলেন চলে যেতে। রাশেদের সাথে একান্তে কথা বলতে চান তিনি। কিছু কথা কারোর সামনেই বলা যায় না।

বুদ্ধিমান সুমন অবশ্য এতে কিছু মনে করে না। জানিয়ে যায়, গলির সামনে পান-সিগারেটের দোকানে অপেক্ষা করবে সে।

'আমাকে কী খাওয়ালেন আপনি, চাচা?'

আবার হাসেন বৃদ্ধ। 'তোমার ভাল লেগেছে?'

'হ্যাঁ। অনেকদিন পর কিছু খেতে পেরেছি। জিনিসটা কী ছিল?'

'গরুর মাংস...কাঁচা গরুর মাংস! মশলায় মাখানো।'

আঁতকে ওঠে রাশেদ। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, আঁতকে উঠলেও ঘেন্না হয় না একটুও। বমিও করতে ইচ্ছা হয় না। বরং পেট পুরে খাওয়ার পর শরীরে ছড়িয়ে যাওয়া আরামদায়ক উষ্ণতাটা একরকম উপভোগই করে।

'এটা কী করে সম্ভব? এতকিছু থাকতে কাঁচা মাংস কেন ভাল লাগবে?'

'লাগতে পারে, বাবা। লাগতেই পারে। পৃথিবীতে আমাদের জ্ঞানের সীমার বাইরে কত কিছু আছে। সব কি আমরা জানি?'

'কিন্তু...What's wrong with me?'

'উত্তেজিত হয়ো না, বাবা। হয়তো তোমাকে একটুখানি ব্যাখ্যা করতে পারব আমি। কিন্তু বেশি না।' একটু দম নেন বৃদ্ধ। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেন। 'অনেক বছর আগে একজন মহিলা এসেছিলেন আমার কাছে। কমবয়সী গৃহবধূ, গর্ভবতী। সন্তান গর্ভে আসার পর থেকেই তার শুধু কাঁচা খাদ্য খেতে ইচ্ছা করত। অন্য কিছু নয়, শুধুমাত্র মাংস।'

'কিন্তু কেন?'

'আমি ঠিক জানি না। চেষ্টা করেছি, জানতে পারিনি। প্রতিটি মানুষের মাঝে কোথাও না কোথাও একটা অন্ধকার জগতের অস্তিত্ব থাকে। আমরা যতই চেষ্টা করি, একে অস্বীকার করা সম্ভব না। আমার মনে হয়, কোনও বিশেষ ঘটনা এই অন্ধকার অংশকে জাগিয়ে তুলতে পারে। সেই মহিলার সাথে সেরকম কিছু ঘটেছিল। তোমার সাথেও ঘটেছে। আমার সেরকমই ধারণা।'

'সেই পচা-বাসি মাংস খাওয়ার ঘটনা...'

'হ্যাঁ, হয়তো সেটাই। কিন্তু তা কোন সাধারণ মাংস হয়ে থাকলে তেমনটা হবার কথা নয়।'

'তা হলে?'

'অনেক প্রেত সাধকেরা কাঁচা মাংস খেয়ে থাকে। সেটাই তাদের প্রধান

খাদ্য...আমার মনে হয় তোমার বাসায় এমন কেউ আছে, যে প্রেত সাধনা করে।'

'কিন্তু আমার বাসায় তো...'

'আমি জানি। তুমি আর তোমার স্ত্রী আছে শুধু।'

'তা হলে...তা হলে কি, আয়শা?'

'হতে পারে। অসম্ভব কিছু না। এটা একটা মানসিক সমস্যা। ঠিকমত চিকিৎসা করালে ভাল হয়ে যাবে।'

'কিন্তু আমার কী হবে?'

'তোমার সমস্যাটার সমাধান তোমার নিজের হাতে। তুমি ইচ্ছা করো, নিজের অন্ধকার জগতের পথ রোধ করে দাঁড়াও...'

আরও অনেক অনেক কথাবার্তা হয়। কিছু বুঝতে পারে রাশেদ। কিছু পারে না। নেশাগ্রস্ত মানুষের মত এলোমেলো পদক্ষেপে বেরিয়ে আসে, খুঁজে বের করে সুমনকে।

'উনি কী করেন, সুমন? ওনার পেশা কী?'

হাসে সুমন। 'কার কথা বলছিস?'

'ওই যে...ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক!'

'তার আগে বল, তোর সমস্যাটা মিটেছে? শরীর খারাপ ভাবটা কমেছে?'

'হ্যাঁ।'

'মাথা ঘোরা কমেছে? আর ক্লান্ত লাগছে না তো?'

'একদম না।'

'বমি বমি ভাবটা গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'উনি কী বলেছেন তোকে?'

'বলেছেন, পুরো ব্যাপারটা আমার হাতে। আমার ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভরশীল।'

'খুব ভাল কথা। দেখ তো, এটা খেতে পারিস নাকি।' বলে একটা ক্যাণ্ডিবার রাশেদের দিকে বাড়িয়ে দেয় সুমন। রাশেদের প্রিয় ক্যাণ্ডিবার।

খাওয়া যায় সহজেই। খেতে ভালও লাগে। রিকশা করে যেতে যেতে এক ক্যান পেপসি আর দুটো বেনসনও সাবাড় করা হয়। মনটা ভীষণ ফুরফুরে লাগে রাশেদের।

যাক্ বাবা, সমস্যা তো মিটেছে!

'থ্যাংকস, দোস্ত!' ভীষণ আন্তরিক কণ্ঠে বলে রাশেদ। 'তোর জন্যে যন্ত্রণাটার হাত থেকে মুক্তি পেলাম আমি। তুই যদি ভদ্রলোকের কাছে না নিয়ে...'

মিটিমিটি হাসে সুমন। 'ওনার পেশা কি জানিস?'

'কী?'

'ঝাড়-ফুঁক। মানে ভূত-প্রেতে ধরা মানুষের "চিকিৎসা" করেন আর কী।'

ভীষণ বিস্মিত হয় রাশেদ। 'How silly! তুই আমাকে ভূতের ওঝার কাছে নিয়ে গিয়েছিলি। একবিংশ শতাব্দীতে এসব কথা কেউ বিশ্বাস করে?'

'করার প্রশ্নই উঠে না। আমি শুধু তোকে একটা ঝাঁকি মারতে চেয়েছিলাম। মেডিকেল সায়েন্সের প্রতি ভরসা হারিয়ে ফেলেছিলি। তাই ভাবলাম উদ্ভট একটা জায়গায় রহস্যময় পরিবেশ আর অন্যরকম একটা মানুষ হয়তো নিজের প্রতি তোর বিশ্বাসটা ফিরিয়ে দিতে পারবে। এই বৃদ্ধের কথা বলার ভঙ্গিটা সাংঘাতিক। যাই বলে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে।'

সুমন লক্ষ করে না, কিন্তু খুব সাবধানে বুকে জমে থাকা দূষিত ভাবনাগুলো বের করে দেয় রাশেদ। সত্যিই তো, একটা লোক বলল আর আয়শাকে নিয়ে আজেবাজে ভাবনা ভাবতে শুরু করে দিল সে? এর চাইতে আহাম্মকি আর হতে পারে না!

ভূতের ওঝা!!

ভাবতে গিয়ে নিজেরই হাসি পায় রাশেদের। সুমনের নিশ্চয়ই নাটকটার পিছনে বেশ কিছু টাকা পয়সা খরচ হয়েছে। এমনিতে দিলে নেবে না। পায়ে ধরে সাধলেও না। সুতরাং ভাল দেখে একটা উপহার কিনে দিতে হবে...

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বাসায় পৌঁছে যায় রাশেদ। রোকসানার জ্বর এসেছে। মাথার কাছে বসে কপালে পানি পট্টি দিচ্ছে আয়শা। একটু পরপর চোখ মুছছে। সেবা করবে কী, নিজেই কাঁদতে কাঁদতে অস্থির বেচারী।

গভীর ভালবাসা নিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে রাশেদ। পৃথিবীতে এত মমতাময়ী বোধহয় অন্য কোন নারী নেই!

পাঁচ

খুব সন্তর্পণে ঘটে ব্যাপারটা। বুঝি বাতাসও কিছু আঁচ করতে পারে না।

শরীরের নিবিড় সান্নিধ্যে ছিল আয়শা, নিঃশ্বাসের একান্তে। গভীর রাতের বুকে ভালবাসার গল্প বুনে যাচ্ছিল দুটো শরীর। সরব নীরবতায়...

যেন হঠাৎই বদলে যায় আয়শার অপরূপ মুখটা। হিংস্র থেকে হিংস্রতর হয়...

যেন...যেন মানুষের মুখটা বদলে হয়ে যায় কোন জানোয়ারের মুখ। কোন পিশাচের মুখ। কোনও...কোনও প্রেতের চেহারা!

প্রাণীটা উঠে বসে বুকের ওপরে...দম বন্ধ হয়ে আসে... একটুখানি অক্সিজেনের আকাঙ্ক্ষায় আঁকুপাঁকু করে জোড়া ফুসফুস...

লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসে রাশেদ।

উফ!!

কী ছিল ওটা? স্বপ্ন? স্বপ্ন এত ভয়াবহ রকমের বাস্তব হতে পারে?

এখনও আফ্রিকান ড্রাম বাজিয়ে যাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। ঘামে ভিজে উঠেছে পুরো শরীর, কাঁপছে একটু একটু। এত ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন এ জীবনে অন্তত আর দেখা হয়নি।

আয়শা? আয়শা কোথায়? বোধ হয় রোকসানাকে দেখতে গেছে...

'আমাকে এক গ্লাস পানি দিয়ে যাও না প্লিজ!' গলা উঁচিয়ে স্ত্রীকে অনুরোধ করে রাশেদ। আবার শুয়ে পড়ে বিছানায়। মনটা ভীষণ দুর্বল লাগছে।

ভূতের ওঝার প্রভাব ভালই হয়েছে দেখা যাচ্ছে। আজেবাজে স্বপ্ন দেখছে মন...

আয়শা এল না কেন?...বোধহয় টয়লেটে।

অগত্যা পানির আকাঙ্ক্ষায় নিজেকেই উঠতে হয়। ইচ্ছে করে না, পা দুটো চলতে চায় না। তবু উঠতে হয়।

বেডরুমের পর ড্রইংরুম। মাঝে সরু প্যাসেজ পার হয়ে খাবার ঘর। যাবার পথে রোকসানার ঘরে একবার উঁকি দেয় রাশেদ। নাহ্, আয়শা নেই। রোকসানাও না। কোথায় গেল মেয়েটা। কী একটা দেখে ভয় পেয়েছিল।

ভয়ের কারণেই জ্বরটা এসেছে। অন্তত জ্বরের ঘোরে মেয়েটার প্রলাপ শুনে সেটাই মনে হয়েছে। ছোট মানুষ। ভয় পেতেই পারে।

কিন্তু এখন গেল কোথায়?

ডাইনিং হলেও কেউ নেই। গ্লাসে পানি ঢালে রাশেদ। ঠাণ্ডা পানি খেতে ইচ্ছা করছে। বরফ কোথায়?

কোথায় আবার, অবশ্যই ডীপফ্রিজে। নিজের আহাম্মকিতে নিজেরই হাসি পায়। আসলে আয়শা তার এত খেয়াল রাখে যে এক গ্লাস পানিও কখনও নিজে ঢেলে খেতে হয় না।

প্রথমে ব্যাপারটা লক্ষই করে না। বরফ বের করে বন্ধ করে দেয় ডীপফ্রিজের ডোর। কী মনে হতে পরক্ষণেই আবার খোলে...

হায় খোদা!!

হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে এসে আটকে যায় পলিথিনে জড়ানো বস্তুটা দেখে। বস্তু নয়, একটা মাথা। মানুষের ছিন্ন মস্তক! মুখটাকেও চিনতে পারে রাশেদ। রোকসানার আগে যে ছেলেটা ছিল। সোহাগ নাম।

কিন্তু...কিন্তু আয়শা যে বলেছিল চুরি করে পালিয়ে গেছে সোহাগ...

উফ!!

মাথাটা এলোমেলো লাগছে। মেঝের উপরই বসে পড়ে রাশেদ। সোহাগের কাটা মুণ্ডু থেকে কিছুতেই চোখ সরাতে পারে না। ছেলেটার লম্বা চুলে জমাট বেঁধে আছে শুভ্র বরফ কণা...

কী করে আয়শা এদের? খেয়ে ফেলে? সেটাই হবে, না হলে বাকি শরীরটা কোথায়?

তা হলে...তা হলে ভুল করে সেদিন মানুষের মাংস খেয়ে ফেলেছিল সে? আর তারপর থেকে...

তারমানে সেদিনকার সেই আচার-মাংস নামের বস্তুটা ছিল আসলে মানুষের মাংস? এই...এই সোহাগের মাংস?

কেঁদে ফেলে রাশেদ।

কল্পনা-সীমার অনেক উর্ধ্বের কোন আতঙ্কে মানুষ এ ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারে।

আয়শা নামের পিশাচটার সামনে সে তো ভীষণ তুচ্ছ এক মানুষ! স্রেফ একজন রক্ত-মাংসের মানুষ।

ছয়

ছাদের দরজাটা বন্ধ। তবু রাশেদ নিশ্চিত, আয়শা ছাদেই আছে। অন্য কোথাও নয়।

ওদের ফ্ল্যাটটা পাঁচ তলায়, তারপরেই ছাদ। ছোট্ট একটা কামরা আছে ছাদে, বাড়িওয়ালাকে এটার জন্য আলাদা করে এক হাজার টাকা দিতে হয়। বাচ্চাদের খেলার ঘর বানাবে বলে আয়শা অনেক জোরাজুরি করে ঘরটা ভাড়া নেবার ব্যবস্থা করেছিল।

আস্তে ধাক্কা দিতেই খুলে যায় ছাদের দরজাটা। পায়ে পায়ে সামনে এগোয় রাশেদ। খেলার ঘরে আলো জ্বলছে। আর মন বলছে ভীষণ অশুভ কিছু অপেক্ষায় আছে চার দেয়ালের ওই ইটের খাঁচায়।

ভয় হচ্ছে?

হ্যাঁ, হচ্ছে। কিন্তু তার চাইতেও অনেক বেশি তীব্র রোকসানাকে রক্ষা করার ব্যাকুল ইচ্ছাটা। ছ-সাত বছরের বাচ্চা মেয়েটা কিছুতেই কোন পিশাচের খাদ্য হতে পারে না। কিছুতেই না!

রাশেদ জানত তাকে ভীষণ কুৎসিত কিছু দেখতে হবে। তবু হাট করে খোলা দরজার ওপাশে যে দৃশ্য দেখতে পায়, সেটা হার মানাতে বাধ্য কল্পনাকে...

হ্যাঁ, খেলার ঘরই। রঙিন দেয়াল, কার্পেটময় ছড়ানো খেলনা, ছবি আঁকার খাতা, রঙ পেন্সিল...আর সবকিছুর মাঝে সস্তা প্লাস্টিকে মুড়ে ফেলে রাখা রোকসানার শরীরটা।

মরে গেছে?

না, এখনও নয়। তবে বেশি দেরিও বুঝি নেই। পা জোড়া বাঁধা জানালার সাথে, মুখে আটকানো চওড়া স্কচটেপ। ঝরঝর করে অশ্রু গড়াচ্ছে দুচোখ বেয়ে। আর হাত...ডান হাতটা কেটে নেয়া হয়েছে কনুই বরাবর। ঠিক কেটে নয়, যেন ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। যন্ত্রণায় কাটা মুরগীর মত শরীর মোচড়াচ্ছে বাচ্চা মেয়েটা।

আর আয়শা?

কার্পেটের উপরই বসে আছে পিশাচটা। কী শান্ত, স্থির ভঙ্গি! হাতে একটা প্লেট, পাশে রাখা পেপসির ক্যান। ভীষণ আয়েশী ভঙ্গিতে রোকসানার ছিঁড়ে নেয়া হাতটা চিবুচ্ছে সে, যেন কোন মুরগীর রান।

হ্যাঁ, রোকসানার হাতটাই খাচ্ছে সে। রক্ত যাতে শাড়িতে না লাগে সেজন্য কোলের উপর বিছানো ন্যাপকিন। একটু পরপর পেপসির ক্যানে চুমুক দিচ্ছে আর মিষ্টি করে হাসছে রোকসানার দিকে তাকিয়ে।

'...ভয় পেয়ো না, সোনামণি! আর একটু কষ্ট করো। প্লিজ!...কী করব বলো। তোমার যেমন খিদে পায়, আমারও তো পায়। তুমি খাও ভাত মাংস, আর আমি খাই তোমাকে। এটাই তো পৃথিবীর নিয়ম, তাই না?...একদম চিন্তা কোরো না তুমি। আমি খুব সুন্দর ভাবে পিস্ পিস্ করে কাটব তোমাকে। রানের মাংসগুলো রাখব বিরিয়ানী রান্নার জন্য, আঙুলগুলো নিয়ে হবে ফিঙ্গার ফ্রাই। মগজটা দিয়ে যে কত ভাল ভুনা তৈরি করতে পারি আমি, তুমি ভাবতেও পারবে না...'

রাশেদকে দেখে মোটেও ব্যস্ত হয় না আয়শা। মোহনীয় হেসে কাছে ডাকে, 'খুব ভাল হয়েছে, তুমি এসেছ। একবার খেয়ে দেখো, তোমার সমস্ত অসুখ ভাল হয়ে যাবে। বমি পাবে না, মাথা ঘুরবে না...'

সেই হাসির সম্মোহনে সত্যিই কাছে যায় রাশেদ, ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। আর গভীর চুম্বনে তাকে আরও বেশি সম্মোহন করে আয়শা। রাশেদের জিভ পায় আয়শার ঠোঁটে লেগে থাকা রক্তের আস্বাদ। যেন ঝনঝন করে ওঠে শরীরের সমস্ত রক্তকণিকারা...তীব্র সেই স্বাদে!

খাওয়া ভুলে রাশেদের আরও ঘনিষ্ঠ হয় আয়শা। প্রচণ্ড শারীরিক আবেগে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়। সম্মোহিত রাশেদও ভুলে যায় পারিপার্শ্বিকের কথা, রোকসানার কথা। কামনায় অস্থির নগ্ন দুটো শরীর মিলিত হয় রোকসানার পড়ে থাকা দেহটার পাশেই। শুধু এক মুহূর্তের জন্য...

এক মুহূর্তের জন্য শুধু রাশেদের দৃষ্টি আটকায় বাচ্চা মেয়েটার মুখের দিকে, অবহেলায় পড়ে থাকা মাংস কাটার চাপাতির দিকে। সেদিকেই ধীরে ধীরে হাতটা বাড়ায় সে...

ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে আয়শার দুভাগ হয়ে যাওয়া গলা থেকে,

রাশেদের মুখটা মাখামাখি হয়ে যায়। তার শরীরের নীচে আয়শার নগ্ন শরীরটা তখনও উত্তপ্ত, দৃষ্টিতে ফুটে আছে তখনও উগ্র কামনা।

সেদিকে আর দ্বিতীয়বার তাকায় না রাশেদ। দ্রুত পোশাক পরে রোকসানার দেহটা কোলে তুলে নেয়। যে করেই হোক বাঁচাতে হবে একে। এই মেয়েটাই তাকে আইনের হাত থেকে রক্ষা করার একমাত্র হাতিয়ার।

এখনও জ্ঞান হারায়নি রোকসানা। আশা হয় রাশেদের, হয়তো বেঁচে যাবে!

খোদা করুন, যেন তাই হয়!

পরিশিষ্ট

কয়েক মাস পর ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যায় সবকিছুই।

রোকসানার সাক্ষ্য আইনের যন্ত্রণা থেকে খুব সহজ ভাবেই রক্ষা করে রাশেদকে। আয়শার ক্ষতও আস্তে আস্তে মন থেকে মুছে যেতে শুরু করে। ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশি হৈচৈ হয় না বলে মানুষের কৌতূহলের বিষয়বস্তু হতে হয় না। এদেশে আজকাল বোধ হয় আজব আজব সংবাদের কোনও অভাব নেই।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচে রাশেদ।

প্রাণপণ চেষ্টা করে জীবনকে আবার স্বাভাবিক পথে ফিরিয়ে আনতে। রোকসানা মেয়েটার যাবার কোন জায়গা নেই বলে সে-ও রয়ে যায় রাশেদের সাথেই। অভিশপ্ত বাড়িটাও বদল করা হয়। একটা ছুটা কাজের বুয়া রাখা হয়। রোকসানাকে দেয়া হয় স্কুলে। মেয়েটা তাকে 'বাবা' 'বাবা' ডাকে।

তবু জীবন যে আর কিছুতেই ফিরে আসে না আগের পথে!

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে উঠে বসে থাকে রাশেদ। পেটে প্রচণ্ড খিদে। মনটা ভয়াবহ পিপাসার্ত। শরীর-মন ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মত হয়ে ওঠে একটুকরো সজীব মাংসের জন্য। বারবার মনে পড়ে পাশের রুমে ঘুমিয়ে থাকা রোকসানার কথা...

...কচি কচি আঙুলগুলো চিবাতে কী মজাটাই না লাগবে। মড়মড় করে শব্দ হবে...তারপর ঘাড়ের কাছে মাংসের স্তর...

মুখ বেয়ে লালা গড়ায় রাশেদের।

অন্ধকারে জ্বলজ্বল করতে থাকে চোখজোড়া। আদিম শ্বাপদের মত।

রুমানা বৈশাখী

বাজনা

এক

বাসাটা একদম ছোট্ট!

অবশ্য একে বাসা বলাটাও বোধহয় ঠিক হলো না। ছাদের ওপর খানিকটা জায়গা ঘেরা দিয়ে বাস উপযোগী করে দেয়া হয়েছে, বাড়তি কিছু ভাড়া পাবার আশায় বেশ বড়সড় একটা রুম, ছোট একটা রান্নাঘর আর একটা টয়লেট। মাথার উপরে টিনশেড। গরমের দিনে কী হবে, এটা ভেবে এখনই ভয় লাগে।

তবু রক্ষা যে থাকার মত একটা জায়গা পাওয়া গেছে! আজকাল ব্যাচেলারদেরকে কেউ তো বাড়ি ভাড়া দিতেই চায় না। সবাই শুধু ভাড়াটে হিসাবে 'ফ্যামিলি' খোঁজে।

বাসাটা অবশ্য খুব একটা খারাপও না। গ্যাস-পানির সমস্যা নেই। দেরি করে আসলেও বাড়িওয়ালা সমস্যা করে না। তার চাইতেও বড় কথা, ভাড়াটা খুব কম। মাত্র দু হাজার টাকা। রীতিমত অবিশ্বাস্য যাকে বলে।

কে জানে, চারতলা বাড়িটার বাকি ফ্লোরগুলোতে অফিস বলেই হয়তো ছাদের উপরের ঘরের ভাড়া এত কম। সন্ধ্যার পর থেকেই একদম সুনসান হয়ে যায় এত বড় বাড়িটা। বাড়িওয়ালাও থাকে বিশ মিনিটের দূরত্বে। অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থেই এ বাড়িতে সে আর সজল ছাড়া অপর কোনও মানুষ বাস করে না। একদম একা তারা দুজন।

ও, না, না, আরও একজন আছে! দারোয়ান আমজাদ মিয়া। কানে বলতে গেলে কিছুই শোনে না, চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও লাভ নেই কোনও। ষাটের ওপরে হবে বয়স। সারাদিন আফিম খায়, আর পড়ে পড়ে ঘুমায় দরজার কাছে। কাজ-কর্ম বলতে এটুকুই তার।

একদমই কোনও সমস্যা নেই এখানে। দু হাজার টাকায় এমন বাসা পাওয়া স্বপ্নের মত। শুধু একটি সমস্যা আছে। সমস্যা না বলে যন্ত্রণা বলাই বোধহয় ভাল...

আশরাফ এখনও অফিস থেকে ফেরেনি, অগত্যা নিজেই এসে রান্নাঘরে ঢোকে সজল। দু'বন্ধু পালা করে রান্না করে, তবে প্রায়ই দেরি হয়ে যায় আশরাফের। বেচারার অফিস গাধার খাটুনি খাটায়।

জানুয়ারি মাসের আরামদায়ক ঠাণ্ডা শহরের বুকে খিচুড়ি খেতে ভালই লাগার কথা। তা ছাড়া আশরাফও খিচুড়ি খুব পছন্দ করে। সুতরাং যত্ন করে রান্নাটা বসায় সজল। তার নিজস্ব রেসিপিতে।

অল্প তেলের মাঝে অনেকগুলো কাটা পিঁয়াজ আর রসুন। সাথে সামান্য একটু আদা বাটা, হলুদ, লবণ দিয়ে ভেজে চাল আর মুসুরির ডাল দিয়ে একটু কষিয়ে নেয়া। সাথে দিতে হবে সামান্য কিছু ভাজা মুগডালও। কষানো হয়ে গেলে কিছু সবজি দেয়া, যেমন–আলু, গাজর, ঝিঙা, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি। এবার ফুটন্ত পানি আর তেজপাতা দিয়ে ঢেকে দেয়া সিদ্ধ হবার জন্যে।

খিচুড়িটা খুব একটা ঝরঝরে হবে না, মাখামাখা থাকবে। পানি একটু শুকিয়ে এলে ভাল করে নেড়ে দেয় সজল। ফ্রিজে লাউয়ের শাক ছিল, সেগুলোই ভাল করে ধুয়ে দিয়ে দেয় খিচুড়ির মাঝে। কমিয়ে দেয় জ্বাল। এবার বাগাড় দেয়ার পালা...

কড়াইতে অনেকটা ঘি নিয়ে কিছু কাটা পিঁয়াজ, রসুন, শুকনা মরিচ, এক টুকরো দারুচিনি আর অনেকগুলো কিসমিস ভেজে নেয় পিঁয়াজ লাল হওয়া পর্যন্ত। তারপর সবটুকু ছড়িয়ে দেয় খিচুড়ির ওপর। চমৎকার একটা সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে।

অনেকটা খিচুড়ি রান্না করেছে, দারোয়ান বুড়োকে একবার ডাকবে নাকি? অকর্মা হোক আর যাই হোক–বুড়ো মানুষ, খেয়ে খুশি হবে। ঠিক আছে, আশরাফ ফিরলে না হয় ডাকা যাবে। তিনজনে একসাথে খেতে বসবে।

সারাদিনের ক্লান্তি আর জমে থাকা ঘাম শরীরে, অগত্যা তোয়ালে নিয়ে গোসলে চলে যায় সজল। গরম পানি তার সহ্য হয় না, ঠাণ্ডা পানিই পছন্দ। শাওয়ার ছেড়ে দিতেই ঝরঝর করে নামে পানির ধারা, আরামে চোখ বুজে আসে সজলের। এবং তখনই...

তখনই শুরু হয় বাজনাটা!

কিছুদিন হলো এই এক নতুন সমস্যা হয়েছে। গভীর রাতে কে যেন এই অদ্ভুত বাজনা শোনে। অদ্ভুত আর বিরক্তিকর। কী একটা যন্ত্র এক নাগাড়ে

বেজেই চলে আর বেজেই চলে। রুক্ষ, কর্কশ আওয়াজ। কার যে এই অদ্ভুত যন্ত্র সংগীত ভাল লাগে আল্লাহ মালুম।

একদিন দুদিন না হয় সহ্য করা যায়, রোজ রোজ কী আর ভাল লাগে? প্রথম প্রথম এই রকম সমস্যা ছিল না, তা হলে তো বাসাটা তখনই বদলে ফেলা যেত। এখন আর সম্ভব নয়। অনেকগুলো টাকা আগাম দেয়া হয়ে গেছে। বাড়ি ছাড়তে গেলে পুরোটাই লস।

এই বাজনার সাথেই যখন বসবাস করতে হবে, তখন মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করে সজল। এবং মজার ব্যাপার হলো মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করলে খুব একটা খারাপও লাগে না। বরং ভালই লাগে...বেশ ভাল!!

কী যন্ত্র বাজছে, তা অবশ্য বুঝতে পারে না সে। কেননা সংগীত সম্পর্কে তার জ্ঞান অতি সামান্য। তবে এটুকু বুঝতে পারে যে বাজনাটা ভাল...খুবই ভাল। শোনার সাথে সাথে অন্যরকম একটা অনুভব হয় শরীরের মাঝে। কেমন যেন ঝনঝন করে ওঠে মনের মধ্যে, একটু একটু ঘোরের মতনও লাগে...

কেটে যায় বাজনার ঘোর, কেননা বাজতে শুরু করেছে কলিংবেল। আশরাফ ফিরেছে নিশ্চিত। কলিংবেলটার ওপরে বিরক্ত হলেও তড়িঘড়ি করে গোসল শেষ করে সজল। জানতেও পারে না যে এই কলিংবেলটাই আজ তাকে ভীষণ ভয়াবহ একটা কিছু থেকে রক্ষা করল!

সে রাতে বিরক্তিকর বাজনাটার হাত থেকে রেহাই পেতে যখন কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনতে শুনতে ঘুমায় আশরাফ, তখন সত্যিই ভীষণ অবাক হয় সজল। তার কাছে তো চমৎকার লাগছে।

চমৎকার, অসাধারণ, অপূর্ব!!!

সেই অপূর্ব বাজনা শুনতে শুনতেই সেদিন পার হয়ে যায় সজলের রাত। এবং পরবর্তীতে আরও অনেকগুলো রাত!!

দুই

রাত বাড়ার সাথে সাথে ছটফটানিটাও বাড়তে থাকে সজলের মনে। একটু একটু করে গুটি গুটি পায়ে শুরু হয় অস্বস্তির রূপ নিয়ে, ক্রমশ চেপে বসে মনের ওপর নিঃসঙ্গতা হিসেবে। তারপর একটু যেন ভয় ভয় লাগতে শুরু করে অকারণেই। আর একসময়...

তীব্র আতঙ্কের চেহারা নিয়ে বন্ধ করে দিতে থাকে নিঃশ্বাস!!

অজানা কোনও কিছুর অস্তিত্বের আতঙ্ক, নিজের বোধের বাইরের কোনও একটা কিছুর আতঙ্ক...কিন্তু কীসের যে এত আতঙ্ক, সেটাই বুঝে উঠতে পারে না সজল।

ইচ্ছা হয় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে, কিংবা দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে কোনভাবে মরে যেতে। অথবা...অথবা...রান্নাঘর থেকে ছুরিটা নিয়ে আমূল বসিয়ে দিতে নিজের বুকের মাঝে!

ছুরিটা ঠিকই হাতে নেয় সজল। হাত কাঁপে শুকনো পাতার মত। তবু নিশ্চিত সে...নিশ্চিত যে আজ এই ছুরিটাকে তার বসাতেই হবে নিজের পাঁজর ভেদ করে। কী জন্যে এটা করতে হবে, তা তো জানা নেই। কিন্তু করতে যে হবেই, এ ব্যাপারে নিশ্চিত সজল।

এবং ঠিক তখনই...

ঠিক ওই মুহূর্তেই বাজতে শুরু করে সেই বাজনা। অপূর্ব, অসাধারণ সেই বাজনা শান্তি হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। শিথিল হয়ে আসে মুঠি, হাত থেকে খসে পড়ে ছুরিটা। এক পলকে মন থেকে উধাও হয়ে যায় আতঙ্কের সকল অনুভব।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় সজল।

উঁচু বাউণ্ডারির মাঝে নেহাত সাদামাটা একটা একতলা বাড়ি। মলিন, বিবর্ণ, একটি ঘরেও জ্বলছে না কোনও বাতি। আর অন্ধকারের চাদরে ডুবে থাকা সেই বাড়িটাই হচ্ছে অপূর্ব এই বাজনার উৎস।

মনে হচ্ছে যেন হাওয়ার শরীরে ভর করে ভেসে ভেসে আসছে সেই

বাজনা। কেবল মাত্র তারই জন্যে!

অনেকটা সময় নিজেকে হারিয়ে বাজনা শোনে সজল। অনেক... অ-নে-কটা সময়। এবং একসময় নিজের অজান্তেই দরজা খুলে বের হয়ে যায়।

বের হয়ে যায় সেই অপূর্ব বাজনার উৎসের সন্ধানে!!

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে সজলকে রীতিমত অসুস্থই দেখে আশরাফ। চোখ টকটকে লাল, মুখ ফুলে আছে–রাতে ঘুমায়নি নিশ্চিত! মানুষটা যে রাতে কখন ফিরেছে, তাও জানা নেই।

কাল রাতে বাসায় ফিরতে ফিরতে প্রায় এগারোটা বেজে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে দরজা হাট করে খোলা। চুলায় ডিম সিদ্ধ বসানো হয়েছিল, সেই ডিম পুড়ে-টুরে একাকার। টেবিলের ওপর রাখা চিরকুটে লেখা অপেক্ষা না করে খেয়ে নিতে।

অবশ্য অপেক্ষা আশরাফ ঠিকই করেছিল। কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমের পর কখন যে চোখ বুজে এসেছিল, নিজেও বলতে পারবে না। নানা রকম দুশ্চিন্তা তখন ভর করেছিল মাথায়। এবং এখন তো সজলের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ঘটনা বোধকরি সত্যিই গুরুতর। অফিসে যাচ্ছে, অথচ শার্টটা পর্যন্ত ঠিক করে পরেনি সজল, চুলগুলো আঁচড়ায়নি। টেবিলে বসে ঝিমুচ্ছে মুরগির মতন।

প্রথমে তাই কিছু জানতে চায় না আশরাফ। ডিমের অমলেট করে বেশি মরিচ-পিঁয়াজ দিয়ে, আর সজলের জন্যে ডাবল ডিমের পোচ। রুটি টোস্ট করে পুরু মাখন মাখায়, কড়া লিকারের চা তৈরি করে বাড়িয়ে দেয় বন্ধুর দিকে।

'তোকে দেখি মুরগির ঝিমুনি রোগে ধরেছে। ঝটপট এটা গিলে ফেল তো! এক ঢোকে গিলবি!'

একটু হাসার চেষ্টা করে সজল, তবে কাপটাতে ঠিকই চুমুক দেয়। টিফিন বক্সে দুপুরের খাবারটাও রেডি করে দেয় আশরাফ।

'আজকে আর বাইরে লাঞ্চ করিস না। কাল রাতে চাইনিজ ফুড আনছিলাম দুজনে খাব বলে। ফ্রাইড রাইস, প্রণ বল আর চিকেন ভেজিটেবল কারি। সেটা গরম করে দিলাম। দুপুরে লাঞ্চ করিস।'

'তুই কাল রাতে খাসনি?'

হাসে আশরাফ। 'তোকে ছাড়া কোনওদিন ডিনার করছি আমি?'

'এখন থেকে করতে হবে।' কেমন যেন এলোমেলো শোনায় সজলের কণ্ঠ।

'আমি মিউজিক ক্লাসে ভর্তি হইছি। রোজ রাতে ক্লাস।'

'এইটা আবার কোন দেশি স্কুল যে রাতে ক্লাস?'

'স্কুল না...ওই যে আমাদের পাশের বাসায় যিনি রাতের বেলা বাজনা বাজান, উনার কাছে শিখব।'

'কিন্তু তোর অফিস? রাতে বাজনা শিখলে ঘুমাবি কখন?'

'ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' একটু যেন রূঢ়ই শোনায় সজলের কণ্ঠ।

তবে আশরাফ বোধহয় লক্ষ করে না। বলে, 'শিখবি যখন, অফিসের পর সন্ধ্যা বেলা শেখ। গভীর রাতে শেখার দরকার কী?'

এবং সাথে সাথে অকারণ রাগে গম্ভীর হয়ে ওঠে বন্ধুর মুখ। 'আমার যখন শিখতে ইচ্ছা হয়, তখন শিখব। সব কাজ তোকে বলে, তোর কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে করতে হবে নাকি?'

নাস্তা দূরে থাক, চাটুকুন পর্যন্ত শেষ না করে বেরিয়ে যায় সজল। পেছনে পড়ে থাকে টিফিন বক্স। এবং বিস্মিত আশরাফ।

তিন

দুহাতে কান চেপে ধরে বিছানার উপর বসে থাকে আশরাফ। অসহ্য এই বাজনা! এর যন্ত্রণায় একটু গান শোনারও উপায় নেই। হেডফোন ভেদ করে যেন মগজে পৌঁছে যায় আওয়াজ। সংগীত চর্চা করতে হবে ভাল কথা, কিন্তু এত রাতে কেন? এখন তো মনে হয় এই বাজনার যন্ত্রণাতেই এবাড়ির ভাড়াটেরা সব পালিয়ে যায়। এই জন্যেই ভাড়া এত কম।

বাজনাটা শুনলেই এখন মেজাজ চিড়বিড় করতে থাকে আশরাফের। এই অপয়া বাজনার কারণেই সজলের মত ভাল বন্ধুকে হারাতে হয়েছে। আজকাল তো সজলের সাথে দেখা প্রায় হয়ই না। কথা হয় আরও কম। গত এক সপ্তাহে একটা কথা হওয়া দূরে থাক, একবার মুখোমুখি দেখা পর্যন্ত

হয়নি দুজনের।

একটা পত্রিকা অফিসে চাকরি করত সজল। বোধহয় ডিউটি বদলে নাইট শিফটে নিয়ে নিয়েছে। গভীর রাতে ফেরে সে, সম্ভবত ভোরের আগে আগে। আশরাফ তখন গভীর ঘুমে, দেখা হবার সুযোগ নেই। আর সকালে যখন আশরাফ বেরিয়ে যায় অফিসের উদ্দেশে, তখন চাদর মুড়ি দিয়ে বেঘোরে ঘুমায় সজল। আবার রাতে আশরাফ বেরিয়ে যাবার আগেই বোধহয় চলে যায় বাজনা শিখতে। কারণ বিগত দিনগুলোতে একদিনও ফিরে বন্ধুকে ঘরে পায়নি সে।

সে যাই হোক, সেদিনকার সেই সকালের পর আশরাফও আসলে আর চেষ্টা করেনি এই বাজনা শেখার ব্যাপারে কিছু বলতে। মনে মনে খুব আশা করেছিল সজল এসে নিজের রূঢ় ব্যবহারের জন্যে স্যরি বলবে। কিন্তু বাস্তবে আসলে সেরকম কিছুই ঘটেনি। ক্রমশ আরও দূরে চলে গেছে সজল।

...বাজনা ক্রমশ উচ্চ থেকে উচ্চ গ্রামে উঠছে। এই কর্কশ আওয়াজ কীভাবে কারও ভাল লাগতে পারে, সেটাই এখন পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারেনি আশরাফ। কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমশ সহ্যের সীমা অতিক্রম করছে।

বাজনার উৎস বাড়িটার ব্যাপারে কিছু খোঁজ-খবর করার চেষ্টা করেছিল সে। তাদের বিল্ডিংটার ঠিক উল্টো দিকেই বাড়িটা। কে থাকে, কী করে—এইসব হাবিজাবি খবর নেয়াটা কঠিন হবার কথা নয়। কিন্তু মুশকিল হলো এই গলিতে অপর কোনও বাড়ি নেই যে পাড়া-প্রতিবেশীর কাছ থেকে খোঁজ নেবে। আর তাদের দারোয়ান তো বোধহয় জগতের বধিরতম মানুষ।

'কালা বলেই তো এই বাড়ির দারোয়ান!!' আপন মনেই বিড়বিড় করে আশরাফ। বিছানা থেকে নেমে স্যাণ্ডেল গলিয়ে নেয় পায়ে।

আজ তাকে এই বাজনার ব্যাপারটা একটা সমাধান করতেই হবে!!

চার

আগে কখনও যা হয়নি, আজ তাই হয়। বাজনাটা কানে যাওয়ার সাথে সাথে কেমন যেন শিরশিরে একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে শরীরের আনাচে-কানাচে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হাত-পাগুলো চায় খিঁচে একটা দৌড়

দিতে। অথচ মনকে চরম ভাবে আকর্ষণ করে রাখে অদ্ভুত সেই বাজনা।

শুনতে শুনতে কেন যেন আশরাফের মনে হয় অপার্থিব এই সুরের সৃষ্টি মাটির পৃথিবীতে নয়। মানুষের বোধের বাইরের অন্য কোনও জগতে, অন্য কোনও ভুবনে। অবাস্তব কোনও জগতে নিঃসন্দেহে।

কেননা অসম্ভব... পৃথিবীর বুকের কোনও সুর এটা হতেই পারে না!!

গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে গোটা বাড়িটা। দাঁড়িয়ে আছে যেন কেবল একটা অন্ধকার অবকাঠামো। ভেতরে ঢোকার বিশালাকৃতি গেটটা যখন অনেক ঝাঁকাঝাঁকির পরেও একতিল নড়ে না, তখন খোদার নাম নিয়ে দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ে আশরাফ। আর গিয়ে সোজা পড়ে না জানি কত বছর পরিষ্কার না করা আগাছার জঙ্গলের মাঝে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে দীর্ঘ অনেক অনেকগুলো মুহূর্ত। না... তেড়ে আসে না কোন পাহারাদার। ন্যূনতম সাড়াশব্দও পাওয়া যায় না মানুষ অথবা অন্য কোনও প্রাণীর।

ব্যাপারটা একটু অবাকই লাগে। আর ভয়ংকরও।

মানুষ না হয় নেই, কিন্তু অন্য কোনও প্রাণীর সাড়াশব্দ থাকবে না কেন? পরিত্যক্ত পুরানো বাড়ি, চারপাশ ঘিরে থাকা জঙ্গলটা এককালে বাগান ছিল নিশ্চিত। এখন সে জৌলুস নেই ঠিকই, তবে গাছপালা তো কমেনি আর। বরং বেড়েছে। সুতরাং আর কিছু না হোক, রাতজাগা কিছু প্রাণীর আওয়াজ তো থাকবে অবশ্যই। নিদেনপক্ষে ইঁদুর আর ঝিঁঝিঁ পোকা অন্তত।

কিন্তু না...

কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। অন্তহীন, সুনসান নীরবতা শুধু চারপাশে।

জানে না কেন নিঃশব্দে চুপিচুপি এগোয় আশরাফ। বুকের মাঝে অদ্ভুত এক রকমের অস্বস্তি বোধ, এত জোরে আওয়াজ করছে হৃৎপিণ্ড যেন বের হয়ে আসবে পাঁজর ছেড়ে। অকারণেই!!

বুনো গোলাপের গন্ধে ভারী আওয়াজ, দম নেয়া দায়। তবুও বাড়িটার ঠিক সামনে ফুলের সমারোহ দেখে বিস্মিত হয়ে পড়ে সে। বুনো গোলাপের ঘন ঝাড়ের মাঝে ছোট্ট একটা ডোবার মত, তাতে ভরা টলটলে পানিতে, চাঁদের আলোর অপার্থিব প্রতিফলন। ডোবাটা জুড়ে ফুটে আছে না জানি কত অসংখ্য পদ্ম আর শাপলা। এবং তাদের রঙ নীল...আকাশের মত নীল।

আর কী অসম্ভব সুন্দর সেই নীল!!

মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে আশরাফ। জীবনে কখনও নীল পদ্ম কিংবা শাপলা দেখেনি সে। এসব ফুল যে নীল-ও হতে পারে, সেটাই জানা ছিল না তার। নীল হলো তো হলো, এতটা অপূর্ব নীল?

তবে বেশিক্ষণ দেখার সময় হয় না। কেননা ক্রমশ উচ্চগ্রামে উঠছে বাজনা। উঠছে তো উঠছেই। আর অসহ্যও হয়ে পড়ছে ক্রমশ...

ভারি কাঠের দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ে আশরাফ। একবারও ভেবে দেখে না যে গাঢ় অন্ধকারে ডুবে থাকা এই বাড়িতে থাকতে পারে কোনও অস্বাভাবিকতা, লুকিয়ে থাকতে পারে কোনও বিপদ...

সুনসান এই বাড়িটির অন্ধকার চাদরের আড়ালেই রচিত হতে পারে তার জীবনের সর্বশেষ অধ্যায়!

পাঁচ

বুকের মাঝে নিঃশ্বাস আটকে দরজার আড়াল থেকে ভয়াবহতম দৃশ্যটা দেখে আশরাফ!

হাত-পা কাঁপে, পেটের মাঝে কী যেন একটা দলা পাকিয়ে আসতে চায়, মেরুদণ্ড বেয়ে নামে আতঙ্কের হিমশীতল অনুভব।

তবু তাকিয়ে দেখে আশরাফ। আর দেখতেই থাকে...

বাড়িটার ঠিক মাঝখানে এই উঠানের মত জায়গাটা—বাড়িটার কেন্দ্র বিন্দু। মাথার ওপরে ছাদ নেই কোনও, মেঝে বাঁধানো মার্বেল পাথরে। চাঁদের নীলাভ-সাদা আলোয় আরও যেন বেশি অন্ধকার ঠেকছে সবকিছু।

জোছনার চাদরের ঠিক নীচে বসেই বাজাচ্ছে সে!

বাজাচ্ছে আর বাজিয়েই চলেছে...

অশীতিপর এক বৃদ্ধ। গায়ের রঙ শুভ্র ফর্সা, নিম্নাঙ্গে সাদা এক টুকরো কাপড় জড়ানো কেবল। মাথার টাকে চুল অবশিষ্ট আছে কয়েক গুচ্ছ মাত্র। তাও ধবধবে সাদা। কানের ভেতর থেকেও বের হয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ কুৎসিত সাদা চুল।

আর এতটাই হাড় জিরজিরে শরীর তার—যেন জীবন্ত কোনও কঙ্কাল।

নিজের চাইতেও বড় আকারের একটা বাদ্যযন্ত্র দুহাতে ধরে বাজিয়ে চলেছে। অনেকটা যেন তানপুরার মত দেখতে, কিন্তু ঠিক তানপুরা নয়। কদাকার দর্শন আজব একটা বাদ্যযন্ত্র।

চোখ বন্ধ সেই বৃদ্ধের। বাজনার তালে এমন ভয়ানক ভাবে দুলছে যেন মাথা খসে পড়ে যাবে দেহ থেকে। কুঁচকানো চামড়ার ওপরে কালো কালো কুৎসিত ফোঁটা ফোঁটা দাগ...

বলে দেয়ার অপেক্ষা রাখে না, প্রথম দর্শনই বলে দেয় যে এই বৃদ্ধ পৃথিবীর কোনও মানুষ নয়। অন্য কোনও প্রাণী সে, অন্য কোনও কিছু। এবং তার মুখোমুখি বসে একই রকম আরও একটা যন্ত্র বাজাতে থাকা প্রাণীটাও দেখতে হুবহু তার মত। হুবহু!!

এক টুকরো সাদা কাপড় জড়ানো শরীর, টাক মাথা, কান থেকে বের হওয়া কদাকার চুল, বাজনার তালে দুলতে থাকা মাথা...

হায় খোদা!!!

এ তো সজল!!!

এতটা শুকিয়ে গেছে যে পেট লেগে গেছে পিঠের সাথে, চামড়া কুঁচকে গেছে নব্বই বছরের বৃদ্ধের মত...

একসাথে থেমে যায় বাজনা। হঠাৎই!!

আর একসাথেই ফিরে তাকায় প্রাণী দুটি। তাদের টকটকে লাল চোখগুলো তাকিয়ে থাকে সোজা এবং সরাসরি আশরাফকে লক্ষ্য করেই। একসাথে দাঁত খিঁচিয়ে আজব এক ভঙ্গি করে দুজনেই, যেন হিংস্র কোনও প্রাণী। তাদের হিসসস...হিসসসসস গর্জন প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে ফিরে আসতে থাকে অনবরত। অবিরাম।

এবং একই সাথে দুজনে লম্বা একটা লাফ দেয় আশরাফের শরীরটাকে উদ্দেশ্য করে!

ছয়

ছুট...ছুট...ছুট...

কাঁটা ভরা জঙ্গল বেপরোয়া ভাবে মাড়িয়ে জীবনটা হাতে নিয়ে ছোটে

আশরাফ। শরীরের এখানে-সেখানে রক্ত ঝরছে, প্রাণীগুলোর দাঁতের চিহ্ন। সুযোগ পাওয়া মাত্র কামড়ই বসাতে চেয়েছে প্রাণীগুলো। কী করে যে তাদের হাত থেকে রক্ষা পেল, নিজেও বলতে পারবে না তা।

এত কিছুর মাঝেও সজলের জন্যে চোখ ফেটে কান্না আসে। কী হয়েছে সজলের? এইসব কী হয়েছে? ওই প্রাণীটা কী করেছে তাকে?

...পেছনে পাওয়া যাচ্ছে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ। এগিয়ে আসছে কাছে। ক্রমশ আর ক্রমশ...

...ওটা কি দেয়াল????

হ্যাঁ, বাউণ্ডারির দেয়ালই তো মনে হচ্ছে। একবার উঠে যেতে পারলেই...তরতর করে তাই দেয়াল বায় আশরাফ। আর একটু...এই তো, আর মাত্র একটু...

দেয়ালে চড়ে বসতেই একটা হাত আঁকড়ে ধরে পা! কঠিন মুঠিতে খামচে ধরে। আর টেনে নামাতে চায় সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। একটার ওপরে আরেকটা চড়ে বসেছে প্রাণীগুলো। নীচে সজল, ওপরে বুড়ো পিশাচটা।

দেয়ালের প্রান্ত আঁকড়ে প্রাণপণ ঝুলে থাকার চেষ্টা করে আশরাফ। হাত ছিলে রক্তাক্ত হয়ে যায়, উপড়ে আসে নখ। এদিকে ক্রমশ জোরদার হয় বুড়ো পিশাচের হাতের মুঠি। দুহাতে অমানুষিক জোরে টানছে সে, ইঞ্চি দুয়েক লম্বা নখ গেঁথে বসে যাচ্ছে মাংস ভেদ করে...

তীব্র ব্যথায় আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করে ওঠে আশরাফ। পিশাচটা এবার শ্বাপদের মত কামড় বসিয়েছে পায়ের ওপর। নাছোড় বান্দার মত কামড়ে ধরে ঝুলে আছে।

উন্মাদের মত পা ছোঁড়ে আশরাফ। সজোরে লাথি কষাতে থাকে বুড়ো পিশাচটার মাথায়। লাভ হয় না কোনও, বরং কামড়ে এক খাবলা মাংস তুলে নেয় সে আশরাফের পা থেকে। আর চিবুতে থাকে আয়েশী ভঙ্গিতে...

দুচোখ ফেটে পানি গড়ায়, তীক্ষ্ণ ব্যথায় এক নাগাড়ে চিৎকার করতে থাকে আশরাফ। বাঘের কবলে পড়া শিকারের মত ছটফট-করতে থাকে।

'এইটা লন ভাইজান...এইটা লন!! এক কোপে নামায় দ্যান শুয়ারের বাচ্চার গলা...'

আমজাদ আলী!!

প্রায় বধির, অকর্মার ঢেঁকি, বৃদ্ধ আমজাদ আলী। চড়ে বসে আছে

দেয়ালের ওপর। বাড়িয়ে ধরে আছে ইয়া মস্ত এক রাম দা।

'তাড়াতাড়ি করেন ভাইজান...শুয়ারের বাচ্চাটা আপনেরে খায়ে ফেলতে চাইতেছে...এক কোপে মাথা নামায় দ্যান!'

তাই করে আশরাফ।

অক্ষরে অক্ষরে তাই করে, ঠিক যেমনটা বলে আমজাদ আলী। অন্ধের মতন রাম দা-টা শূন্যে ঘোরায়...আমজাদ আলী গায়ের জোরে টানতে থাকে তাকে...দুজনে গড়িয়ে এসে পড়ে দেয়ালের অপর প্রান্তে।

এরপর আর কিছু মনে নেই আশরাফের।

কী হলো, কীভাবে হলো...কিছুই মনে নেই!!!

পরিশিষ্ট

বাসাটা খুব সুন্দর। একদম ছবির মত।

ছোট্ট গোছানো আপার্টমেন্ট, জানালা দিয়ে তাকালেই চোখে পড়ে লেকের গাঢ় নীল পানি। কিছুদিন পরেই ঠাণ্ডায় এ পানি জমে বরফ হয়ে যাবে। তখন তরুণ-তরুণী আর বাচ্চারা এর ওপর মহা আনন্দে আইস স্কেটিং করবে।

এক কাপ কফি হাতে বারান্দায় বসে থাকে আশরাফ। সেদিনের সেই ভয়াল রাতের পর থেকে একটা পা টেনে টেনে হাঁটতে হয় তাকে। দাঁড়ানো বা হাঁটাচলার সমস্ত কাজকেই ভীষণ কষ্টকর মনে হয়। নতুবা আইস স্কেটিং নিঃসন্দেহে তার নিজেরও প্রিয় স্পোর্টস হতে পারত।

অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে। অনেক অনেকটা সময়। কিন্তু স্মৃতি থেকে এক বিন্দু ম্লান হয়নি তার ভয়াবহতা। সুস্থ হতেই অনেকটা সময় লেগে গিয়েছিল তার। প্রায় ছয় মাস। স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি যখন ফিরে পেয়েছিল, ততদিনে পার হয়ে গেছে পনেরো বিশ দিন।

তবে আমজাদ আলীর কাছে শুনেছে পুলিশ কেস নাকি হয়েছিল। কিন্তু পুরো বাড়ি খুঁজে কাউকে বা কোনও কিছুকে পায়নি পুলিশ। সে যাই হোক না কেন, মাতৃভূমির বাতাসও তখন বিষাক্ত লাগতে শুরু করেছিল আশরাফের কাছে। তাই তো এত দূরে এই কানাডায় পালিয়ে আসা।

আমজাদ আলী অবশ্য সেই বাড়িতেই আছে। সে কানে খাটো, প্রায় বধিরই বলা যেতে পারে। কুৎসিত সেই বাজনার কোনও প্রভাব পড়ে না তার

ওপর। তার ভাষ্য হচ্ছে–'এই বুড়া বয়সে আজাইরা টানাটানি কইরে কী লাভ ভাইজান? বিশ বছর এইখানে আছি। না আছে সংসার, না আছে পরিবার। যে কয়দিন বাঁচি, এইখানেই থাকব। আপনের মত আর কেউরে পাইলে তারে বাঁচাব...'

কেন যেন সব কথা শুনে আশরাফের মনে হয়েছে–তার বেলাতেই প্রথম নয়, এর আগেও আমজাদ আলী দেখেছে এইরকম কিছু...

ফোন বাজছে।

একটু নয়, বেশ অনেকটাই অবাক হয় আশরাফ। এমন অদ্ভুত সময়ে কে ফোন করল তাকে? সে তো এখন পর্যন্ত দেশে কাউকে ফোন নম্বরই দিয়ে উঠতে পারেনি। মাত্র তো আজ লাগল ফোনটা!

'হ্যালো!!'

শরীরে আতঙ্কের হিম হিম স্রোত তুলে শ্রবণ যন্ত্রে প্রবেশ সেই বাজনা।... হ্যাঁ, ভয়াল সেই বাজনাই। কোনও সন্দেহ নেই তাতে।

কোনও সন্দেহ নেই!!!

কুৎসিত, কর্কশ সেই বাজনা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে আশরাফের শরীরের, মস্তিষ্কের প্রতি বিন্দুতে। সরীসৃপের মত ঘুরপাক খেতে থাকে তার অস্তিত্বের মাঝে।

কেন যেন আশরাফের মনে হয়...

মনে হয় যে ফোনের অপর প্রান্তের বাজনাটার উৎস হচ্ছে সজল। কিংবা সজল রূপী সেই কর্দয পিশাচটা!!!

রুমানা বৈশাখী

ওরা

এক

আষাঢ় মাস। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া কালচে ধূসর মেঘ। সন্ধে হতে এখনও বেশ দেরি। তবু মেঘের কারণে অন্ধকার হয়ে এসেছে চারদিক। একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ট্রাফিক আইল্যাণ্ডের মেহগনি গাছগুলোর পাতার ধুলো ধুয়ে সাফ। গাঢ় সবুজ রঙের পাতাগুলো মৃদু বাতাসে দুলছে। রাজপথ ভেজা। ফুটপাতে মানুষের ভিড়। বাসেও ভিড়। ঘরে ফিরছে মানুষ। একটা মিনিবাসের মধ্যে দমবন্ধকরা গাদাগাদি ভিড়ে রড ধরে দাঁড়িয়ে আছে জাহিদ। বাতাসের আর্দ্রতা আর ভিড়ের জন্য সারা গায়ে অস্বস্তিকর ঘাম। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। বাস চলছে শ্লথ গতিতে। লোকাল বাস। প্রতিদিন একই রুট ধরে একই ভাবে অফিস থেকে বাসায় ফেরে সে। মাঝে মাঝে ভাগ্যগুণে বাসে সিট পায়। বেশির ভাগ দিনই দাঁড়িয়ে যেতে হয়। ঘামের দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে।

বিভিন্ন স্টপেজে বাস থামে। ডাস্টবিন থেকে উচ্ছিষ্টের দুর্গন্ধ মানুষের ঘামের গন্ধের সাথে মিশে নাকে এসে ধাক্কা মারে। এত গাদাগাদির মধ্যে আরও মানুষ ওঠে। বাসের হেলপার তারস্বরে চিৎকার করে চলে, 'মিরপুর দশ, এগারো, বারো, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া'। মিনিবাসগুলোর ছাদ এমনিতেই নিচু। মাথা ঠেকে যায়। সোজা হয়ে দাঁড়ানোই মুশকিল। সিটগুলো ছোট ছোট। সিটের মাঝের ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ালে বসা মানুষগুলোর কাঁধের সাথে নিতম্ব লেগে থাকে। তার উপরে রাস্তার ঝাঁকুনি, ধাক্কাধাক্কি, মানুষের মেজাজ, ভাড়া নিয়ে গণ্ডগোল, খিস্তিখেউড় তো রয়েছেই। এই চাপাচাপির মধ্যেই কণ্ডাকটর ভাড়া সংগ্রহ করতে পিছনে আসে। অসহনীয় ব্যাপার। প্রায় পাঁচ মাস হতে চলল জাহিদ এভাবেই অফিসে যাতায়াত করে। চাইলেই সিএনজি বা ট্যাক্সিক্যাবে যাতায়াত করতে পারে সে। মোটামুটি ভাল বেতনের চাকরিই সে করে। প্রথম প্রথম কয়েকদিন এই নতুন অফিসে সিএনজি করেই আসা যাওয়া করত সে। কিন্তু একটা বিশেষ

ঘটনার পর ঠিক করেছে বাসেই চড়বে। হোক গাদাগাদি। পকেটমারের ব্যাপারটা হিসাবে না ধরলে মিনিবাস নিরাপদ যানবাহন।

জাহিদের অফিস কারওয়ান বাজারে। বাসা মিরপুর দশ নম্বরে। সে কাজ করে একটা সফটওয়্যার কোম্পানিতে। জুনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ঢুকেছে মাস ছয়েক হলো। কোম্পানিটা ছোট। বড়জোর পঁচিশ-ত্রিশ জনের মত এমপ্লয়ি। খাটুনি খুব বেশি। যদিও বেতন ভালই দেয়। মাঝে মাঝে তো ছুটির দিনেও কাজে যেতে হয়। তবে খাটুনি নিয়ে আপত্তি নেই জাহিদের। সে দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে। শুধু মেনে নিতে পারছে না ভিড়ের বাসে ঘামের দুর্গন্ধ আর গাদাগাদির ব্যাপারটা। বাসা বদল করে ফার্মগেট বা ইন্দিরা রোডের ধারে কাছে কোথাও আসবে কিনা ভেবেছে বেশ কয়েক বার। কিন্তু সেটাও এখনও করা হয়ে ওঠেনি।

আগারগাঁও-এ বাস পৌঁছতেই সিট পেল সে। যেখানে রড ধরে দাঁড়িয়ে ছিল সেই বরাবর সিটে বসা লোকটা নেমে গেল। যাওয়ার সময় ভারি শরীরটা দিয়ে পা মাড়িয়ে গেল। ওয়েট মেশিন না হয়েও জাহিদ দু'মণ ওজনের ভার বুঝতে ভুল করল না। এগুলোও নীরবে হজম করতে হয়। রাগ করে বা চিৎকার করে লাভ কী? লাভ হয়তো আছে। রাগটা ঝেড়ে ফেলা যায়। কিন্তু রাগটাই বা কার উপর করবে সে? এই ভেবে চুপচাপ বসে পড়ে সিটে। পাশে বসা লোকটার সাথে চোখাচোখি হলো। রাগী রাগী চেহারার আধবুড়ো একটা লোক। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি। সাদামাটা চেহারা। চোখ সরিয়ে নিল সে।

হঠাৎ করে যেন খুব ক্লান্ত লাগে তার। পা ছড়িয়ে আরাম করে বসতে ইচ্ছা করে। কিন্তু উপায় নেই। সিটগুলোর সামনে জায়গা এত কম। সারাদিন খুব ব্যস্ততা গেছে। কোম্পানির ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্টের রিলিজ ছিল আজকে একটা। কাজ যদিও খুব বেশি বাকি ছিল না। কিন্তু লাঞ্চের আগে সার্ভারটা ক্র্যাশ করায় সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেল। তাও ভাগ্য ভাল যে দু'ঘণ্টার মধ্যেই সার্ভারটা আবার ঠিক করা গেছে। প্রজেক্ট ম্যানেজার শামীম ভাই, যার কাজ হলো টিমের সবাইকে ক্রনিক ডিপ্রেসনের রোগী বানিয়ে রাখা, তিনি পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন ওর। ভাবতেই বাসে ওঠার সময় ভয় পাওয়ার ঘটনাটার জন্য নার্ভাসনেস কেটে গেল। সত্যিই খুব ভয় পেয়েছিল আজকে। ঘটনাটা মন থেকে জোর করে মুছে ফেলতে চাইল।

হঠাৎ অস্বস্তি নিয়ে খেয়াল করল পাশের সিটের লোকটা তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। আবার চোখাচোখি হলো দু'জনের। দু'জনেই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল। কী ব্যাপার! লোকটার সমস্যা কী? ভাবল সে। অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও স্পষ্ট বুঝতে পারল লোকটা এখনও তাকে আড়চোখে পর্যবেক্ষণ করছে।

বাস কাজীপাড়া এসে থামল। লোকজন নামছে। এর পরের স্টপেজেই নামবে জাহিদ। লোকটাকে আমল দিল না। চুপচাপ অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

'ভাই, আপনিও ওদেরকে দেখতে পান, তাই না?' আচমকা কথা বলে উঠল আধবুড়ো লোকটা।

চমকে উঠল জাহিদ। লোকটার দিকে তাকিয়ে নার্ভাস ভাবে বলল, 'মানে? কী বলতে চান?'

লোকটা বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গেল। 'না, কিছু না। আমারই ভুল হয়েছে সম্ভবত। সরি।' বলেই চুপ করে জানালার দিকে ফিরে বাইরে তাকাল লোকটা। জাহিদ জানে লোকটার কোনও ভুল হয়নি। কিছুটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে সে। হার্টবিট বেড়ে যায়। লোকটা জানল কীভাবে? তবে কি এই লোকটাও তার মত? এবারে সে আগ্রহী হয় লোকটার সাথে কথা বলতে।

'ভাই, কী যেন দেখার কথা বললেন?'

মুখ ফেরাল লোকটা। রাগী রাগী দৃষ্টি বদলে গিয়ে চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'তারমানে আমার অনুমান ঠিক?' ফিসফিস করে বলল, 'কুকুরমুখোগুলোকে আপনিও দেখতে পান, তাই না?'

'হুম্‌ম, পাই।' ছোট করে জবাব দিল জাহিদ। কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে যেন।

'আপনি নামবেন কোথায়?' লোকটা জিজ্ঞেস করে।

'মিরপুর দশ নম্বরে।'

'আমিও ওখানেই নামব। চলুন বাস থেকে নেমে এক কাপ চা খেতে খেতে কথা বলি।'

জাহিদ মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। একবারও মনে হলো না অপরিচিত একটা মানুষের সাথে এভাবে আলাপ করা ঠিক নয়। মনে হলো না কারণ লোকটার ব্যাপারে সে জানতে চায়। তার জানা দরকার, ভীষণ ভাবে দরকার।

দুই

ততক্ষণে সন্ধে পেরিয়ে গেছে। আরও অনেকের সাথে বাস থেকে একসাথে নামল ওরা। রাস্তার পাশে চায়ের একটা দোকান দেখিয়ে লোকটা বলল, 'চলুন, ওখানে বসি।' জাহিদ এগোল লোকটার সাথে সাথে।

'দু'কাপ চা আর একটা বেনসন...' বলেই জাহিদের দিকে তাকাল লোকটা। 'সিগারেট খান নাকি?'

'জি না।'

'ভাল ভাল।' বলতে বলতে দোকানের এক পাশের ফাঁকা বেঞ্চিটায় বসল লোকটা। জাহিদও বসল। 'আমার নাম শাহ আলম।' লোকটা ডান হাত বাড়িয়ে দিল। 'হেঃ হেঃ, ফর্মালি পরিচিত হওয়া যাক, কী বলেন?'

'আমি জাহিদ রেজা।' হাত মিলায় জাহিদ।

লোকটা সিগারেট ধরিয়ে দোকানের পিচ্চি ছেলেটার হাত থেকে হাত বাড়িয়ে এক কাপ চা নিয়ে জাহিদের হাতে দিল। 'কতদিন হলো ওদেরকে দেখতে পান?' শাহ আলম নামের মানুষটা জিজ্ঞেস করল। যেন ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক।

'এই তো মাস পাঁচেক হবে প্রায়। কিন্তু আপনি বুঝলেন কীভাবে?' অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা প্রশ্নটা করে ফেলল জাহিদ।

'কারওয়ান বাজারে আপনি যখন বাসে উঠছিলেন আপনার পিছনে পিছনে একটা কুকুরমুখো আসছিল। আর আপনি এমনভাবে হাঁটছিলেন যেন কোনও কিছু থেকে পালাচ্ছেন। আপনার পিছন পিছন আসতে আসতে ওটা কুৎসিত ভঙ্গিতে হাসছিল। ভয় পেতে দেখেছে যে আপনাকে এজন্যই। ভয় পেলেই ওরা পেয়ে বসে। হঠাৎ করেই চোখে পড়েছে ব্যাপারটা বলতে পারেন। তারপর দেখলাম আপনি বাসে উঠে পড়লেন আর ওটা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আপনার দিকে আঙুল তুলে শব্দ করে হাসতে লাগল। কোত্থেকে যেন আরেকটা এসে জুটল ওটার সাথে।' লোকটার মুখ হাসি হাসি। 'আপনি খুব ভয় পান ওদের, তা-ই না?' লোকটা যেন অভয় দিতে চাইছে জাহিদকে।

শাহ্ আলমের কথা সত্যি। অফিস থেকে খুশি মনেই বেরিয়েছিল আজকে জাহিদ। লিফট থেকে নামতেই চোখে পড়েছিল ওটাকে। শাহ আলম সাহেব ভাল নামই দিয়েছেন– কুকুরমুখো। কুকুরের মতই লম্বাটে মুখ ওদের। ভেবেছিল যথারীতি না দেখার ভান করে দ্রুত হেঁটে বাসে উঠে পড়বে। কিন্তু জাহিদ যে ভয় পেয়েছে সেটা বুঝতে পেরেই পিছু নিল ওটা।

'জি, খুব ভয় পাই।' জাহিদ স্বীকার করল।

'আরে মিয়া, এত ভয়ের কিছু নাই। ওরা আমাদের মানে আমরা যারা ওদের দেখতে পাই, তাদের কিস্যু করতে পারবে না। কিন্তু ওরা তো ওভাবে পিছু নেয় না সাধারণত।' শাহ আলম কিছুটা চিন্তিতভাবে বলে, 'আপনি কি নাপাক ছিলেন আজকে?'

'মানে?'

'মানে ধরেন, অনেক সময় শরীর নাপাক থাকলে ওরা ঘ্রাণ পায়, তখন পিছু নেয়। দাঁড়ায়ে পেশাব-টেশাব করার অভ্যাস নাই তো?'

'ইয়ে...মানে হ্যাঁ।' ইতস্তত করে স্বীকার করল জাহিদ। অফিসে তাড়াহুড়ায় বেশ কয়েকবার কাজটা করেছে সে আজকে।

'এই তো, পাওয়া গেছে।' উৎফুল্ল হয়ে ওঠে যেন শাহ আলম আবিষ্কারের আনন্দে। 'শোনেন, পাক-সাফ থাকলে ওরা সাধারণত কাছে আসে না। ওরা হলো পিশাচ। ময়লা-আবর্জনা খায়। দেখেছেনই তো বড় বড় ডাস্টবিনের আশপাশে ঘোরাঘুরি করে বেশি।' সিগারেটটায় লম্বা একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে লোকটা।

চা খাওয়া শেষে লোকটা নিজেই জোরাজুরি করে বিল দিল। তারপর বলল, 'আমার মোবাইল নম্বরটা রাখেন। জিরো, ওয়ান সেভেন, থ্রি...' নম্বরটা বলতে বলতে নিজের মোবাইলটা পকেট থেকে বের করে শাহ আলম। 'একটা মিস কল দেন। আপনার নম্বরটা সেভ করি।' জাহিদ মিসড কল দিল।

নম্বরটা সেভ করতে করতে মোবাইলের দিকে তাকিয়েই শাহ আলম বলে চলল, 'কোনও ভয় পাবেন না, বুঝলেন? পাক-সাফ থাকবেন। পেশাব করে কুলুপ নেবেন। ওদেরকে আমল দেবেন না। গায়ে নাপাক গন্ধ না হলে ওরা কাছে আসে না। আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ, কী বলেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' জাহিদ বলে ওঠে। 'ফোন নম্বর তো রইলই।

আপনি থাকেন কোনদিকে?'

'এই তো সেনপাড়া বাজারের পিছনেই।'

'আমার বাসা মিরপুর স্টেডিয়ামের কাছেই,' জাহিদ বলে।

জাহিদের বেশ ভারমুক্ত লাগে নিজেকে। আরেকজনকে পাওয়া গেছে। তারমানে এতদিন যে উদ্ভট মানুষের মত অথচ মানুষ নয় প্রাণীগুলোকে দেখত সে আর নিজেকে পাগল বা সিজোফ্রেনিয়া রোগী ভাবত, ব্যাপারটা সেরকম নয়। তার মতন আরও অনেকেই আছে। কিন্তু তার অর্থ হলো, পিশাচগুলোর অস্তিত্ব সত্যি সত্যিই আছে।

শাহ আলম বিদায় নিয়ে চলে গেল। জাহিদ বাসার দিকে এগোয়। অনেক প্রশ্ন ছিল তার মনে। লোকটাকে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা ছিল। করা হলো না। পরে একা হয়ে যেতেই চারদিকে তাকায়। এই এক মুদ্রাদোষ দাঁড়িয়ে গেছে ওর। চারদিকে যেন খুঁজতে থাকে ওগুলোকে। একটা ভয় কাজ করে সবসময় মনে। প্রায়ই ভিড়ের মধ্যে চোখে পড়ে দুয়েকটাকে। এখন অবশ্য একটাকেও দেখা গেল না। বাসার দিকে দ্রুত পা চালাতে থাকে জাহিদ রেজা।

তিন

ফ্ল্যাটটা ছোট। দুটো রুম, ড্রইং-ডাইনিং আর কিচেন। বড়জোর সাড়ে আটশ' স্কয়্যার ফিট হবে। জাহিদ আর তার ছোট ভাই নাহিদ এখানে থাকে। একটা কাজের ছেলে আছে। তার নাম হাবিব। রান্না আর বাজার থেকে শুরু করে সবই সে করে। নাহিদ একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ-তে পড়ছে। জাহিদের বাবা-মা দু'জনেই যশোরে থাকেন। বাবা সরকারি কর্মকর্তা। মা মাঝে মাঝে ঢাকায় এসে থাকেন। কিন্তু বেশিদিন থাকতে পারেন না। ঢাকায় নাকি তাঁর ভাল লাগে না।

বাসায় ফিরে দেখল নাহিদ তখনও ফেরেনি। সাড়ে সাতটা বাজে। জামাকাপড় ছেড়ে টিভি অন করে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। অন্যমনস্ক ভাবে চ্যানেল বদলাতে লাগল। আর ভাবতে লাগল আজকের ব্যাপারটা নিয়ে। এ

বছরের জানুয়ারি মাসের দিককার ঘটনা। নতুন একটা সফটওয়্যার কোম্পানিতে জয়েন করল জাহিদ। সুযোগটা হঠাৎ করেই এল। আগে যে ফার্মে কাজ করত সেখানে বেতন কম ছিল। ফার্মটার অবস্থাও ভাল ছিল না। ঢাকার অনেক সফটওয়্যার ফার্মের মতই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে এমন। নতুন জায়গায় জয়েন করল। এটাও ছোট কোম্পানি তবে পরিবেশ অনেক ভাল। বেতনও আগের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। নতুন বাসায় উঠেছে এরপরই। ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটল একদিন অফিস থেকে ফেরার সময়। অফিস থেকে সেদিন বেরিয়েছিল একটু দেরিতেই। শীতকাল বলে সন্ধে পার হয়ে গিয়েছিল ততক্ষণে। অফিস থেকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলো সিএনজির জন্য। শেষে একটা পেল যাকে বিশ টাকা বেশি দেবে বলে রাজি করাতে হলো। বিজয় স্মরণীর সিগন্যালে এসে সিএনজি থামল। এসময়টায় রাস্তায় বেশ ভিড় থাকে। সিগন্যালে আটকে পড়ে থাকতে হয় অনেকটা সময়। ক্লান্ত ছিল সে। জ্যাকেটের জিপার গলা পর্যন্ত টেনে দিয়ে বেশ জড়সড় হয়ে বসেছে। ঝিমুনি ধরে এসেছিল কিছু সময়ের জন্য। সিগন্যালে সিএনজিটা এসে থামতেই ঝিমুনিটা কেটে গেল। এই সিগন্যালটাতে আটকে থাকতে হয় সবচেয়ে বেশি সময়। অস্থিরভাবে লাল বাতিটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। ঠিক তখনই ঝাঁঝাল গন্ধটা নাকে এল ওর। পরিচিত গন্ধ। বড় বড় ডাস্টবিনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পাওয়া যায় এমন গন্ধের সাথে মৃদু অ্যামোনিয়ার মিশ্র গন্ধ। কিন্তু গাড়ি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার আশপাশে দৃষ্টিসীমার মধ্যে কোথাও ময়লা আবর্জনার ডাস্টবিন থাকার কথা নয়। নাকি আশপাশে কোনও সিটি কর্পোরেশনের আবর্জনার গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে? গন্ধ আরও তীব্র হতে লাগল।

পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক ঢাকতে যাবে, ঠিক তখনই সিএনজি'র দু'পাশ থেকে দুটো লোক উঠে বসল ওর পাশে। দুর্গন্ধ যেন আরও তীব্র হলো। লোকদুটোর গা থেকেই গন্ধটা আসছে। অজ্ঞান পার্টি, মলম পার্টি এগুলোর কথা শুধু শুনেই এসেছে এতদিন। আতঙ্ক অনুভব করল সে। ঠিক করল মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হব। 'আরে, আরে, আপনারা কারা? নামেন, নামেন গাড়ি থেকে।' বেপরোয়াভাবে চিৎকার করে উঠল জাহিদ। সিগন্যালে দাঁড়ানো অন্য গাড়ির মানুষরা যেন শুনতে পায়। দুইদিকে দুটো লোকের দিকে তাকাল সে। ভয়ে বুক হিম হয়ে গেল। এরা মানুষ হতে পারে

না। এরা কিছুতেই মানুষ হতে পারে না। দুঃস্বপ্ন কিংবা হরর ফিল্মের দৃশ্য যেন পুরোটাই। সোডিয়াম ল্যাম্পের লালচে আলোয় দেখল, তার দু'পাশে দুটো মানুষ বা মানুষের মত দেখতে কিছু একটা বসা, যাদের দু'জনেরই চেহারা বলতে গেলে একরকম। কুকুরের মতন লম্বাটে মুখ। থ্যাবড়া নাক। ছোট ছোট মাছের চোখের মতন নিষ্পলক চোখজোড়া অভিব্যক্তিহীন, হাসছে দুটোই। অন্তত ঠোঁট দেখে মনে হলো ওর। ব্যঙ্গ করে হাসছে যেন। যেন তুমুল মজা পাচ্ছে ওরা জাহিদের ভয় পাওয়া দেখে। শব্দহীন কুৎসিত হাসি। ছোট ছোট চোখা-চোখা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধে নাড়ি উল্টে এল ওর। আগের চেয়ে আরও জোরে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করে উঠল, 'নামেন, নামেন গাড়ি থেকে। এই ড্রাইভার দেখো না তুমি? এই...'

সিএনজির ড্রাইভার পিছন ফিরে বলল, 'কী হইল ভাই, চিৎকার করেন ক্যান?' যেন কিছুই হয়নি। যেন জাহিদের দু'পাশে বসে থাকা প্রাণীগুলোকে দেখতেই পায়নি ড্রাইভার। লোকদুটো গা দুলিয়ে হাসছে। শব্দ হচ্ছে না। এমন সময় সিগন্যাল ছেড়ে দিল। সব গাড়ি চলতে শুরু করেছে। সিএনজি থেকে নামার কোনও উপায় নেই। ভয়ংকর দেখতে নোংরা প্রাণী দুটোর মাঝখানে বসে জ্ঞান হারাল জাহিদ। অন্ধকার নেমে এল চোখে।

যখন জ্ঞান ফিরল, দেখল তাকে ঘিরে ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেছে রাস্তায়। পুলিশ সার্জেন্টের দিকে সবার আগে চোখ পড়ল ওর। প্রথমে কিছুক্ষণ মনেই পড়ল না কী হয়েছিল। উঠে বসল। সিএনজি থেকে নামিয়ে এনে রাস্তার পাশে ঘাসের উপর শোয়ানো হয়েছিল ওকে। চোখে-মুখে পানি ছিটানো হয়েছে টের পেল। যন্ত্রচালিতের মত পকেট হাতড়ে দেখে নিল মোবাইল ফোন, ওয়ালেট ঠিকঠাক আছে কি না।

'কী ভাই? কী হইছিল, বলেন তো?' সার্জেন্টের প্রশ্নে তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল জাহিদ কিছুক্ষণ। এরপর আধঘণ্টা ধরে যা ঘটল তা হলো পুলিশ সার্জেন্ট নানাভাবে তাকে জেরা করতে লাগল। সে কী ধরনের নেশা করে, নিয়মিত নাকি মাঝে মাঝে—এইসব। জাহিদের কোনও কথাই শুনতে চাইল না। জাহিদ যতই ঘটনাটা বোঝানোর চেষ্টা করে, সিএনজি চালক পুলিশ সার্জেন্টকে বলতে থাকে, 'সার, কোনও লোকই উঠে নাই গাড়িতে। এই লোক হঠাৎ চিৎকার দিয়া কাগো জানি গাড়ি থিকা নামতে কয়। আমি ভাবছি হয় পাগল নাইলে নেশা করছে। তার উপর ফিট হয়ে

গেল। এই জন্য সার সিগন্যাল ছাড়ার সাথে সাথে আপনার কাছে আইছি।'

একটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছিল জাহিদ। সিএনজি চালক সত্যি কথাই বলছে। কারণ তা না হলে পুলিশের কাছে নিয়ে আসত না তাকে। তা ছাড়া মোবাইল বা ওয়ালেটও খোওয়া যায়নি। তবে কি ভয়ঙ্কর কোনও দুঃস্বপ্ন দেখেছে সে? কেমন একটা ঝিমুনি অবশ্য ধরেছিল। সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এখন থেকে বাসে করে যাতায়াত করবে অফিসে। কাউকে কিছু বলল না। সেদিনের পর সে অনেক বার ওই রকম চেহারার লোকগুলোকে দেখেছে। রাস্তায়, বাসে, মার্কেটে, বাজারে–অসংখ্যবার। দেখলেই কীভাবে যেন চিনতে পারে ও। লোকগুলো না বলে প্রাণীগুলো বলা উচিত। অদ্ভুত শিথিল ভঙ্গিতে হাঁটতে থাকে। মাঝে মাঝে একে অন্যের দিকে তাকায়। ইশারা ইঙ্গিতে যোগাযোগ করে। ক্রমে ক্রমে জাহিদ এটাও বুঝতে পারে, ব্যাখ্যাতীত অতিপ্রাকৃত কোনও কারণে এই প্রাণীগুলোকে শুধু সে দেখতে পায়। আর কেউ পায় না।

ওই দিনের পর একটানা বহুদিন রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেছে জাহিদ। রাস্তায় নামলে ওগুলোকেই বারবার দেখা লাগবে, এই ভয়ে অফিস ছাড়া কোথাও যাওয়া বাদ দিয়েছিল। বন্ধুদের সাথেও যোগাযোগ কমিয়ে দিল। ছুটির দিনে সারাদিন বাসায় বসে থাকা শুরু করল। গল্পের বই-টই পড়ে, টিভি দেখে, ইণ্টারনেট ব্রাউজ করে সময় কাটায়।

ওর যে কিছু একটা হয়েছে এটা প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন জাহিদের মা। সেবার ঢাকায় এসে জাহিদের চেহারার হাল দেখে তিনি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। দেখলেন ছেলে শুকিয়ে গেছে। শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

অনেক চাপাচাপির পর মুখ খুলল জাহিদ। মাকে সব খুলে বলল। জাহিদের মা আনসারা বেগম প্রথমেই ওকে নিয়ে গেলেন তাঁর খালাত ভাই মাওলানা গিয়াসউদ্দীন আহমদের কাছে। এই মামাকে জাহিদ আর নাহিদ ছোট বেলা থেকেই চিনত হুজুর মামা নামে। খুব পরহেযগার মানুষ। ইব্রাহীমপুর জামে মসজিদে ইমামতি করেন এবং জামেউল কুতুব মাদ্রাসার বড় হুজুর তিনি। হুজুর মামা সব শুনলেন। একটা মাদুলিতে দোয়া পড়ে দিলেন। এরকম নাকি তিনি আগেও বহুবার শুনেছেন। ভয় পাওয়ার কিছু নেই–বললেন তিনি।

'আল্লাহ তায়ালার দুনিয়ায় দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান বহু নিদর্শন আছে।

ভাল ও খারাপ উভয়ই আছে। বিশ্বাসী মুমিন বান্দার কাজ হলো ঈমানকে আঁকড়ে ধরে সব প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করা। তুমি যখনই এগুলো দেখবা, তখনই আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে দুআ পড়তে থাকবা। সূরায়ে নাস মুখস্থ আছে না? পড়বা। ইনশাল্লাহ, জাদুটোনা আর শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবা।'

জাহিদের মাকে তিনি আলাদা ভাবে ডেকে বোঝালেন ছেলেকে কেউ তাবিজ করেছে। কুফরী কালামের প্রভাব নাকি অনুভব করছেন তিনি। মা বিচলিত হয়ে পড়লেন আরও।

জাহিদের ভয় কমল না। হয়তো টয়লেটে আছে, হঠাৎ করে মনে হতে থাকে টয়লেটের জানালায় আচমকা একটা ভয়ংকর মুখ উঁকি দেবে। সেদিনের দেখা সেই কুৎসিত হাসির দৃশ্য তখন চোখে ভেসে ওঠে।

শাহ আলম লোকটার সাথে পরিচয় হওয়ার আগে সবসময়ই সে ভেবেছে, সে একাই যেহেতু দেখতে পায় তার মানে তার হয়তো মাথায় কোনও সমস্যা হয়েছে, নয়তো সে পাগল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজকে তার ভয় যেন অনেকখানি কমে গেছে লোকটার কথাবার্তা শুনে।

বাইরে আবার বৃষ্টি। জানালার পাশে এসে দাঁড়াল সে। ল্যাম্পপোস্টের সাদা আলোয় বৃষ্টির কণাগুলোকে খুব অদ্ভুত লাগছে দেখতে। পৃথিবীটা খুব রহস্যময় একটা জায়গা, ভাবল সে মনে মনে।

চার

শুক্রবার সন্ধ্যায় শাহ আলমকে ফোন করল জাহিদ। বাসার ঠিকানা নিল। বলল দেখা করবে। বাসা খুঁজে পেতে কোনও সমস্যা হলো না। সেনপাড়া বাজারের পিছনে একটা দোতলা বাড়ির এক তলায় ভাড়া থাকে লোকটা।

জাহিদ আসায় খুব খুশি হয়েছে বোঝা গেল। একাই থাকে সে। কথায় কথায় জানা গেল ভদ্রলোকের পরিবার-পরিজন বলতে তেমন কেউ নেই। স্ত্রী মারা গেছেন বেশ ক'বছর হলো। ছেলেপুলেও ছিল না। তাই ভদ্রলোক

এক্কেবারে একা।

'শোনেন জাহিদ সাহেব। ওদেরকে মোটেই ভয় করবেন না।'

'কিন্তু, ওরা কী জিনিস? জিন বা ভূত ধরনের কিছু?'

শাহ আলম শব্দ করে হেসে ফেলল যেন খুব ছেলেমানুষি একটা কথা শুনেছে এইমাত্র। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলতে শুরু করল, 'এরা হলো পিশাচ। দেখবেন ওদের পলকহীন চোখে শুধু লোভ আর খিদের ছায়া। মানুষের সাথে খুব সহজেই মিশে যায়। সাধারণ মানুষ চিনতে পারে না ওদেরকে অথবা দেখতেই পায় না। সাদাসিধে পোশাক পরা থাকে। চেহারার বিশেষত্ব বলতে ওই সূচালো মুখ আর ওই চোখ।

'একদিন আমি শাহবাগের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি। দূরে দেখি রাস্তা ক্রস করার জন্য ডিভাইডারের উপর কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে দেখলাম একটা কুকুরমুখোকে। আমি অনেক দূর থেকেও ওদের চিনতে পারি। ছায়ার মত ঘোরে বদমাশগুলো। নিঃশব্দে।' শাহ আলমের চোখের দৃষ্টি বদলে যায় বলতে বলতে। 'হঠাৎ কী হলো, ডিভাইডারে দাঁড়ানো একটা মেয়েকে আলতো করে ধাক্কা দিল পিশাচটা। মেয়েটা তাল সামলাতে না পেরে একটা চলন্ত গাড়ির সামনে পড়ল। সাথে সাথে অ্যাক্সিডেন্ট। আমি পুরো থ। দেখি ওটা নির্বিকার হেঁটে চলে গেল। মেয়েটা মারাত্মক আহত হয়েছিল। পিজিতে ধরাধরি করে নিতে নিতেই শেষ। গাড়ির ড্রাইভারের কোনও দোষ না থাকা সত্ত্বেও পাবলিকের মার খেতে হলো। দেখলাম, ওই পিশাচটা আরও কতগুলো সঙ্গী মিলে হাসাহাসি করছে। সম্পূর্ণ ঘটনা ঘটল চোখের সামনে, বুঝলেন?' শাহ আলমের বলার ভঙ্গিতেই জাহিদ বুঝল সম্পূর্ণ ঘটনাটা ভদ্রলোকের চোখের সামনে এখনও ভাসছে।

হঠাৎ কী মনে হতে জাহিদ বলল, 'চলেন, দুইজনে মিলে একদিন একটাকে ধরি।'

'ভেবেছেন চেষ্টা করি নাই? ওইগুলারে ধরা যায় না। কীভাবে কীভাবে যেন পিছলায়ে যায়। আর যে বিশ্রী গন্ধ! থুহ্! কম তো দেখি নাই। আরেকদিন কী দেখলাম জানেন? দেখলাম যে, এক লোক বাস থেকে নামছে। তাকে পিছন থেকে এক পিশাচ ল্যাং মেরে ফেলে দিল। কেউ কিছু বুঝল না, দেখলও না। পড়ে যাওয়া লোকটার ডানহাত বাসের চাকার নীচে পড়ল। সাথে সাথে হাত গুঁড়া। চোখের পলকে যেন ঘটল এটা। বোঝেন তা

হলে।'

'আমাকে ছাড়া আর কাউকে কি পেয়েছেন, যে ওদেরকে দেখতে পায়?'

'একজনের সাথে পরিচয় হয়েছিল অনেকদিন আগে। একবার চিল্লায় গিয়েছিলাম। সেখানেই আলাপ-পরিচয়। সেই লোক আবার খুবই পরহেযগার। খুবই জ্ঞানী মানুষ। উনিই আমাকে সব বুঝিয়ে বলেছিলেন।'

'কী কী বলেছিলেন উনি?'

'যেমন ধরেন, এই পিশাচগুলো আসলে মানুষই। কিন্তু কঠিন পাপ করতে করতে মানুষের আত্মা যখন পাথর হয়ে যায় তখন ফেরেশতা আর মানুষের লানতের চোটে এরা পিশাচ হয়ে যায়। অশরীরীর মত ঘোরে মানুষের ক্ষতি করার জন্য। ইবলিশের দোসর হয়ে যায়। পিশাচগুলো ময়লা আবর্জনা আর নোংরা জায়গায় জিন্দালাশের মত ঘোরাঘুরি করে। কথা বলে না। অসাবধানী মানুষ পেলে তাকে নিয়ে নানা রকম খেলা খেলে, ক্ষতি করার চেষ্টা করে। রাতের বেলা মসজিদে যারা রাত জেগে ইবাদত করে, তাদের নানাভাবে ভয় দেখায়, যন্ত্রণা দেয়। দিনের বেলা লোকালয়ে নানান রকম দুর্ঘটনা, ফিৎনা-ফ্যাসাদ তৈরি করে। এইসব আর কী।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার বলে চলে শাহ আলম, 'আমিও আপনার মতই আগে খুব ভয় পেতাম। কিন্তু এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তবে, ওই মাওলানা সাহেব আমাকে একটা বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন। রাতের অন্ধকারে যেন নাপাক অবস্থায় নির্জন জায়গায় বেশি ঘোরাঘুরি না করি। কারণ আমরা যারা ওদের দেখতে পাই, তাদের উপরে ওদের খুব রাগ। এজন্য বলছি, জাহিদ সাহেব, একটু সাবধানে থাকবেন।'

হঠাৎ করে জাহিদের খেয়াল হলো রাত সাড়ে নয়টা বেজে গেছে। গল্পে গল্পে কখন যে সময়টা উড়ে গেল টের পায়নি। এখনি বাসায় ফেরা দরকার।

চলে আসার সময় শাহ আলম আবারও সাবধান করে দিল।

পাঁচ

শাহ আলমের সাথে সেদিন কথাবার্তা হওয়ার পর জাহিদ ইদানীং বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে রাস্তাঘাটে চলে। বেশ কিছুদিন পরের কথা। আষাঢ় মাসের

আরেক বর্ষণসিক্ত সন্ধ্যায় অফিস থেকে বাসায় ফিরল সে। গোসল করে ফ্রেশ হয়ে হাবিবকে রাতের খাবার দিতে বলে টিভি অন করে বসল। এমন সময় মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। নাহিদের ফোন।

'হ্যালো...'

'হ্যালো, ভাইয়া। আমি আজ রাতে বাসায় ফিরব না। সাজ্জাদের এখানে থাকব। কালকে একটা পরীক্ষা আছে। একসাথে পড়ব।'

'ওকে। কিন্তু কালকে তাড়াতাড়ি ফিরিস।'

ফোন কেটে দেয়ার সাথে সাথেই আবার বেজে উঠল। জাহিদ দেখল স্ক্রীনে কোনও নম্বর দেখাচ্ছে না। তার জায়গায় লেখা উঠেছে 'Private Number'। অস্বাভাবিক কিছু নয়। মাঝে মাঝেই ল্যাণ্ডফোন থেকে ফোন এলে অমনটা দেখায়। ফোন রিসিভ করল জাহিদ।

'হ্যালো, জাহিদ?' মায়ের গলা।

'হ্যাঁ, মা, কী হয়েছে?' মায়ের গলায় উদ্বেগের আভাস পেয়ে তড়াক করে সোজা হয়ে বসল ও।

'শোন, তোর আব্বার শরীরটা হঠাৎ খারাপ করেছে। ক্লিনিকে নেওয়া হয়েছে। তুই রাতেই রওনা দে।'

'মা, আব্বার কী হয়েছে? হ্যালো...হ্যালো, মা...' লাইন কেটে গেল।

এরপর আধ ঘণ্টার মধ্যে ঝড়ের বেগে প্রস্তুত হলো জাহিদ। নাহিদকে ফোনে চেষ্টা করেও পেল না। ফোন বন্ধ। হাবিবকে সাবধানে থাকতে বলে বেরিয়ে পড়ল। রাত বেশি হয়নি। মাত্র সাড়ে নয়টা বাজে। যশোরের বাস পেতে সমস্যা হবে না। গাবতলী থেকে বাসে উঠবে ঠিক করল। টিপটিপ বৃষ্টি উপেক্ষা করে মেইনরোড পর্যন্ত হেঁটে এল। একটা খালি রিকশা দেখে প্রায় দৌড়ে ওটার কাছে গেল।

'গাবতলী যাবে?'

'হুহ্' করে একটা শব্দ করল রিকশাওয়ালা। রিকশার হুডের নীচে গুটিসুটি মেরে বসে থাকা রিকশাওয়ালা নেমে দাঁড়াল। ভাড়া ঠিক করার সময় নেই। উঠে পড়ল। রিকশা পেতে সমস্যা হলো না বলে মনে মনে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিল সে। বৃষ্টির কারণে রাস্তাঘাট এরই মধ্যে বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে। জাহিদের বাবা আলিমুর রেজা সাহেব ছাপান্ন বছর বয়সেও দিব্যি সুস্থ সবল। হঠাৎ কী হলো আবার কে জানে। টেনশন অনুভব করল জাহিদ।

রিকশা মিরপুর দুই ও এক নম্বর পার হয়ে মাজার রোডের দিকে এগোল। বৃষ্টির বেগ বেড়েছে যেন একটু। রিকশার পলিথিনটা ভাল করে ছড়িয়ে দেয় জাহিদ। মিরপুর এক নম্বরের দোকানপাট প্রায় সব বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা কম। মাজার রোডের কাছে অন্ধকার মত একটা জায়গায় এসে রিকশার গতি কমল। এমন সময় গন্ধটা পেল জাহিদ। হঠাৎ যেন তার নাকে আঘাত করল গন্ধটা। সেই নাড়ি উল্টে আসা পচা গন্ধ। ধক্ করে উঠল বুকের ভিতরটা।

রিকশা থেমে গেল। রিকশাওয়ালা ধীরে ধীরে ঘুরে তাকাচ্ছে। সবকিছু যেন খুব ধীর গতিতে ঘটছে। জাহিদ জানে কী দেখতে চলেছে সে। পুরোপুরি ঘুরল রিকশাওয়ালা। নিচু করে রাখা মাথাটা ধীরে ধীরে তুলে তাকাল ওটা জাহিদের দিকে। আধো অন্ধকারেও চিনতে ভুল হলো না ওটাকে জাহিদের। সেই সাথে বিশ্রী গন্ধটাও পেতে শুরু করল। কড়া দুর্গন্ধ। চেতনা আচ্ছন্ন করে ফেলার মতন তীব্র আর কটু। ছোট ছোট পলকহীন চোখজোড়া একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ছাগলের চোখের মত নিষ্প্রাণ এক জোড়া অভিব্যক্তিহীন চোখ। লম্বাটে সূচালো মুখটা ছাড়া সারা চরাচরে আর কিছু নেই বলে মনে হতে লাগল ওর। ধীরে ধীরে কালচে দাগওয়ালা হলদেটে দু'সারি দাঁত বেরিয়ে পড়ল। নীরব হাসিতে ফেটে পড়েছে যেন ওটা। জাহিদকে ফাঁদে ফেলতে পেরে যেন যারপরনাই খুশি।

ঠিক তখনি জাহিদ একটা শব্দ শুনতে পেল। বৃষ্টিতে রাস্তায় পানি জমেছে। সেই পানি ভেঙে কারা যেন হেঁটে এগিয়ে আসছে। ছপছপ করে শব্দ আসছে তার। অসহায়ের মত শব্দের উৎসের দিকে তাকাল জাহিদ। ভয়ে আতংকে অবশ হয়ে আসতে চাইল ওর শরীর। পিশাচগুলো এগিয়ে আসছে ওর রিকশার দিকে পানিতে থপথপ শব্দ তুলে। অসাড় হয়ে বসে থাকা জাহিদের রিকশাটাকে ঘিরে ফেলল। দেরি করে ফেলেছে সে। রিকশা থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড় দেওয়ারও উপায় নেই এখন। নির্জন এলাকা। সাহায্য চেয়ে চিৎকার করেও লাভ নেই। তবু সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠতে চাইল ও। আওয়াজ বেরোতে চাইল না গলা দিয়ে। গোঁ গোঁ শব্দ হলো শুধু।

পিশাচগুলোর মুখগুলোকে আর হাসিহাসি লাগছে না। প্রচণ্ড রাগে যেন দাঁতে দাঁত চেপে কিড়মিড় করতে করতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। দৃষ্টিতে

প্রতিহিংসা। পেটের ভেতরটা কেমন হালকা হালকা লাগল জাহিদের। বমি আসার আগে যেমন লাগে। ঘাড় আর কানের কাছে ঠাণ্ডা একটা অনুভূতি। কিছুতেই জ্ঞান হারানো যাবে না–কিছুতেই না–দাঁতে দাঁত চেপে যেন প্রতিজ্ঞা করল জাহিদ।

চারটে হিসহিসে কণ্ঠ যেন সমস্বরে বলে উঠল, 'দে।' সবগুলো একসাথে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে জাহিদের দিকে। 'দিয়ে দে।' হাত বাড়িয়ে রাস্তার উল্টোদিকে ইশারা করল একটা পিশাচ। কলের পুতুলের মত ওই ইশারা করা হাত বরাবর তাকিয়ে দেখল একটা খালি লাশ বহন করার খাটিয়া পড়ে আছে রাস্তার পাশে। 'দে, শরীর দে। দাফন করুম। লাশ লাগব।' অচেনা ভাষায় শব্দগুলো কানে আসছে যেন জাহিদের; তাই অর্থ বুঝতে পারছে না যেন সে। এগোচ্ছে ওর দিকে কুকুরমুখো মানুষের দেহধারী পিশাচগুলো জিন্দালাশের মতন দু'হাত সামনে বাড়িয়ে। হুজুর মামার দেয়া মাদুলিটা চেপে ধরে সূরা নাস আর সূরা এখলাস সজোরে পড়তে লাগল দিশেহারা হয়ে ও। ভয় পাওয়া যাবে না। ভয় পাবে না সে। তাকে বাঁচতে হবে এদের কবল থেকে। যে করেই হোক। ভয় পেলেই শেষ।

খিক্ খিক্ করে ঠিক হাসি নয় যেন হাসির ভঙ্গি করে উঠল ওগুলো। আরও এগিয়ে এল ওর দিকে। জাহিদ এখন ওদের চার থেকে পাঁচ হাত দূরত্বের মধ্যে। কোনরকম পরিণাম চিন্তা না করে লাফ দিয়ে রিকশা থেকে নামল সে। লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল একটা পিশাচের উপর। ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল ওটা। ওটার পিচ্ছিল ভিজে ভিজে চামড়ায় হাত লাগতেই গা ঘিন ঘিন করে উঠল জাহিদের। স্পর্শটার বিশ্রী অনুভূতি মনে হয় কোনদিনই ভুলতে পারবে না ও। সব ভুলে হাতের ব্যাগ ফেলে প্রাণের তাগিদে উঠে দাঁড়াল। প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল রাজপথ ধরে। টের পেল পেছনে পেছনে ওগুলোও তাকে ধাওয়া করতে শুরু করেছে। রাস্তায় জমে থাকা অল্প পানিতে ছপাৎ ছপাৎ শব্দ তুলে আসছে। কিছুতেই পিছনে ফিরে তাকাবে না ঠিক করল জাহিদ। ছুটতে লাগল প্রাণপণে। কতবার হোঁচট খেতে খেতে উঠে দৌড়লো সে নিজেও জানে না। একটা ধ্রুব সত্যই শুধু জানে। পালাতে হবে তাকে। বাঁচতে হবে যে করেই হোক। চোখের সামনে ভাসছে পিশাচগুলোর চেহারা। কুকুরমুখো কতগুলো জিন্দালাশ। প্রাণপণে ছোটার গতি বাড়াতে চাইল সে। ফুসফুস যেন ফেটে পড়তে চাইছে। বেশ কয়েকবার মনে হলো

আর পারবে না সে। পড়ে যাবে যে-কোনও মুহূর্তে।

বহু ক্রোশ দৌড়ানোর পর যেন একটা আলোকিত জায়গার আভাস পেল জাহিদ। যখন মনে হলো পেছনে আর পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না, তখন থামল। সামনে অনেকগুলো ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। ওই তো একটা খাবারের হোটেল; আর বেশ কিছু দোকানও খোলা দেখা যাচ্ছে। ওই তো কত মানুষ। আসলে খুব বেশি দৌড়ায়নি সে। গাবতলীর কাছে এসে পৌঁছেছে সে। ক্লান্তিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল জাহিদ। বেঁচে গেছে সে এ যাত্রায়ও। হাপরের মত উঠানামা করছে বুক। ফুসফুসের বায়ুথলিগুলো যেন জ্বলছে। সবকিছুই দুঃস্বপ্ন বা কোনও হরর মুভির দৃশ্যের মতন মনে হচ্ছে। শরীরের সমস্ত কোষের শক্তি নিঃশেষ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল জাহিদ।

সংজ্ঞাহীন দেহটা রাস্তার লোকজনের চোখে পড়তে দেরি হলো না।

ছয়

সেই ঘটনার পর চারদিন কেটে গেছে। এই মুহূর্তে জাহিদ বসে আছে তার হুজুর মামার সামনে। মাওলানা গিয়াসউদ্দীন সাহেব চোখ বুজে বিড়বিড় করে দোয়া-কালাম পড়ছেন। আর মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে ওর শরীরে ফুঁ দিচ্ছেন।

ওই ঘটনার দিন রাতে রাস্তার লোকজন জাহিদকে অজ্ঞান-পার্টির শিকার ভেবে সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলে। পকেটে মোবাইল বা মানিব্যাগ না পেয়ে তারা নিশ্চিত হয় যে এটা অজ্ঞান-পার্টিরই কাজ। গাবতলীর কাছে মাজার রোডের ওই রাস্তায় নাকি প্রায় রাতেই অজ্ঞান-পার্টির শিকার হয় মানুষ। জ্ঞান ফিরেই একজনকে অনুরোধ করল একটা ফোন করতে দিতে। মাকে ফোন করল সে। ওপাশে মায়ের ঘুমজড়িত কণ্ঠ শুনতে পেল।

'হ্যালো।'

'হ্যালো, মা, আমি জাহিদ। আব্বা কেমন আছে?'

'জাহিদ, এত রাতে ঘুমোসনি, বাবা? রাত সাড়ে বারোটা বাজে। তোর আব্বা সুস্থ আছে, ভাল আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে। কী হয়েছে বল তো?' মায়ের কণ্ঠে উদ্বেগ।

'কিছু না, মা। খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।' বলে ফোন রেখে দিল। ফোন করে তার মায়ের গলা নকল করে এই ফাঁদে ফেলাটা যে ওই কুকুরমুখো পিশাচগুলোর কীর্তি, সেটা বুঝতে এক বিন্দু অসুবিধে হলো না জাহিদের। সে রাতে কাঁপনি দিয়ে জ্বর এল ওর। পরদিন খবর পেয়েই বাবা-মা দু'জনেই চলে এলেন ঢাকায়।

হুজুর মামার জর্দার গন্ধে ভুরভুর করা ফুঁ'তে যেন ঘোর কাটল জাহিদের। 'শোনো, বাবা। সাবধানে থাকবা। নামাজ-কালাম বাদ দিবা না। ভাল ভাল চিন্তা করবা...'

প্রচণ্ড রাগ উঠল জাহিদের। কেউ জানে না কত বড় বিপদ থেকে বেঁচে ফিরেছে সে। তার বর্ণনা কেউই বিশ্বাস করেনি তা বলাই বাহুল্য। তাকেই কেন এই শাস্তি পেতে হচ্ছে? কী অপরাধ তার? সে জানে আবারও কখনও না কখনও পিশাচগুলোর মুখোমুখি হতে হবে তার। নিস্তার নেই কোনও।

হুজুর মামার সামনে বসা অবস্থায়ই মোবাইল ফোন বেজে উঠল ওর। কে ফোন করেছে খেয়াল না করেই তাড়াহুড়া করে হুজুর মামার সামনে থেকে সরে গিয়ে ফোন রিসিভ করল সে। শাহ আলম সাহেবের গলা।

'হ্যালো, জাহিদ সাহেব, কেমন আছেন?' শাহ আলমের গলাটা যেন একটু খুশি খুশি লাগল।

'ভাল,' ঘটনাটা লোকটাকে জানাবে কি না ভাবছে। 'আপনার খবর কী?'

'বেশ কিছুদিন আপনার কোনও খোঁজ নেই। তাই খবর নিতে ফোন করলাম। সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো, নাকি? সাবধানে থাকবেন, বুঝলেন? তা হলেই কোনও ভয় নেই। আজকে ফ্রি আছেন তো, না? আসুন না বাসায়, আড্ডা দেয়া যাবে।'

জাহিদ ভাবল যাবে লোকটার বাসায়। সেদিনকার ঘটনা খুলে বলবে। 'ঠিক আছে, সন্ধের দিকে চলে আসব আপনার বাসায়।'

খুব খুশি খুশি মনে হলো শাহ আলম সাহেবের গলা, 'ওকে। তা হলে সে কথাই রইল। আসবেন কিন্তু। আসতে ভুলবেন না যেন।' ফোন কেটে গেল।

জাহিদের মনে হলো ভালই হলো। অন্তত এই লোকটা তো তাকে বিশ্বাস করবে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ফোন রিসিভ করার আগে জাহিদ যদি মোবাইলের স্ক্রীনটা লক্ষ করত তবে দেখতে পেত সেখানে শাহ আলমের নম্বরটা ওঠেনি। উঠেছিল 'Private Number'-সেইদিন রাতের মতন। স্বস্তির নিঃশ্বাসটা তা হলে হয়তো ফেলত না ও।

আহসানুল করিম

অপচ্ছায়া

ধুপ! ধুপ! ধুপ!

কারও পায়ের শব্দ!

ছাদে মিলিটারির মার্চ করার ভঙ্গিতে কেউ একটানা পায়চারী করে চলেছে।

ভয়ে জিভ শুকিয়ে গেল মায়ার। আজ মাত্র চব্বিশ দিন হলো এই বাসায় এসে উঠেছে ওরা। এই প্রথম একাকী এভাবে আছে সে। সত্যি বলতে কী এই প্রথম তার ঢাকায় আসা। আর সেটা একেবারের জন্যই। অপরিচিত এই শহরে সব অচেনা লাগে তার। কিন্তু আর কিছুই করার ছিল না। উভয় পক্ষের সম্মতিতে বিয়ে করবে ভেবে দীর্ঘ ছ'বছরের প্রেমের পরে যখন পরিবারকে বিয়ের কথা জানাল, দুই পরিবারই বেঁকে বসল। প্রেমের বিয়ে—এটাই আপত্তি তাদের। ছেলে মেয়ে প্রেম করেছে এতেই মান-সম্মান চলে গেছে দু'পক্ষের গার্জিয়ানের। শেষ পর্যন্ত তানভীরের সিদ্ধান্তে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের উপস্থিতিতে কাজী অফিসে বিয়ে করে ফেলল ওরা। ভেবেছিল একবার বিয়ে করে ফেললে দুই পরিবারই মীমাংসা করে মেনে নেবে তাদের। কিন্তু উল্টো খেপে গেল। দুই পরিবারই মুখ ফুলিয়ে বসে রইল। তানভীর পুরুষ মানুষ, তার যেটুকু না সমস্যা হচ্ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সমস্যা হচ্ছিল মায়ার। বাসা থেকে সবাই চাপ দিচ্ছিল কাজী অফিসের 'নাম কা ওয়াস্তে' বিয়ে ঝেড়ে ফেলে তার দুলাভাইয়ের আনা বিদেশি পাত্রের সাথে বিয়ে বসে সুখের দেশ ইতালীতে চলে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সব কিছু ঝেড়ে ফেলার জন্য তানভীরকে বিয়ে করেনি ও। সে কারণে তারা দুজনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেরাই নিজেদের পরিবারকে ঝেড়ে ফেলে লালবাগ কেল্লার কাছাকাছি এই লিফটবিহীন বাসার সাততলায় এসে উঠেছে।

সন্ধের আলো মিলিয়ে রাত নেমে গেছে। আর এই অঞ্চলের সিস্টেমটা অদ্ভুত। বিকেল বেলা এমনকী ঠিক সন্ধের আগ পর্যন্ত ঠিকই ইলেকট্রিসিটি থাকে। তারপর যেই মাগরিবের আজান পড়ল সাথে সাথে বিজলী বিবির আর

দেখা নেই। ডুবে যেতে হয় হতচ্ছাড়া অন্ধকারে। তারা এখনও ঠিক সংসার গুছিয়ে উঠতে পারেনি। সামান্য মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরির বলে তানভীর সাহস করে সংসার পেতেছে। এখনই জিনিসপত্রের ফিরিস্তি দিয়ে তানভীরের ব্যস্ত মাথাটাকে সে আর অস্থির করে দিতে চায় না। অল্প কিছু চলার মত আসবাবপত্র নিয়ে গুছিয়ে ফেলেছে ছোট্ট দুই রুমের সংসার। চৈত্রের গরমে অতিষ্ঠ হয়ে তানভীর অনেক কষ্টে কোত্থেকে গুলিস্তানের কোনও চোরাই মার্কেট থেকে একটা সবুজ রঙের সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ফ্যান কিনে নিয়ে এসেছে। মায়া ভেবেছিল ওকে একটা চার্জার লাইটের কথা বলবে। কিন্তু রাতে এত ক্লান্ত হয়ে ফেরে দেখে এত মায়া লাগে যে আর কোনও কিছু কেনার কথা বলতে ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া তানভীর রাতে যখন আসে তখন ইলেকট্রিসিটি থাকে আর ও বেরিয়ে যায় ভোর বেলা। ওর চোখে লোডশেডিংয়ের ব্যাপারটা ধরাই পড়ে না।

তাদের ফ্ল্যাটটা ছয়তলা বিল্ডিঙের ছাদের উপর দুই রুমের একটা বাসা। এটাকে ঠিক চিলেকোঠাও বলা যায় না। ছাদের অর্ধেকটা জুড়ে ভাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি করা। তানভীর অবশ্য ভাড়া নেয়ার সময় বলে নিয়েছে ছাদটাও তাদের অধিকারে। প্রয়োজন হলে ভাড়ার সাথে অতিরিক্ত কিছু টাকাও দিয়ে দেবে। পুরানো ঢাকার বয়স্ক বাড়িওয়ালা অবশ্য আর ছাদের জন্য ভাড়া নেয়নি। জানিয়েছে ছাদটা তারা নিজেদের মত করে ব্যবহার করতে পারবে। শুধু দরকার পড়লে বাড়িওয়ালারা একটু আধটু ব্যবহার করবে। ছয়তলার উপর হেঁটে হেঁটে কোনও ফ্যামিলি উঠবে এটা বাড়িওয়ালা আশা করেনি। এর আগে ছাত্ররা মেস করে থাকত।

ধুপ! ধুপ! ধুপ!

মিলিটারির মার্চ এখনও চলছে। এবারে একটু থেমে থেমে। ভারী জুতোর মানুষটা এখনও ছাদে ঠিকই পায়চারী করছে।

মায়া বিছানার উপর ভয়ে গুটিসুটি মেরে বসে রইল। রাস্তার দিকের জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে কিছুটা আবছা আলো এসে পড়েছে। সেই আবছায়ায় ঘরের মধ্যের সবকিছু ছায়া ছায়া লাগছে। কেমন আধিভৌতিক অবয়ব সব। তার বুকের মধ্যে ধুকপুক করতে লাগল। ডাইনিং-এর সাথে লাগোয়া রান্নাঘরে ম্যাচ আছে। বেডরুম ছেড়ে যেতে ভয় ভয় লাগছে।

মোমবাতি গতকাল ফুরিয়েছে। তানভীরকে সে আনতে বলতে ভুলে গেছে। তানভীর এত সকালে বের হয় যে তখন কিছু আনতে বলতেও মনে থাকে না। আরও কয়েকটা দিন গেলে সে সাততলা থেকে নেমে নীচের দোকান থেকে সংসারের প্রয়োজনীয় টুকটাক জিনিসপত্র নিয়ে আসতে শুরু করবে।

ছাদের ধুপ-ধাপ শব্দটা যেন এবার তাদের ছাদের লাগোয়া ড্রইংরুমের দরজার দিকেই এগিয়ে আসছে। মায়া ভয়ে আরও শক্ত করে বালিশ আঁকড়ে ধরল।

ঠক! ঠক! ঠক!

ডাইনিঙের বন্ধ দরজার সামনে মিলিটারি বুট থেমে কাঠের দরজায় শব্দ হলো।

মায়া কী করবে দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। অন্ধকারে রান্নাঘর থেকে হাতড়ে দা-বটি কিছু হাতে তুলে নেবে? নাকি জানালার কাছে যেয়ে চিৎকার করে ছয়তলার বাসিন্দাদের কাছে সাহায্য চাইবে! কিন্তু যদি ব্যাপারটা তেমন ভয়াবহ কিছু না হয়? তা হলে অতিনাটকীয় ব্যাপার হয়ে যাবে। আর তাকে কী লজ্জায় না পড়তে হবে!

আবার দরজায় ঠক ঠকাঠক শব্দ। এক নাগাড়ে।

মায়া সন্তর্পণে বিছানা থেকে নামল। চোখ সওয়া আলোয় পরিচিত রান্নাঘরের দিকে গেল। নির্দিষ্ট জায়গা থেকে হাতে তুলে নিল নির্দিষ্ট জিনিসটা। তারপর দুরু দুরু বুকে পায়ে পায়ে হেঁটে চলে এল ড্রয়িংরুমের দরজার কাছে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'কে? কে ওখানে?'

ওপাশ থেকে ঘড় ঘড় গলায় আওয়াজ উঠল, 'ভাবী! আমি! বাড়িওয়ালার ছেলে আমান। সেদিন তানভীর ভাইয়ের সাথে এসে আপনার সাথে পরিচিত হয়ে গেলাম।'

মায়ার ধড়ে যেন একটু প্রাণ ফিরে এল। বাড়িওয়ালার ছেলে। এর সাথে নিশ্চয় খারাপ ব্যবহার করা যায় না। তা হলে বাড়িওয়ালা হয়তো বাড়ি থেকে উঠিয়ে দেবে। তারচেয়ে বড় ব্যাপার তানভীরও রাগ করবে। অনেক কষ্টে অল্প ভাড়ার এই বাড়িটা খুঁজে পেয়েছে। ঢাকা শহরে বাড়ি পাওয়া সোনার হরিণের মত।

মায়া দরজা না খুলেই একটু নরম গলায় বলল, 'কিছু বলবেন, ভাই?'

'জ্বে। একটা জিনিস চাইছিলাম এট্টু।'

'কী?'

'একটা ম্যাচিস। মানে দিয়াশলাই। ছাদে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সিগারেটের তৃষ্ণা পেয়ে গেল। পকেট হাতড়ে সিগারেট পেলেও ম্যাচিস আর খুঁজে পেলাম না। তখন আপনার কথা মনে পড়ল। ভাবলাম ভাবীর কাছ থেকেই চেয়ে নেই।'

মায়া ফট করে দরজার ছিটকিনি খুলে ফেলল। তারপর দরজায় দাঁড়িয়ে মুঠো ভরা হাত বাড়িয়ে বলল, 'এই নিন।'

আমান বিস্মিত চোখে চাদরের মধ্য থেকে পুরুষালী লোমশ হাত বের করে মায়ার দিকে বাড়িয়ে দিল। ম্যাচ চাইতেই পেয়ে সে একটু অবাকই হয়েছে। মায়া রান্নাঘর থেকে কিছু না পেয়ে ম্যাচই নিয়ে এসেছিল। আলো, আগুন অনেক সময় অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করে।

আশপাশ থেকে আসা আলোয় আমানকে দেখে মায়া ভেতরে ভেতরে একটু চমকে উঠল। লোকটাকে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থের মত লাগছে। একটু টলছেও কি? আর এই গরমে একটা চাদর জড়িয়ে আছে। আজব! সেই চাদর থেকে অদ্ভুত একটা গন্ধ বের হচ্ছে। মায়া গাঁজার গন্ধের সাথে পরিচিত নয়, নইলে সহজেই ধরে ফেলত গন্ধটা কীসের। চাদরের নীচে সরু জিন্সের প্যান্ট। অন্ধকারে সব কালো লাগছে। সে লোকটার পায়ের দিকে তাকাল। ওরকম মার্চের আওয়াজ আসছিল কোত্থেকে? লোকটার পায়ে বাটা কোম্পানির বুট জাতীয় এক ধরনের জুতো।

লোকটা মায়ার হাত থেকে ছোঁয়া এড়িয়ে ম্যাচ নিল। কায়দা করে ঠোঁটে ঝুলানো সিগারেট ছাদের বাতাস এড়িয়ে ধরিয়ে আগুন ঠিক রাখার জন্য কষে একটা টান দিল। আর লোকটার গায়ের গন্ধের মত উৎকট তীব্র কড়া একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।

লোকটা ম্যাচ ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'নেন, ভাবী। এবার দরজাটা বন্ধ করে দেন। আমি আরও কিছুক্ষণ ছাদে থাকব। তারপর নেমে যাব। আপনার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো আমি ছাদে থাকায়?'

অসুবিধে হলেও সেটা মুখ ফুটে বলা যাবে না। একে তো বাড়িওয়ালার ছেলে তারপর আমরা সবাই সভ্য সমাজে বাস করি।

মায়া তেলতেলে স্বরে মাথা নেড়ে বলল, 'না, না, কোনও অসুবিধা নেই।'

লোকটা অন্য দিকে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'হয়তো আপনিও ছাদে আসতে চেয়েছিলেন।'

'না, মানে আমার এখন ঘরে কাজ আছে। রাতের রান্না বসাতে হবে।' মায়া লোকটার মুখের উপর দরজা বন্ধ করতে পারছে না। আবার লোকটার সরে যাওয়ারও কোনও নাম নেই। যেন দরজায় দাঁড়িয়ে তার সাথে খোশগল্প করতে এসেছে।

মায়া আর ভদ্রতা না করে আস্তে আস্তে দরজা ঠেলতে লাগল। তাই দেখে লোকটা একটু পিছিয়ে ছাদের ও-প্রান্তে চলে গেল।

মায়া দরজা বন্ধ করে ঘরে এসে ম্যাচের কাঠি জ্বেলে জ্বেলে মোমবাতির শেষ অংশ খুঁজতে থাকল। আর তখনই ইলেকট্রিসিটি চলে এল।

রাত এগারোটার দিকে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ডাইনিং টেবিলে রাতের খাবার খাওয়ার সময় ভাবল মায়া তানভীরকে বাড়িওয়ালার ছেলের উৎপাতের কথা বলবে। কিন্তু তানভীর নিজেই তার 'রেভকো ফার্মা'র সমস্যার কথা শুরু করে, 'নতুন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা ফুলফিলমেণ্ট হচ্ছে না। ডাক্তাররা নতুন ওষুধ লিখতে চায় না। তাদের নানারকম উপঢৌকন দিতে হয়। কোম্পানি কিছুটা বিয়ার করলেও 'এম আর'দের নিজেদের পকেট থেকেও কিছুটা যায়। যেটার কোনও হিসেব হয় না। কোম্পানি থেকে আরও সময় বাড়িয়ে আরও বেশি ডাক্তারদের ভিজিট করতে বলেছে। অথচ বেতন বাড়ানোর নামে খোঁজ নেই। ঘোড়ার ডিমের প্রতিষ্ঠান। অন্য কোনও ফার্মা থেকে ভাল অফার পেলে এটা সে ছেড়েই দিত। তানভীর গজগজ করতে থাকে। এর মধ্যে বাড়িওয়ালার পোলার প্রসঙ্গ তুললে তানভীর হয়তো তার উপরেও রেগে যাবে। রাত দশটা পর্যন্ত ডাক্তারদের ভিজিট করে আসার পর তানভীরের মেজাজ একটু হট হয়ে থাকে।

পরিশ্রান্ত মানুষের বোধ হয় আবেগ ভালবাসাও পরিশ্রান্ত হয়ে যায়। তাদের বিয়ের দুই মাস না পেরুতেই রাতের ভালবাসা কেমন জানি কমতে শুরু করেছে। ও এত ক্লান্ত থাকে যে কিছু বলতেই কেমন জানি মায়া লাগে। একটু কথাবার্তা শুরু করলেই ওর উত্তর এক শব্দে চলে আসে। 'হ্যাঁ, হুঁ, না, উঁ' এই জাতীয় উত্তর দিতে দিতে ঠুস করে ঘুমিয়ে পড়ে সকাল সাতটায় উঠে পড়তে হবে বলে।

আজও এর ব্যতিক্রম হলো না। কাল অফিস ডে। বিছানায় গা এলিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল তানভীর। ওর একটা ভাল দিক, নাক ডাকে না। তালে তালে নিঃশ্বাস পড়ছে তানভীরের। নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া ঘরের মধ্যে আর কোনও শব্দ নেই। লাইট জ্বলা অবস্থায়ও ঘুমিয়ে পড়তে পারে বেচারা। মায়ার আবার সব অন্ধকার করে না দিলে ঘুম আসে না। তানভীর আগে ঘুমায় বলেই দেয়ালের দিকটাতে ঘুমায়। তানভীরের এক ঘুমেই রাত কাবার। কিন্তু শোবার আগে পানি খায় বলে মায়ার উঠে বাথরুমে যেতে হয়। তা ছাড়া দেয়ালের দিকে ঘুমালে তার দম বন্ধ দম বন্ধ লাগে। তানভীরের দেয়ালের পাশ, বাইরের পাশ নিয়ে কোন চেতভেদ নেই।

বাথরুম সেরে পানি খেয়ে লাইট অফ করে দিয়ে মায়া বিছানায় এলো। তানভীর ঘুমাচ্ছে। মায়া চিত হয়ে সটান শুয়ে রইল। তার ঘুম আসছে না। ঘুম সহজে আসার কথাও নয়। সে প্রায় সারাদিনই পড়ে পড়ে ঘুমায়। তানভীর অফিসে চলে গেলে তার আর তেমন কোনও কাজ থাকে না। তখন একলা বাসায় পড়ে পড়ে কয়েক শিফটে ঘুম দেয় সে। সকালের শিফট, দুপুরের শিফট, বিকালের শিফট। সে কারণে রাতে তার ঘুম আসতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যায়। এমনকী কয়েকদিন সে ফজরের আযান পর্যন্ত শুনেছে।

ঘরে কোনও আলো নেই। আধখোলা জানালা দিয়ে স্ট্রিট লাইটের খুব ক্ষীণ একটা আলোয় ঘরটা আলোকিত। আর সুইচ বোর্ডের ইনডিকেটর লাইটের লাল আলোও বেশি রাত হলে কেমন যেন উজ্জ্বল হয়ে গোটা ঘর আলোকিত করে দেয়। তখন আবছা আলোয় ঘরের প্রতিটি আসবাবপত্র দেখা যায়।

ঘুম না আসার কারণে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে ঘরের প্রতিটি আসবাবপত্র দেখতে লাগল। নতুন পুরানো মিলিয়ে দুজনের সংসার কোনওমতে চলে যাওয়ার মত জিনিসপত্র। একটা নতুন আলমারী। একটা ওয়ার্ডরোব। হঠাৎ ওয়ার্ডরোব থেকে চোখ চলে গেল সিলিং ফ্যানের দিকে। চিত হয়ে শোয়ার কারণে মাথার উপরে ঘুরতে থাকা সিলিং ফ্যানের দিকেই সরাসরি চোখ চলে যায়। পুরানো হওয়ার কারণে অদ্ভুত ক্যাচক্যাচে একটা শব্দ করেই ফ্যানটা চলে। যখন বন্ধ হয় তখন ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ হয়। যেন মনে হয় সিলিং সহ ফ্যানটা ভেঙে মাথার উপর পড়বে।

মানুষের চিন্তার কী কোনও প্রতিফলন হয়? নাকি ব্যাপারটা কাকতালীয়?

সে ফ্যান ভেঙে মাথার উপর পড়ার কথা ভাবতে ভাবতেই ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। আর ঘড়ঘড় যান্ত্রিক গোলযোগের শব্দে ঘটাং ঘটাং করে ফ্যানটা থেমে গেল।

গরমে তানভীর একটু আড়মোড়া ভেঙে নড়েচড়ে পাশ ফিরে শুলো। মায়া তানভীরকে ডিঙিয়ে আধভেজা জানালাটা পুরোপুরি খুলে দিল। রাস্তার আলো এবং মাঝরাতের আকাশের খণ্ডিত চাঁদের আলোয় ঘরের ভেতরে আবছায়ার সৃষ্টি হলো। বাতাস পড়ে গেছে। গরমে হাঁসফাঁস লাগছে। সাততলায় হওয়ায় কেউ দেখবে না। শরীর থেকে শাড়ি ব্লাউজ সব খুলে ফেললে কেমন হয়? মায়া একবার জানালার দিকে তাকিয়ে একটানে শাড়ি খুলে বিছানার মাথার কাছে রাখল। তারপর ব্লাউজ খোলার জন্য হুকে হাত দিতেই তার মনে হলো কেউ তাকে দেখছে। সে সাথে সাথে দুই হাত বুকের উপর রেখে বুকটাকে আড়াল করতে চাইল। তারপর আবছায়ার মধ্যে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করে কেন তার এমনটি মনে হলো।

কোথাও কেউ নেই।

থাকার কথাও নয়। এই সাততলার রাস্তার পাশের জানালায় কোনও চোরের বাপের সাধ্যি নেই ওঠার। হঠাৎ তার চোখের দৃষ্টিপথে এক জোড়া ঝুলন্ত পা বাতাসে নড়ার মত নড়ে উঠল। সে হতভম্বভাবে পায়ের অনুসরণ করে উপরের দিকে তাকিয়ে ভয়ে বিস্ময়ে হিমশীতল হয়ে গেল।

স্থির হয়ে থাকা সিলিং ফ্যানের সাথে গলায় ফাঁস নিয়ে কেউ একজন ঝুলছে।

একজন মেয়েমানুষ! শাড়ির আঁচল পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস নিয়েছে মেয়েটি। প্রায় তারই বয়সী হবে। শাড়ির আঁচল দিয়ে ফাঁস নেয়ার কারণে কিছুটা কাপড়-চোপড় এলোমেলো হয়ে শরীরের অনেক অংশ দেখা যাচ্ছে। পায়ের উপর থেকে ছায়া এবং বুকের কাছে ব্লাউজের অবয়ব দৃশ্যমান। ফাঁস নেয়ার কারণে মেয়েটার চোখ বড় বড় হয়ে যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে জিবের কিছু অংশ। জিবটায় ঠোঁটের এক পাশে দাঁত কেটে বসে গেছে।

কতটা সময় ওই বীভৎস দৃশ্যটির দিকে তাকিয়ে ছিল সে বলতে পারবে না। হয়তো এক সেকেণ্ড হবে কিন্তু তার মনে হয়েছে অনন্তকাল। সে সাথে সাথে ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে। একটা

অবশের মত অনুভূতি তার সমস্ত শরীরের ভেতর দিকে প্রবাহিত হয়ে তাকে চরম একটা ধাক্কা দিয়ে গেছে। সে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে থাকা তানভীরের গায়ে হাত দিয়ে একটু ধাক্কা দিল। তানভীরকে ডাকতে যেয়ে দেখে গলা দিয়ে কোনও শব্দ বের হচ্ছে না। সে আবার ধাক্কা দিল।

তানভীর পাশ না ফিরেই ঘুম জড়ানো স্বরে বলল, 'উঁ।' বলতে বলতে আবার গভীর ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেল।

হঠাৎ অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধে ঘর ভরে গেল। গন্ধটা কিছুটা বকুল ফুলের সাথে কর্পূর মেশানো। তার সেই গন্ধের সাথে সাথে তার ভয়ও যেন কর্পূরের মত উবে গেল।

সে মাথার কাছ থেকে শাড়িটা টেনে নিয়ে বুকের উপর ওড়নার মত করে পেঁচিয়ে নিল। তারপর প্রবল সাহসের সাথে আবার তাকাল সিলিং ফ্যানের দিকে।

আশা করেছিল তার চোখের ভুল মুহূর্তেই মিলিয়ে গিয়ে দেখতে পাবে ফ্যানের সাথে কিছুই ঝুলে নেই। কেউ ফাঁস নিয়ে নেই।

সিলিং ফ্যানের সাথের মেয়েটা আছে। তবে এবার দৃশ্যটা একটু পরিবর্তিত হয়েছে। অর্ধ বিবস্ত্র মেয়েটা যেন আর ফ্যানের সাথে ঝুলে নেই। যেন সে ফ্যানের নীচে বাতাসে শরীর জুড়ানোর মত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে। তার খোলা চুল উড়ছে বাতাসে। শাড়িটাও খুব সুন্দর করে শরীরে পরা। চোখ বড় বড় হয়ে নেই। স্বাভাবিক। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে নেই জিবের অংশ।

মায়াকে ওরকম হতবিহ্বল ভাবে তাকাতে দেখে মেয়েটা ঠোঁট নাড়িয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'আমি তোমার মতই মেয়ে। একটি মেয়েকে দেখে অমন লজ্জা পাওয়ার কী আছে? তুমি তো দেখি লজ্জায় অধোবদন হয়ে গেছো।'

মায়ার গলা দিয়ে কোনও শব্দ বের হলো না। তার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? না হলে সে এসব দেখছে কেন? আর এরকম ভাবে কথা শুনছেও বা কীভাবে? এই সব কি সে কল্পনা করছে? নাকি স্বপ্ন দেখছে? সে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছে।

ফ্যানের নীচের মেয়েটা দুহাত মাথার উপর তুলে উড়তে থাকা এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করতে করতে আগের মতই ফিসফিস করে বলে

উঠল, 'তুমি তো দেখি ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছো। এখনকার যুগের মেয়েদের এতটা ভীতু হলে চলে না। আমিও তোমার মত ভীতু ছিলাম বলে আজ আমার এই অবস্থা হয়েছে।'

মায়া বিছানার উপর আড়ষ্ট হয়ে ভীতু গলায় ফিসফিস করে বলল, 'কী অবস্থা হয়েছে?'

'তুমি নিজের চোখে দেখেও বুঝতে পারছ না? ওরা আমাকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে সিলিং ফ্যানের সাথে।'

'কারা?'

'আমার স্বামী আর দেবর। ওরা পরিকল্পিত ভাবে আমাকে মেরে ফ্যানের সাথে ঝুলিয়ে রটিয়ে দিয়েছে আত্মহত্যা করেছি। অথচ আমি আত্মহত্যা করিনি।'

'ওরা কেন তোমাকে মেরেছে?'

'আমার দেবরটাই ছিল শয়তানের হাড্ডি। ও আমাকে কুপ্রস্তাব দিয়েছিল। আমি ওর সেই প্রস্তাবে সাড়া না দেয়ায় ও পরিকল্পিতভাবে ওর এক বন্ধুকে দিয়ে আমাকে হেনস্থা করায়। আমার স্বামীর কান ভাঙানি দেয় আমার নামে। ওর বন্ধুকে হাত করে বন্ধুকে জড়িয়ে আমাকে অসতী প্রমাণ করে। আর ওর সেই শয়তান বন্ধুটিও আমার স্বামীর সামনে যেয়ে স্বীকার করে যে আমার সাথে তার পরকীয়া আছে। তারপর একদিন আমার স্বামী আর দেবর মিলে আমাকে গলা টিপে মেরে আমার শাড়ি দিয়ে ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলিয়ে রটিয়ে দেয় আমি আত্মহত্যা করেছি।'

'তোমরা আইনের আশ্রয় নাওনি?'

'এদেশের আইন টাকায় চলে। ওরা টাকা খাইয়ে পুলিশ আর ডাক্তারকে হাত করে। একমাত্র আপনজন আমার মা ওই শয়তানদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না। ওরা আমাকে খুন করে আত্মহত্যা বলে প্রচার করে দিব্যি পার পেয়ে যায়।'

'তুমি আমাদের ঘরে এলে কীভাবে? তোমরা কি এই বাসাতেই থাকতে?'

'উঁহুঁ। আমি তোমাদের সিলিং ফ্যানের সাথে চলে এসেছি। এই ফ্যানেই আমাকে ঝুলিয়ে আত্মহত্যা বলে চালানো হয়। এটা ছিল আমাদের বেডরুমের ফ্যান। মরার পরে প্রতি রাতে আমি ফ্যানে ঝুলে আমার স্বামী আর তার নতুন বউকে নানারকম ভয় দেখাতাম। শেষে অতিষ্ঠ হয়ে আমার

স্বামী পুরানো মার্কেটে ফ্যানটা অল্প দামে বিক্রি করে দিয়ে আমার হাত থেকে মুক্তি পায়। পুরানো মার্কেটে কিছুদিন বন্দি হয়ে থাকার পর তোমার স্বামী আমাকে কিনে নিয়ে আসে। আর এখন আমি কথা বলার একজন সঙ্গী পেয়েছি। তুমি সারাদিন ঘরের মধ্যে একাকী থাক। আর সিলিং ফ্যানে ঝুলে আমারও খুব একা একা লাগে। তুমি আমার বন্ধু হবে? তা হলে আর দুজনের কারোরই একাকীত্ব থাকবে না। বলো না আমার বন্ধু হবে?'

মায়া কিছু বলে ওঠার আগেই সিলিং ফ্যানে ঝুলতে থাকা মেয়েটা বনবন করে ঘুরতে থাকে। সারা ঘরে একটা বিজবিজানির শব্দে ভরে যায়। ইনডেকিটরের লাল আলো জ্বলে ওঠে। বিজলী বিবি চলে এসেছে।

মায়া মাথার কাছে হাতড়ে বেড সুইচ অন করে দেয়। গোটা ঘর আলোয় ভরে ওঠে। মাথার উপরে ঘুরতে থাকা ফ্যানের দিকে তাকিয়ে দেখে সবুজ রঙা ফ্যানটা বনবন করে ঘুরছে। সেখানে সেই হতভাগা নিঃসঙ্গ মেয়েটা ঝুলে নেই।

তানভীর অফিসের কাজে সাত সকালে বেরিয়ে যায়। ফেরে রাত দশটার পর। পুরো একটা নিঃসঙ্গ দিন। টাকার অভাবে এখনও টেলিভিশন কেনা হয়ে ওঠেনি। প্রথম কিছুদিন গল্পের বই-টই পড়লেও এখন মায়ার আর ভাল লাগে না। মফস্বলের সেই কলেজ থেকে ডিগ্রিটা কমপ্লিট করলে না হয় সে-ও একটা চাকরি বাকরির চেষ্টা করে তানভীরের উপর থেকে সংসারের ঘানি টানার বোঝা কিছুটা লাঘব করত। গত রাতে ফ্যানে ঝোলা মেয়েটাকে দেখার পর মেয়েটার উপরে কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে। তার নাম মায়া হওয়ায় সবকিছুতে তার কেমন যেন একটা মায়া পড়ে যায়। তা ছাড়া নিঃসঙ্গ বাড়িতে মেয়েটার সাথে একটু কথাবার্তা বলতে পারলে, মেয়েটার গল্প শুনতে পারলে বা একটু সাহস করে তার নিজের গল্প বলতে পারলে ভালো লাগত।

সে প্রায় সারাটা দিন মেয়েটার প্রতীক্ষায় কাটিয়ে দেয়। আজ আর দিনে ঘুমিয়ে পড়ে না। যদি ঘুমিয়ে গেলে সে মেয়েটাকে দেখতে না পায়। এমনকী এই গরমের মধ্যেও বার কয়েক সে ফ্যান বন্ধ করে রেখে দেখেছে মেয়েটা আসে কিনা। মেয়েটা আসেনি।

সন্ধেয় ইলেকট্রিসিটি চলে যেতেই মেয়েটা আসে। মেয়েটার দেখা পেতেই প্রচণ্ড একটা ভয় তাকে জ্বরের মত আচ্ছন্ন করে ফেলে। তারপর ভয়

হঠাৎ করেই কেটে যায়। তখন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মত অনুভূতি হয়। আর মেয়েটার সাথে কথা বলতে ভাল লাগে।

আজ সে মেয়েটার নাম জানতে পারে। জলি। তার মতই মফস্বলের ভীতু একটা মেয়ে। ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। সুন্দরী ছিল বলে আর পড়াশুনা হয়নি। বাপ মরে যাওয়া গরীবের ঘরের সুন্দরী মেয়ে সমাজ সংসারের সবার দাবীদার হয়ে পড়ে। তার মা তাড়াতাড়ি বড়লোকের ঘরে তাকে বিয়ে দেয়। কিন্তু ভীতু স্বভাবের কারণে শ্বশুর শাশুড়িকে বলতে পারেনি তার দেবর ও তার বন্ধুর কুকীর্তির কথা। মায়াও তার গল্প করে। তার বাড়ির গল্প। ভাই বোনের গল্প। তানভীরের সাথে প্রেমের গল্প। বিদেশি পাত্রের গল্প। তারপর কাজী অফিসে বিয়ে করে এই বাসা ভাড়া নেয়ার গল্প। দুজনের সুখ দুঃখের গল্প আর শেষ হয় না। সময় মত ইলেকট্রিসিটি চলে আসে।

একদিন মাঝরাতে হঠাৎ গরমে তানভীরের ঘুম ভেঙে যায়। সে চোখ মেলে দেখে মায়া বিছানায় উঠে বসে একা একা কার সাথে জানি কথা বলে যাচ্ছে। সে আর মায়াকে কিছু জিজ্ঞেস না করে ঘুমিয়ে পড়ে। ইলেকট্রিসিটি থাকা সত্ত্বেও মায়া কেন ফ্যান বন্ধ রেখেছে সেটাও সে জিজ্ঞেস করে না।

পরের রাতেও একই ঘটনা। তানভীরের খটকা লাগে। কিন্তু বলি বলি করেও আর বলা হয় না। এরই মধ্যে কয়েকটা দিন কেটে যায়। ছুটির দিনে দুজনে দর্শনীয় স্থান লালবাগ কেল্লা, আহসান মঞ্জিল দেখে ঘুরে ফিরে আসে। লালবাগ কেল্লার নির্জনে একান্ত বসে তানভীর আদুরে গলায় বলে, 'মায়া, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? কিছু মনে করবে না তো?'

মায়াও আদুরে গলায় বলে, 'আশ্চর্য, আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে তার জন্য অনুমতি নিতে হবে? আর এতে মনে করাকরির কী আছে?'

'না, মানে কয়েকদিন জিজ্ঞেস করব করব ভেবেও করা হয় না।'

'কী কথা এত ভণিতা না করে জিজ্ঞেস করে ফেললেই তো হয়।'

'আচ্ছা, তার আগে বলো তো তুমি গত কয়েকদিন আমার কাছ থেকে কোনও কিছু লুকাচ্ছ কিনা।'

মায়া একটু চুপ করে থেকে বলে, 'হুঁ, একটা বিষয় ঠিক লুকাচ্ছি তা বলা যায় না। তুমি বিশ্বাস করো কিনা ভেবে আর বলতে সাহস পাইনি।'

'কী কথা?'

'ও তুমি বিশ্বাস করবে না। বড়ো অদ্ভুত কথা।'

'শুনিই না তোমার সেই অদ্ভুত কথা। তারপর না হয় বিশ্বাসের প্রশ্ন।'

'তার আগে তুমিই বলো তুমি আমার কাছে কী জানতে চাইছিলে? তুমি আগে জিজ্ঞেস করেছো, তুমি আগে বলবে।'

'বেশ। গত কয়েকদিন রাতে গরমে আমার ঘুম ভেঙে গেলে দেখেছি তুমি বিছানায় উঠে বসে বিড় বিড় করে কী জানি বকছ। ভাবটা যেন কারও সাথে তুমি কথা বলছো। প্রচণ্ড গরমেও তুমি ফ্যান বন্ধ করে রেখেছো সেটাই দেখেছি। অথচ তোমার গায়ে জ্বর জারির কোনও চিহ্ন দেখিনি।'

'তুমি তা হলে জিনিসটা খেয়াল করেছো?'

'হুঁ। ব্যাপারটা কী? তোমার কি মাথাটাতা খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাকি?'

'আমি ওই কথাটাই বলব বলেই বলেছিলাম তুমি বিশ্বাস করবে না। দেখেছো এখন বলছো আমার কি মাথাটাতা খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাকি।'

'ঘটনা কী, খুলে বলো তো।'

'ঘটনা হচ্ছে আমি একটা মেয়ের সাথে কথা বলি।'

'মেয়ের সাথে?'

'হ্যাঁ, মেয়ের সাথে। মেয়েটার স্বামী মেয়েটাকে খুন করে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিয়েছে।'

'কী বলছ এসব আবোল তাবোল? সে মেয়েটা থাকে কই?'

'বাহ্, মরা মানুষ কোথায় থাকবে। বাসা বাড়িতে থাকবে নাকি!'

'আমারও তো সেইটাই প্রশ্ন। মরা একজন মানুষের সাথে তুমি কথা বল কীভাবে?'

'আমি ঠিক জানি না। কিন্তু আমি কথা বলি। মেয়েটার নামও জানি। জলি। মেয়েটা আমাদের সিলিং ফ্যানে থাকে। সিলিং ফ্যান চললে ও আসতে পারে না বলে আমি রাতে ফ্যান বন্ধ করে দিয়ে ওর সাথে গল্প করি। প্রথম প্রথম শুধু অন্ধকারে আসত। এখন দিনের আলোয়ও আসে। দিনের বেলায়ও ও আমার সাথে গল্প করে।'

'আমার সাথে একদিন দেখা করিয়ো তো।'

'সে কথা আমি ওকে একদিন বলেছিলাম। কিন্তু ও বলে তুমি নাকি ওকে দেখতে পাবে না। এজন্য আমি যখন ওর সাথে গল্প করেছি তুমি দেখতে পাওনি।'

তানভীর কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। মায়া এসময়ের জলির সাথে দেখা হওয়া থেকে আদ্যোপান্ত তানভীরের কানের কাছে বলে চলল।

'মায়া, একটা কথা বলি। মাইণ্ড কোরো না। তোমাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নেয়া দরকার। একা বাসায় থেকে তোমার যেটা হয়েছে সেটাকে বলে হ্যালুসিনেশন। এক ধরনের মানসিক সমস্যা। সাইকিয়াট্রিস্ট কাউন্সেলিং করে তোমার মাথা থেকে এটা দূর করে দিতে পারবে।'

'এজন্যই আমি তোমাকে বলতে চাইনি। তুমি ভাববে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার মাথা ঠিকই আছে। আর মরে গেলেও আমি কোনও পাগলের ডাক্তারের কাছে যাব না। কক্ষনো না।'

সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়ার কথায় মায়া তার সাথে ঝগড়াঝাঁটির উপক্রম করছে দেখে তানভীর আর কথা বাড়াল না। এমনিতেও ওটা মুখের কথা, বললেও সে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিতে পারত না। টাকার টানাটানি চলছে। মানসিক ডাক্তারের কাছে ফাও টাকা দেয়ার উপায় নেই। এমনি ডাক্তার হলে সে ফ্রি দেখিয়ে আনতে পারত। সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নেবে না কিন্তু মায়াকে সে শর্ত দিল, আজ রাতে আর ওই মেয়ের সাথে কথা বলতে পারবে না। লাইট জ্বালিয়ে ফ্যান চালিয়ে ঘুমাবে সে। আর দুইদিনের জন্য মোহাম্মদপুরে ওর চাচাত বোন লাকির ওখান থেকে বেড়িয়ে মন ঠাণ্ডা করে আসবে।

সেদিন রাতে তানভীর ও মায়া ঘনিষ্ঠ হলো। আদরে আদরে ভরিয়ে তুলল একে অন্যকে। তারপর ক্লান্ত শ্রান্ত শরীরে দুজনেই তলিয়ে গেল ঘুমের রাজ্যে। মাথার উপর বন বন করে ঘুরছে ফ্যান।

পরদিন সকালে অফিসে যাওয়ার পথে তানভীর মোহাম্মদপুরে মায়াকে নামিয়ে দিয়ে এল। তারপর চলে গেল নিজের কাজে।

তার পরদিন তানভীরকে এম আরের ব্যাগের পাশাপাশি আরেকটা ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। অফিসের কাজ সেরে গুলিস্তানের পুরানো মার্কেটে কম দামে ফ্যানটা বিক্রি করে স্টেডিয়াম মার্কেট থেকে নতুন একটা দামি ফ্যান কিনে নিয়ে এল।

মায়া ফিরে এসে নতুন ফ্যান দেখে খুশি হলো। তা ছাড়া তানভীরকে ছেড়ে বক্র চাহনির চাচাত বোনের বাসায় তার ভাল লাগেনি। বিয়ের পরে

মেয়েদের নিজের সংসার ছাড়া অন্য কোথাও আপন মনে হয় না।

দুদিন পর নতুন ফ্যানের বাতাসে তানভীরের সাথে মায়া ঘনিষ্ঠ হয়। পুরানো ফ্যানের কথা, ফ্যানের মেয়েটার কথা বেমালুম ভুলে গেল সে। তানভীর তার সব কিছু আঁকড়ে থাকে।

আবার নিত্য দিনের রুটিন। তানভীর সাত-সকালে অফিসে যায়। শুরু হয় মায়ার নিঃসঙ্গ দিন। তখনই তার মনে পড়ে জলির কথা। সেই সিলিং ফ্যানও নেই। জলিও নেই। সে জানত ফ্যানের ওই মেয়েটা কোনও মানুষ নয়। হয়তো সত্যিই হ্যালুসিনেশন। একটা অপচ্ছায়া। কিন্তু সেই অপচ্ছায়ার জন্য তার মন কেমন করতে থাকে।

সারাটা দিন তার নিঃসঙ্গতায় কাটে। তার কথা বলার একমাত্র বন্ধুটিকে তানভীর কোন্ ভাগাড়ে কোথায় বেচে দিয়ে এসেছে। কারা কিনে নিয়ে যাবে হতভাগ্য মেয়েটাকে? সেখানে সে কেমন থাকবে? তার মত কথা বলার কাউকে কি পাবে? এসব চিন্তায় মায়ার মাথা খারাপের মত হয়ে যেতে থাকল।

সন্ধেয় ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে অপচ্ছায়া না থাকার ভয় তাকে যমের মত পেয়ে বসে। যে জিনিসটাকে তার ভয় পাওয়ার কথা সেটা না থাকায় তার ভয় বেড়ে যায়। ভয় আরও বেড়ে যায় যখন ছাদের উপরে সেই বুটের ধুপ ধাপ আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে। সে বারবার নতুন কেনা ফ্যানের দিকে তাকায়। না সেখান থেকে কোনও অপচ্ছায়া ঝুলে থাকে না। তার সাথে কথা বলার জন্য কেউ ফিসফিস করে না। তার বড়ো অস্থির লাগে। বুটের শব্দ তার দরজার কাছে এসে ফিরে ফিরে যায়। আর দরজার ফাঁক দিয়ে গাঁজার উৎকট তীব্র কটু গন্ধ ভেসে আসে।

এক অপার্থিব ভয়ে তার সমস্ত শরীর হিম হয়ে আসে। সে কান খাড়া করে বাড়িওয়ালার ছেলের ভাবী ডাকের অপেক্ষায় থাকে। ওপাশ থেকে কোনও ডাক আসে না। পরিবর্তে পায়ের শব্দ দূরে সরে যায়। আর তখনই চলে আসে বিজলী বিবি। মায়া হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

রাতে বিয়ের পরে এই প্রথম মায়ার সাথে তানভীরের সত্যিকার অর্থে ঝগড়া বাধে। আর ঝগড়ার কারণটাও অদ্ভুত। মায়া প্রথমে আবদার জানায় সেই পুরানো ফ্যানটা ফিরিয়ে আনার জন্য। তানভীর জানায় সেটা সে বিক্রি করে দিয়ে এসেছে। সেটা এতক্ষণে কোন্ বাড়িতে কে কিনে নিয়ে গেছে তার

ঠিক আছে? চোরা বাজারে এক জিনিস একদিনের বেশি থাকে না। মায়া তবুও আবার সেই বিক্রি করা দোকানটাতে গিয়ে দেখে আসতে বলে। সেখানে ফ্যানটা আছে কিনা। একদিনের মধ্যে বিক্রি না-ও হতে পারে। ফার্মার ওখানে তানভীরের কিছুটা গোলযোগ চলছে। ড্রাগের রেসপন্স খারাপ। যেকোনও সময় কর্মচারী ছাঁটাই হতে পারে। ছাঁটাইয়ের মধ্যে সে-ও পড়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু না। এমনিতে তার মেজাজ খারাপ। তার উপরে মায়া কানের কাছে পুরানো ভূতে ধরা এক ফ্যানের কথা ঘ্যানর ঘ্যানর করে মেজাজ চড়িয়ে দিল। সে গলা চড়িয়ে জানিয়ে দিল, 'জাহান্নামে গেলেও ওই ফ্যানের খোঁজে অফিস কামাই দিয়ে চোরাই বাজারে যেতে পারব না।'

মায়াও কম যায় না। আজ যেন তার কী হয়েছে। জলির সাথে কথা না হওয়ায় তার মন এমনিতেই বিক্ষিপ্ত ছিল। তারপর সন্ধেয় বাড়িওয়ালার ছেলের পায়চারী, গাঁজার গন্ধ, তানভীরের রাগী গলা, সব মিলিয়ে মায়াও হিস্টেরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত হয়ে গেল। সে-ও উত্তেজিত গলায় জানিয়ে দিল, তানভীর যদি ওই ফ্যান আবার খুঁজে না নিয়ে আসে তা হলে সে তানভীরকে ছেড়ে বাড়িতে চলে যাবে। গিয়ে বিদেশি পাত্রকে বিয়ে করে পাড়ি দেবে ইতালীতে। এই নিঃসঙ্গ জীবন তার আর সহ্য হচ্ছে না। তানভীর কোত্থেকে আনবে সে জানে না। কিন্তু ওই পুরানো ফ্যান আবার নিয়ে আসতে হবে। না হলে ওই জলি মেয়েটার মতই সেও এই নতুন ফ্যানের সাথে ঝুলে পড়ে আত্মাহুতি দিয়ে এই নিসঙ্গতার জ্বালা জুড়াবে।

তানভীর চুপ করে গেল। এতদিনে সে যেটুকু মায়াকে চিনেছে তাতে মায়া খুব জিদ্দি মেয়ে। একবার যেটা বলে সেটা করে। কোনও রকম পাগলামি যদি সত্যিই করে বসে?

পরদিন সকালে অফিসে গেলেও কাজে মন বসাতে পারলো না তানভীর। চাকরি চলে যায় যাবে। তবুও সে একবার গুলিস্তানের চোরাই মার্কেটে গিয়ে দেখবে সেখানে এখনও সেই ফ্যানটা আছে কিনা। যদি থাকে তো ভাল। না থাকলে ঠিক ওই রকম দেখতে আরেকটা পুরানো ফ্যান কিনে নিয়ে আসবে। মায়া কী সব অপচ্ছায়াটায়া দেখে, ওটা তো মানসিক সমস্যা। একইরকম ফ্যান আনলে নিশ্চয়ই ধরতে পারবে না।

তানভীরের ভাগ্য ভাল। এখনও ওই ফ্যানটা সেই ছোট্ট দোকানে পড়ে

আছে। বিক্রি হয়ে যায়নি। তানভীর আরও একশ টাকা গচ্চা দিয়ে নিজের গতকাল বিক্রি করা ফ্যান কিনে নিয়ে বাসায় এল।

ফ্যানটা দেখে মায়ার চোখ-মুখ অন্য আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যেন সে তার হারানো সাথীকে আবার ফিরে পেয়েছে। নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে ফ্যানের পাখাগুলো সযত্নে মুছে দিলো। মায়ার পাগলামি দেখে তানভীর আর দেরী না করেই সেই রাতেই নতুন ফ্যানটা খুলে তার জায়গায় পুরানো ফ্যান লাগিয়ে দিলো। সারাদিনের ক্লান্তি, ধকল, গুলিস্তানে ঘোরাঘুরি এবং রাতে বাসায় এসে একটা ফ্যান খুলে আরেকটা লাগানোয় তানভীর এত ক্লান্ত হয়ে পড়লো যে সে খেয়েই ঘুমে এলিয়ে পড়ল। না হলে দেখতে পেতো প্রায় সারাটা রাত জেগে মায়া অশরীরী বান্ধবী জলির সাথে গল্প করেছে। অল্প দিনের অসাক্ষাৎ হলেও যেন মনে হবে এক জনম পরে তাদের দেখা হয়েছে। সেভাবেই সাধ মিটিয়ে গল্প করছে তারা।

ঠক! ঠক! ঠক !

প্রায় সারারাত জেগে গল্প করায় এবং একা বাড়িতে থাকায় আলস্য করে শেষ বিকালে গোসল খাওয়া সেরে বিছানায় একটু গা এলিয়ে দিতেই ঘুমের রাজ্যে চলে গিয়েছিল মায়া। দরজায় ঠকাঠক আওয়াজে ঘুমের অতল থেকে ধড়ফড় করে উঠল ও। গোটা ঘর অন্ধকার। কোথায় কী হচ্ছে প্রথমটায় সে বুঝে উঠতে পারল না। দরজায় আবার ঠকাঠক আওয়াজ হতেই সে একটু ঠাওর করতে পারল। আর তখনই দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এল আমানের ঘড়ঘড়ে গলা, 'ভাবী, এক গ্লাস পানি খাওয়াতে পারেন? বড় তিয়াস লাগছে। ছাদে হাঁটাহাঁটি করে তিয়াস লাগছে।'

সন্ধে পেরিয়ে গেছে। খোলা জানালা দিয়ে চৈত্রের বাতাস এসে এলোমেলো করে দিচ্ছে।

মায়া বিছানা থেকে নামল। একজন পিপাসার্ত মানুষ পানি খেতে চাচ্ছে সে পানি না দিয়ে পারে কীভাবে?

সে ড্রয়িংরুমে এসে বলল, 'একটু দাঁড়ান, ভাই। আলোটা জ্বেলে নেই।'

'এই অসময়ে কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি, ভাবী?'

'এই একটু।' বলে মায়া রান্নাঘরের নির্দিষ্ট জায়গা থেকে মোমবাতি ম্যাচ

নিয়ে মোম জ্বালল। তারপর মোমবাতি এনে রাখল ডাইনিঙের টেবিলে। জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢালল। তারপর এক হাতে পানির গ্লাস অন্য হাতে মোমবাতি নিয়ে দরজা খুলল। তখনই ভক করে সেই উৎকট তীব্র কটু গাঁজার গন্ধটা নাকে এসে লাগল।

ঊর্ধ্বাঙ্গে চাদর মোড়া আমান মায়ার হাত ছুঁয়ে পানির গ্লাস নিল। মায়ার সমস্ত শরীর ভয়ে অসাড় হয়ে যাবার জোগাড়।

'ভাবী, পানি একটু বসে খাই, না কী বলেন। নবীজীর সুন্নত।' বলে অনুমতির অপেক্ষা না করেই মায়ার পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। মায়া দরজাটা হাট করে খোলা রেখেই ধীরে ধীরে দেখতে থাকে লোকটা ডাইনিঙের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। তারপর এমন চুক চুক করে পানি খেতে থাকে যেন গরম চা বা কফি খাচ্ছে। মায়া মোমবাতিটা ডাইনিং টেবিলে রেখে আরেকটা মোমবাতির জন্য বেড রুমের দিকে গেল।

সে বেড রুমে আসতেই ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম থেকে খুট করে একটা শব্দ হলো। দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেই ওরকম শব্দ হয়। হঠাৎ করে মনে হয় গাঁজার গন্ধটা তার বেড রুমে চলে এসেছে। মায়া কী হচ্ছে দেখার জন্য ড্রয়িংরুমের দরজার দিকে আসতেই দেখে আমান মোমবাতি হাতে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

আমান মোমবাতিটা মুখের কাছে ধরে একটা পৈশাচিক হাসি দিয়ে এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিয়ে খনখনে হেসে বলল, 'ভয় নেই, ভাবী। আমি আছি না। বাতাসে মোমবাতি নিভে গেল। ম্যাচিসটা দিন তো।' আমান হাত বাড়িয়ে খপ করে মায়ার হাত ধরল।

দরজা খুট করে লাগানো এবং মোমবাতি নিভানোয় মায়া বুঝে গেল কী ঘটতে চলছে। এই নির্জন সাততলার ঘরের মধ্যে কেউ আসবে না তাকে বাঁচাতে। ওই নরপশুর হাতেই সঁপে দিতে হবে সব।

ততক্ষণে আমান মায়ার শাড়ির আঁচল ধরে ফেলেছে।

বিপদের মুখে আল্লাহ-খোদা বাবা-মা এমনকী স্বামীর নাম ধরে ডেকে বিপদ থেকে রক্ষা পেতে চায় সবাই। মায়া সে সব কিছু না করে অশরীরী অপচ্ছায়াকে প্রাণ থেকে ডেকে উঠল, 'জলি, কোথায় তুমি? বন্ধুর বিপদে তুমি কি আমাকে রক্ষা করবে না? শেষে তোমার মত আমার স্বামীও অবিশ্বাস করে আমাকে ঝুলিয়ে দেবে সিলিং ফ্যানে। জলি, আমাকে রক্ষা করো।

আমাকে বাঁচাও। প্লিজ, হেল্প মি।' আমান মায়ার সাথে যুঝতে থাকে। তার শাড়ি এলোমেলো করে ফেলেছে। পুরুষের পুরুষালী শক্তির কাছে অসহায় মায়াকে প্রায় বিবস্ত্র করে ফেলেছে আমান।

ঠিক তখনই মায়া সেই গন্ধটা পায়। বকুল ফুলের সাথে কর্পূর মেশানো গন্ধ। সে তাকায় সিলিং ফ্যানের দিকে। দেখতে পায় তার অশরীরী বান্ধবী চলে এসেছে ফ্যানের সাথে। অন্যরকম একটা শক্তি যেন ভর করে মায়ার শরীরে। এখন আর সে একা নয়। জলি এসেছে।

আমান হঠাৎ চমকে ওঠে। তার সামনের সেই সুন্দরী ভাবী যেন ধীরে ধীরে তার দুহাতের মধ্যে ঠাণ্ডা শীতল লাশে পরিণত হয়েছে। যেন একটা মৃতদেহ জড়িয়ে ধরেছে সে। সে দেহটির মৃত্যু ঘটেছে কয়েক মাস আগে। ঠাণ্ডা মৃতদেহ শক্তিশালী হাত দিয়ে যেন আমানকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে।

আমান তার হাত শিথিল করে মায়ার দিকে তাকায়। উস্কোখুস্কো চুলের জিব বেরিয়ে আসা ভয়াবহ রক্ত চোখের আজরাইল যেন স্বয়ং তাকিয়ে আছে তার দিকে। ভয়ে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়। মরণের ভয় পেয়ে বসে তাকে।

আমান মায়াকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে আসতে থাকে। বেড রুম পেরিয়ে ড্রয়িংরুম পেরিয়ে সে চলে আসে দরজার কাছে। ভয়ে তার দুচোখ বড় বড় হয়ে গেছে। সে ভয়ংকর ফাঁস নেয়া মৃতদেহ এগিয়ে আসছে তার দিকে। মৃত্যুদূত আসছে তাকে গ্রাস করতে। তার নেশা ছুটে যায়। সে তড়িৎ গতিতে ছিটকিনি খুলে দরজার বাইরে বেরিয়ে আসে। সেই ভয়ংকর মূর্তিটাও দরজা দিয়ে বেরিয়ে তার মুখোমুখি হয়। সে পিছাতে থাকে। মূর্তিটা এগুতে থাকে। সে পিছায়। আরও। আরও। চলে আসে ছাদের কার্নিশে।

পরদিন সকালে বাড়িওয়ালার মাদকাসক্ত ছেলে আমানউল্লাহর মৃতদেহ সাততলা বাড়ির পিছন দিকে আবিষ্কৃত হয়। পুলিশ রিপোর্ট–মাতাল অবস্থায় কার্নিশ থেকে পা পিছলে পড়ে মারা পড়েছে আমান।

প্রিন্স আশরাফ

কালো পাথর

ক্ষ্যাপাটে কবিয়াল উগ্র গরীবুল্লাহ'র লেখা ডায়েরি পড়ে অদ্ভুত বিষয়টি সম্পর্কে প্রথম আমি জানতে পারি। এই ডায়েরি আমার হাতে আসার কথা না। বেঁচে থাকতে যেমন আধিভৌতিক সব ব্যাপার নিয়ে মেতে থাকত তার মৃত্যু তেমন রহস্যময়, যেন বাংলাদেশের এডগার অ্যালেন পো। আজিমপুর গোরস্তানের কাছে নিউপল্টন লাইনের এক বাসায় সাবলেট থাকত উগ্র। যেহেতু ওর মৃত্যু স্বাভাবিক হয়নি সেজন্যে নিউমার্কেট থানায় একটি কেস হয়েছিল। তার সব ব্যক্তিগত মালামাল পুলিশ জব্দ করে থানায় নিয়ে আসে। এইসব মালপত্রের ভেতর একটি ডায়েরিও ছিল; ডিবি পুলিশ বহুবার ওগুলো পড়লেও কোন ক্লু তারা সেখান থেকে বের করতে পারেনি। থানার সেকেণ্ড অফিসারের নাম আফসার। এই ছেলে আমার দুই বছরের জুনিয়র, আমরা একই হলে পাশাপাশি রুমে থাকতাম। উগ্র আমার রুমে প্রায়ই এসে রাত কাটাত। বুয়েটের নজরুল ইসলাম হলের ক্যান্টিন সারারাত খোলা থাকে; উগ্রকে নিয়ে ওখানে রাতে ভুনা খিচুড়ি আর ঝাল গরুর মাংস খেতে যেতাম; মাঝেমধ্যে আফসারকেও নিতাম। আমি পড়তে পেলে খুশি হব ভেবে আফসার আমাকে ওগুলো পড়তে দিয়েছিল।

উগ্রকে সবাই কবি হিসেবে জানলেও সারাজীবন ও আসলে কাটিয়েছে নিষিদ্ধ যত বিষয়-আশয় আছে সেসবের পেছনে ছোটাছুটি করে। আশপাশের সার্কভুক্ত দেশ ভারত, নেপাল, ভুটান চষে বেড়িয়েছে, গোপন আর নিষিদ্ধ সব কাল্ট আর সংঘের সাথে ছিল ওর অবাধ মেলামেশা এবং নিয়মিত যোগাযোগ। আধিভৌতিক, প্রেত-সাধনা, শ্মশানঘাটের কাপালিকদের কালভৈরবী পুজো, ইত্যাদি বিষয়ে পুরনো হাতে লেখা বহু পুথি ও পড়েছে।

ঠাসবুনোনে লেখা উগ্রের ডায়েরি মোট দশখণ্ড, প্রতিটিতে পাতার সংখ্যা ৩৬৫। সে যে এত বড় সাতকাণ্ড রামায়ণ লিখেছে বেঁচে থাকতে সেকথা ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলেনি। কিছুকিছু বর্ণনার মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যায় না; আবার কোন কোনটি কালঘাম ছুটিয়ে দেয়ার মত। যখন ওর লেখা পড়ি

তখন অদ্ভুত একটি অনুভূতি হয়েছিল, মনে হয়েছিল ও আরও অনেক কিছু লিখতে চেয়েছে কিন্তু কীসের এক আতংক তাকে লিখতে দেয়নি। প্রশ্ন হলো এই আঁধারে ঢাকা রহস্যময় বিষয়টি কী যা বারবার প্রকাশ করতে যেয়েও করতে সাহস করেনি? নাকি শেষ মুহূর্তে করেছিল যা আমাদের হাতে আসেনি। যাঁর সবলেখা ছাপানোর ব্যাপারে এত আগ্রহ অথচ এতবড় একটি লেখা যেটা মরার আগের দিন পর্যন্ত ও লিখেছে সে ব্যাপারে কেউ কিছু জানল না! এর থেকেও বড় কথা ডায়েরির অনেক ছেঁড়া পাতা ওর লাশের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল; ঘরের দরজা ছিল ভেতর থেকে বন্ধ। মরদেহ ময়না তদন্ত করতে যেয়ে ডাক্তার দেখল ওর গলার চামড়ায় বড়বড় নখঅলা পাঁচ আঙুলের ছোট্ট একটি থাবার ছাপ। দেখতে বানরের পাঞ্জার মত। আসল ঘটনা হয়তো কখনোই জানা যাবে না। যে পাতাগুলো লাশের পাশে ছড়ানো ছিল ওগুলো পেলে হয়তো জানা যেত। কিন্তু সে গুড়ে বালি। পাতাগুলো সংগ্রহ করে গুছিয়ে রমনা ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। গুলশান কমর বানু নামের এক নতুন ডিবি অফিসারের ওপর দায়িত্ব ছিল লেখাগুলো পড়ে দেখার; এই অফিসার সারারাত ধরে ওগুলো পড়ে ভোরের দিকে পাতাগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে নিজের কোয়ার্টারে চলে যায়; দুপুরে বাথরুম থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। কে জানে কী কারণে ক্ষুর দিয়ে কব্জির আর্টারি কেটে আত্মহত্যা করে সে। ডায়েরিতে অনেকগুলো আজগুবি জিনিসের উল্লেখ থাকলেও বিশেষ একটি কালো পাথরের ব্যাপারে উগ্র বেশ কিছু কথা লিখেছে। আসামের এক পাহাড়ী এলাকায় নাকি চকচকে কালো একটি পাথর সোজা উঠে গেছে আকাশের দিকে; ভীষণ অদ্ভুত এবং অতিপ্রাকৃত ভয়াবহতার এক আবরণ দিয়ে চারদিকের এলাকা মুড়ে রেখেছে কৃষ্ণকায় এই প্রাগৈতিহাসিক শৈলশিরা। উগ্র অবশ্য এর পেছনে খুব বেশি সময় ব্যয় করেনি। ওর ডায়েরির এক ব্যাপক অংশ জুড়ে আছে মধ্যযুগীয় এবং এ যুগের তন্ত্র সাধনা এবং প্রেত সাধনার বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, নক্ষত্র-তিথি আর উপাচারের গুণাগুণের বর্ণনা। যেমন, তারকাসুর পুজোয় শ্বেত সরষের ডাল না পাওয়া গেলে তার বদলে কীসের ডাল ব্যবহার করতে হবে, নদীর পাড়ে জন্মানো বাবলা গাছের যে ডাল থেকে তিনটি শাখা বেরিয়েছে সেখানে কোন কাক বাসা করলে সেই কাকের বাসা প্রেত-সাধনার কোন পর্যায়ে ব্যবহার করলে কী ফল পাওয়া যায়, চৈত্র সংক্রান্তির দিন দুপুর বেলা

অথবা পড়ন্ত বিকেলে বহু কালের পুরনো কোন নাট মন্দিরের সামনে ঘূর্ণিপাক উঠলে পাকের মধ্যে ঘুরতে থাকা কোন পাতা যদি বিবস্ত্র হয়ে এক নিঃশ্বাসে বিশেষ এক মন্ত্র পড়তে পড়তে সংগ্রহ করা যায় তা হলে তা দিয়ে বশীকরণ কীভাবে করতে হবে, ইত্যাদি। যাহোক কালো পাথরের বর্ণনা পড়লে মনে হয় অশুভ এই পাথরকে ঘিরে নিষিদ্ধ দেবতার যে পুজো ভক্তরা এক সময় করত তা এখন আর হয় না. কালের অসীম গহ্বরে সেসব হারিয়ে গেছে চিরজীবনের মত। তবে এই কালো পাথরের ব্যাপারটি আমার কাছে বেশ গুরুত্ব পেল দুটো কারণেঃ এক. বিভিন্ন জায়গায় বারবার এর কথা বলা হয়েছে এবং গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এটাকে একটি বিশেষ চাবি হিসেবে উল্লেখ করে; দুই. অনেক আচার-অনুষ্ঠান এবং অজানা দেবদেবীর বর্ণনা করতে যেয়ে এর প্রসঙ্গ টানার পর এক জায়গাতে পাথরটির ব্যাপারে ছোট্ট একটি ইঙ্গিত আছে। সেটি হলো চৈত্র সংক্রান্তির দিন মাঝরাতে এই শিলাখণ্ডের চারপাশে এমন কিছু দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় যার সাথে এযুগের কোন দৃশ্যের কোন মিল নেই।

এই ব্যাপারে ওর গবেষণাও প্রচুর। পাথরটিকে নিয়ে যে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা আছে উগ্র তার বিরোধিতা করেছে। সে লিখেছে, ইতিহাসবিদ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ মহাভারত-এর 'স্ত্রীপর্বে' উল্লেখ আছে আসামের আদি নাম ছিল প্রাগজ্যোতিষরাজ্য। এই প্রাগজ্যোতিষরাজ্যের রাজা ভগদত্ত তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের পক্ষে অংশ নেয়। তখন এখানে যারা বাস করত তাদের বলা হত বোড়ো জাতি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরে এসে ভগদত্ত বিজয়স্মারক অতিকায় এই শিলাখণ্ডটি স্থাপন করে এবং বিরাট এক মেলার আয়োজন করে যা বহুদিন ধরে প্রতিবছর নিয়মিত বসত। উগ্র আরও লিখেছে এই অঞ্চলে মেলার প্রভাব ব্যাপক। যেমন অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন 'সিলেট' নামটি এসেছে প্রাচীন কালের স্থানীয় রাজার মেয়ে শিলা'র নাম থেকে। এই রাজা অনেক বড় একটি হাটের আয়োজন করে, যাকে বলা হত 'শিলা'র হাট'। এই শিলা'র হাট থেকেই শিলাহাট এবং পরে সিলেট নামের উৎপত্তি। যাহোক, ভগদত্ত ছিল শাক্ত; কালীদেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য এগারোজন যুবতী মেয়েকে এই পাথরের গোড়ায় বলি দেয় সে। উগ্র মত দিয়েছে, যদি মেনে নেই ভগদত্ত এই কালোপাথর বসিয়েছে তা হলে এটাও মেনে নিতে হবে যে,

লালবাগ কেল্লা তৈরি হয়েছে লর্ড কার্জনের আমলে। সে অবশ্য তার মতামতের স্বপক্ষে অন্য কোন যুক্তি বা প্রমাণ দেয়নি।

একথা মানতেই হবে যে বিষয়টির প্রাচীনত্ব আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এ ব্যাপারে আরও বেশি জানার আগ্রহ আমার ভেতরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। অনেককে জিজ্ঞেস করে এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি করে শেষমেশ সিলেটের এম.সি. কলেজ লাইব্রেরি থেকে শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদারের লেখা ঘুণে খাওয়া রামাচরিতম বইটি জোগাড় করলাম। এম.সি. কলেজ লাইব্রেরিতে বেশ কিছু দুস্প্রাপ্য বই আছে। সিলেট আগে আসামের মধ্যে ছিল; এইজন্যেই এই বইটি কলেজ কর্তৃপক্ষ সংগ্রহে রেখেছে। আজকাল দুস্প্রাপ্য হোক আর সহজলভ্য হোক প্রায় কোন বইই মানুষ পড়তে চায় না। ১৯৩৯ সালের পর আমিই প্রথম ব্যক্তি যে বইটি খুলল। এটি আসলে চতুর্দশ শতাব্দীতে লেখা অন্য একটি বইয়ের আলোচনা। বইটিতে কালো পাথরটির যে বর্ণনা আর সি মজুমদার দিয়েছেন তা পড়ে হতাশ হলাম। শুধু যে সাদামাটা তাই-ই না বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত।

যদিও পুরনো বইটিতে লেখা আছে রাজা ভগদত্ত এটা স্থাপন করেন তারপরেও মজুমদারের ব্যক্তিগত মতামত ভিন্ন। তাঁর মতে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দের দিকে আজান ফকির কামরূপে আসেন এবং দিল্লীর সুলতান ইলিয়াস শাহের সাহায্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। সেসময় হিন্দু মহারাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ ধর্মপ্রচারে বাধা দিলে সুলতানি বাহিনী ব্যাপক অভিযান চালায় এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে নেয় ও ধ্বংস করে দেয় অসংখ্য জনপদ। মুসলমানদের এই বিজয়কে স্মরণীয় করার জন্যেই সিপাহসালার ইউসুফ কুররানীর নির্দেশে শিলাখণ্ডটি স্থাপন করা হয়। এরপর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে মুসলমান বিজেতাদের ধ্বংসযজ্ঞ এবং নিপীড়নের বর্ণনা। রমেশ চন্দ্রের আগ্রহ প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে যতটা তার চেয়ে বেশি ধ্বংস, হত্যা এবং ধর্ষণের বিবরণে। এই বর্ণনার চেয়ে উগ্রের ব্যাখ্যা অনেক ভাল। তার মতে, এই পাথরটি আসামের প্রাগৈতিহাসিককালের রাজা মহিরঙ্গ দানবের আমলের। এটা বসিয়েছিল কার্বিস নামের অস্ট্রিক বংশোদ্ভূত অতি প্রাচীন এক জনগোষ্ঠী যারা মিশরের ফেরাউনদের অত্যাচারে সুদূর উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলো থেকে এখানে পাড়ি জমিয়েছিল। কারণ তাদের দেবতার পুজো ফেরাউনের পুরোহিতরা পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে দেয়। পুরোহিতেরা

ফেরাউনের কাছে এই অভিযোগ করে যে এই জাতি যে শুধু শয়তান সর্প-দেবতা 'সেথ' এর পুজো করছে তাই-ই নয় এরা পুজোর নামে জঘন্য অনাচার, ব্যভিচার, প্রকাশ্য ও নির্বিচার যৌনসংসর্গ এবং নরবলিতে লিপ্ত। উগ্র লিখেছে, 'কামরূপ' শব্দটি অস্ট্রিক যা এখনও সাঁওতাল জাতি কিছুটা ব্যবহার করে; এর অর্থ যাদুবিদ্যা এবং 'কামাখ্যা' শব্দটির অর্থ প্রেত বা মরদেহ, এটিও অস্ট্রিক শব্দ। কার্বিসেরা এই বিরান অঞ্চলে ব্যাপক আকারে প্রকাশ্যে প্রেতপুজো করেছে শতশত বছর ধরে। এজন্যেই এই এলাকার নাম হয় কামরূপ-কামাখ্যা এবং অন্য জায়গার লোকেরা একে দেখতে শুরু করে রহস্যময়, ভীতিকর এক অঞ্চল হিসেবে।

রমেশ চন্দ্র স্বীকার করেছেন যে, পাথরটির গোড়ার দিকে খোদাই করে লেখা শিলালিপি কালের আবর্তে এত বেশি ক্ষয় হয়ে গেছে যে ওগুলোর পাঠোদ্ধার তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে অক্ষর দেখে তাঁর মনে হয়েছে ওগুলো প্রাক-ইসলামী যুগের ফার্সিলিপির মত। তবে রামাচরিতম পড়ে সবচেয়ে বড় যে উপকারটি হলো সেটি হচ্ছে বর্ণনার এক জায়গায় কালো পাথরটি যেখানে আছে তার সবচেয়ে কাছের একটি গ্রামের নামের উল্লেখ আছে। গ্রামের নাম 'কোমৌচ'। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি এটিও অস্ট্রিক শব্দ যা আজও সাঁওতালিরা ব্যবহার করে। কোমৌচ অর্থ ডাইনী-নগরী।

এরপরে আমার কাজ হলো আসাম গেজেটিয়ার খুলে দেখা, যদি কোমৌচ গ্রামের কোনও উল্লেখ সেখানে থেকে থাকে! আসাম গেজেটিয়ার, ১৯৪৭ সালে তৈরি আসাম রিলিফ ম্যাপ, ইণ্ডিয়া অ্যাটলাস, আসাম পপুলার ট্যুরিস্ট গাইড সব ঘেঁটে দেখলাম ওই গ্রামের উল্লেখ কোথাও নেই। সমস্ত কোলাহল এবং জনজীবনকে আড়াল করে, সাধারণের চলাচল থেকে বহুদূরে, অজানা-অচেনা এক পরিবেশে আছে পুরনো এক গ্রাম, তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে আদ্যিকালের রহস্যময় একটি কালো কুচকুচে পাথর। বুঝতে পারলাম এভাবে হবে না, এগুলাম অন্যভাবে। খুঁজতে শুরু করলাম এই এলাকার উপকথা-রূপকথার বই। পেয়েও গেলাম সাহিত্যিক শাহেদ আলীর লেখা সিলেট-আসাম অঞ্চলের লোককাহিনি নামের একটি বই। বইটিতে শাহেদ আলী 'স্বপ্ন পুরাণ' এই শিরোনামে একটি অধ্যায় লিখেছেন। উল্লেখ করেছেন এই কালো পাথরটিকে ঘিরে অদ্ভুত সব কুসংস্কারের কথা। তিনি লিখেছেন কিংবদন্তী আছে কেউ যদি এই পাথরের আশপাশে রাত কাটায় বা ঘুমায় তা

হলে বাকি জীবন তাকে নারকীয় দুঃস্বপ্ন দেখে কাটাতে হবে। এরপর লেখক উল্লেখ করেছেন দুজন চাষীর কথা যারা শিলাখণ্ডটির কাছে রাত কাটালে কী হয় তা দেখার জন্যে চৈত্র সংক্রান্তির দিন রাতের বেলা ওখানে যায়। সকাল বেলা প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে ফিরে আসে তারা এবং প্রলাপ বঁকতে বকতে দুদিনের ভেতর ধরাধাম ত্যাগ করে। বারবার বলে ভয়ংকর কিছু একটা দেখেছে তারা। তবে কী দেখেছে তা স্পষ্ট করে বলতে পারেনি কিছুই।

শাহেদ আলীর বিবরণে এর বেশি আর কিছু নেই। পাথরটিকে ঘিরে অপার্থিব-অশুভ এক শক্তি প্রভাব বিস্তার করেছে এই ব্যাপারটি আমার আগ্রহ বাড়িয়ে দিল শতগুণ। স্মরণাতীতকালের প্রাচীন এই শিলাটির চারদিকে চৈত্র সংক্রান্তির দিন অদ্ভুত যেসব প্রহেলিকা দৃশ্যমান হয় সেগুলো কল্পনা করতে চাইলাম। শুনতে চেষ্টা করলাম এই সব প্রহেলিকা থেকে ছিটকে আসা শব্দ সমষ্টি এবং অস্ফুট আওয়াজ। এ যেন মাটির গভীরে ঘন অন্ধকারে বয়ে যাওয়া কোন নদী যার অস্তিত্ব আছে অনুভূতিতে কিন্তু নেই দৃশ্যমানতা। বিদ্যুৎচমকের মত কল্যাণ মিত্রের লেখা 'শিলা-স্তম্ভের মানব-মণ্ডলী' কবিতাটির কথা মনে পড়ল। কল্যাণ মিত্রের বাড়ি সিলেটের জাফলং-এ; তার ছিল ভ্রমণের প্রবল শখ। পুরো মেঘালয় অঞ্চল সে তন্নতন্ন করে বেড়িয়েছে। এম. সি. কলেজে বাংলায় অনার্স পড়ত। বাংলা একাডেমিতে একুশের বইমেলায় তার সাথে পরিচয় হয়েছিল। পরিচয়ের কিছুদিন পর কল্যাণের মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে যায়। 'শিলা-স্তম্ভের মানব-মণ্ডলী' তার সর্বশেষ কবিতা, ঈদসংখ্যা অন্যদিনে ছাপা হয়েছিল। কল্যাণ এই দুর্বোধ্য কবিতাটি লিখেছিল ফাল্গুন-চৈত্র মাসে যখন সে শিলং বেড়াতে যায়। ওর কবিতাটি আবার পড়লাম, স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমার অবচেতন মনে পাথরটির কাছে যাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মেছে। যেন ওখানে আমাকে যেতেই হবে, ওটা আমার নিয়তি। কিন্তু যাব কীভাবে? সঠিক ঠিকানাই তো এখনও জোগাড় হয়নি! মনের একাংশ বলল এখানে বসে থাকলে ঠিকানা যে জোগাড় হবে সে নিশ্চয়তাই বা কোথায়? নাহ্, একবার আসামে যেয়েই দেখতে হবে। উঠল বাই তো কটক যাই, এ হচ্ছে আমার স্বভাব।

এমনিতেই গত দুবছরে আমি কোথাও বেড়াতে যাইনি। ছুটি পাওনা আছে, চাইলে যেকোন সময়ে পাওয়া যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বসন্তকালীন ছুটিতে কোমৌচ গ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সিলেট শহর থেকে জাফলং

বর্ডার পর্যন্ত গেলাম বি আর টি সি বাসে। সীমান্তে দাঁড়িয়ে ওপারে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে মনে হলো যেন দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে, গলগল করে ধোঁয়া উঠছে পাথুরে পাহাড়ের থাকে থাকে জন্মানো ঘন ট্রপিক্যাল ফরেস্ট থেকে। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম এত ধোঁয়া কীসের, এখানে কোনও আগ্নেয়গিরি আছে বলে তো শুনিনি? লোকটি বলল ওগুলো পাহাড়ের গায়ে ঝুলে থাকা মেঘ। এজন্যেই এই এলাকার নাম হয়েছে 'মেঘের আলয়' বা মেঘের বাসা সংক্ষেপে মেঘালয়। বর্ডার পার হয়ে ডাউকী বাজারে যেতে হলো ছাদখোলা জিপে অন্য আরও পাঁচ জনের সাথে শেয়ার করে। সীমান্তের এপারের মানুষ অনেক চুপচাপ এবং ভদ্র। বাংলাদেশে বাসস্ট্যাণ্ডে যেমন হাত ধরে টানাটানি, দৌড়াদৌড়ি সেটি এখানে নেই। পাহাড়ের পেট কেটে বানানো রাস্তা; পর্বতশ্রেণীকে দুভাগ করে বয়ে গেছে খরস্রোতা পাহাড়ি নদী দিক্কারবাসিনী। নদীর ওপর তৈরি করা হয়েছে একটি ঝুলন্ত সাদা ব্রিজ; দূর থেকে দেখে মনে হয় এটি একটি খেলনা ব্রিজ কোন রকমে ঝুলে আছে পাহাড়ের গায়ে। ধাক্কা দিলেই হুড়মুড় করে ভেঙে রসাতলে পড়বে। বহু নীচে তরতর করে বয়ে যাচ্ছে কাঁচের মত স্বচ্ছ হিম ঠাণ্ডা পানি, ভাটিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বালু আর পাথর। নদীর যে অংশ বাংলাদেশের মধ্যে সেখানে হাজার হাজার লোক পাথর তুলে ক্রাশারে দিচ্ছে; বালু তুলে ডাঁই করছে পাহাড়ের মত। ট্রাক-লঞ্চ বোঝাই হয়ে বালি আর পাথর চলে যাচ্ছে ঢাকা শহরে। ব্যবসায়ীরা মালদার হয়ে যাচ্ছে ঠিকই তবে পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অবশিষ্ট নেই আর কিছুই। প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন, ধনতন্ত্র প্রকৃতি বিনাশক। কথা খুবই সত্যি।

ডাউকী বাজারে যেয়ে সিট ভাড়া করলাম 'মিজোরাম বোর্ডিং'-এ। পর দিন বাসে রওনা হলাম শিলং-এর পথে; চুলের কাঁটার মত বাঁক নেয়া সরু রাস্তায় সারাদিন জার্নি করে সন্ধের সময় এসে পৌঁছলাম শিলং। এবার আর বোর্ডিং-এ উঠলাম না, সরাসরি গেলাম ওয়াইএম সিএ'র হোস্টেলে। জনান্তিকে বলে রাখি, আসামে খ্রিস্টধর্মের প্রভাব ব্যাপক। এই হোস্টেলে ওঠার পেছনে আসলে একটি উদ্দেশ্য ছিল, চার্চের ফাদারদের কাছ থেকে কোমৌচ গ্রাম সম্পর্কে জেনে নেয়া। এতবড় একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যে গ্রামের কাছে আছে সে গ্রাম সম্পর্কে ফাদাররা জানবেন না এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। বহুকাল আগে থেকেই খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের অন্যতম

প্রধান কাজ হচ্ছে যে এলাকায় তারা ধর্ম প্রচার করে সে এলাকার ইতিহাস, সংস্কৃতি, আর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলো খুব ভালভাবে জেনে নেয়া। এঁরাই অতীতে বহুকাল ধরে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ভৌগোলিক আবিষ্কারের হোতা। অশীতিপর এক বৃদ্ধ ফাদারের কাছ থেকে কোমৌচ গ্রামে যাওয়ার সব তথ্য পাওয়া গেল। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ফাদার জানতে চাইলেন ওখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য। বললাম, আমার এক বন্ধু ওই গ্রামের কাছে একটি শিলাস্তম্ভকে নিয়ে কবিতা লিখেছে। অদ্ভুত এবং দুর্বোধ্য এই কবিতাটি সে কী কারণে লিখল তা জানার জন্যেই ওখানে যাওয়া। শুনে ফাদার বলেছিলেন, তার জন্যে এত কষ্ট করে ওখানে যেতে হবে কেন। কবি বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেই পারতেন। বলেছিলাম কোনও প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মত অবস্থায় বন্ধুটি আর নেই। ফাদারের শেষ কথা ছিল, যে রহস্য প্রকৃতি গোপন রাখতে চায় তাকে গোপন থাকতে দিলে ক্ষতি কী? সোজা কথায় যদি বলি তা হলে বলতে হয় ফাদার আমাকে ওই গ্রামে যেতে নিষেধ করেছিলেন। মনের একাংশও তাতে সায় দিচ্ছিল; কিন্তু এতদূর এসে পিছিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। শিলং থেকে কোমৌচ গ্রামে পৌঁছাতে লাগল তিনদিন। লক্কড় মার্কা মোটর গাড়ি এবং ঘোড়ায় টানা ছ্যাকড়া গাড়িতে করে আসতে হয়েছে। হাড়ের প্রতিটি জয়েন্টে ব্যথা করছে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর। অতিকায় সব পাহাড়ি গাছে ঢাকা পবর্তশ্রেণীর মাঝে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক ওপরে এক উর্বর উপত্যকায় দাঁড়িয়ে আছে কোমৌচ গ্রাম।

গ্রামটিকে দেখে মনে হলো ওটা ঘুমিয়ে পড়েছে এবং বাস করছে এক স্বপ্নের জগতে, মনেই হবে না এটার খুব কাছেই ভয়ংকর অশুভ এক জগতের সূচনা। গ্রামের বাড়িগুলোর দিকে তাকালে যে কেউ বলবে ওগুলো কম করে হলেও দুশো বছরের পুরনো। তবে তার থেকেও পুরনো গ্রামের লোকদের পোশাক-আশাক এবং কথাবার্তা। বাইরের জগতের কেউ কখনও এখানে বেড়াতে এসেছে বলে মনে হয় না। গ্রামবাসীরা যথেষ্ট অতিথিপরায়ণ, কথা বলতে আগ্রহী, তবে কেউই অতি উৎসাহী না।

আদ্যিকালের একটি বড় পাকা দালানে এখানকার সবচেয়ে বড় মুদিখানার দোকান। আমি এর পেছনের একটি ঘর ভাড়া করলাম। কথায় কথায় দোকানের মালিক বলল, 'পাঁচ বছর আগে আর একজন বাংলাদেশী এসে কয়েকদিন এই গ্রামে থেকে গেছে। নিজের মনে বিড়বিড় করে কথা

বলত, একা একা ঘোরাঘুরি করত, কবি-টবি হবে হয়তো।' বুঝলাম দোকানি কল্যাণ মিত্রের কথা বলছে। বললাম, 'জী, ঠিকই ধরেছেন ও একজন কবি, আমার পরিচিত। এই গ্রামের কাছেই সে একটি দৃশ্য দেখতে পায় এবং তা নিয়ে একটি কবিতাও লেখে।'

আসলেও তাই নাকি? এইসব কবি-সাহিত্যিকেরা নাম কামায় নতুন নতুন সব কথা বলে এবং উদ্ভট কাজকারবার করে। এই কবি ভদ্রলোকও নিশ্চয় অনেক নাম করেছে। ওঁর মত অদ্ভুত লোক জীবনে দ্বিতীয়টি দেখিনি।

: হ্যাঁ তা বলতে পারেন তবে অধিকাংশ শিল্পীর বেলায় যা হয়, যা কিছু খ্যাতি তা সবই আসে মৃত্যুর পর।

: উনি তা হলে আর বেঁচে নেই!

: পাঁচ বছর আগে চিৎকার করতে করতে পাগলাগারদে মারা গেছে।

: ব্যাপার খুবই খারাপ হয়েছে দেখছি। এই কবি কালো পাথরটির কাছে একটু বেশিই ঘোরাঘুরি করে ফেলেছিল।

মনে হলো আমার হৃৎপিণ্ড ধরে কেউ মোচড় দিয়েছে। তবে আগ্রহের কথা চেপে খুব সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই কালো পাথরটি সম্পর্কে উড়াউড়া কিছু কথা শুনেছি, গ্রামের খুব কাছেই তো ওটা, তাই না?'

যত কাছে ভাবছেন ওটা আসলে তার চেয়েও অনেক কাছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখেন। ওই যে দূরে পাশের দুটো পাহাড়কে ছাড়িয়ে বাঁকা মাথার ন্যাড়া একটি পাহাড় চূড়া দাঁড়িয়ে আছে ওখানটাতেই পাবেন অভিশপ্ত কালো পাথরের ওই স্তম্ভটাকে। ওটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দীক্ষু নদীতে ছড়িয়ে দিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু সত্যি কথা কী জানেন যেই ওটা ভাঙতে গেছে বা ওটার গায়ে একটি কাঠের বাড়িও দিয়েছে সে আর খুব বেশি দিন সূর্যের আলো দেখেনি। অপঘাতে করুণ মৃত্যু হয়েছে বেচারাদের। এখন আর ওদিকে কেউ যায় না।

: জায়গাটা আসলে খারাপ কোন অর্থে?

ওই জায়গাটি প্রেত-যোনীদের আখড়া। যখন আমি খুব ছোট তখন দূরের এক গ্রাম থেকে কলেজপাশ এক যুবক একদিন এখানে এসে হাজির। পাথরটির কথা শুনে হেসে কুটিকুটি। আমাদের শত বছরের ভীতি আর সংস্কারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সে গেল চৈত্র সংক্রান্তির দিন পাথরটির কাছে রাত কাটাতে। পরদিন ভোরে বেচারা হোঁচট খেতে খেতে গ্রামে এসে

উপস্থিত। মুখ দিয়ে ফেনা কাটছে, দুচোখে সীমাহীন আতংক। কেউ যেন তার মগজ ধরে জোরে একটি ঝাঁকি দিয়েছে। এ ঘটনার পর খুব বেশিদিন বাঁচেনি ছেলেটি; কথা প্রায় বলতই না। কোন কোন সময় হঠাৎ মুখ খুললে শোনা যেত ঈশ্বরকে জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ করছে। আর একটি ঘটনা বলি, আমার নিজের এক ভাগ্না খুব ছোটবেলায় পাহাড়ে খেলতে যেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে সন্ধের সময় পাথরটির কাছে ঘুমিয়ে পড়ে সে। ও এখন যুবক, তবুও মাঝেমাঝে রাতে ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করতে করতে জেগে ওঠে। শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ঠাণ্ডা ঘামের স্রোত। বাদ দেন এসব, আসেন অন্য কিছু নিয়ে কথা বলি। অশুভ বিষয় নিয়ে কথা না বাড়ানোই ভাল।

দোকানিকে বললাম, 'আপনার দোকানটি তো বেশ পুরনো মনে হচ্ছে।'

দোকানের যে ভিত দেখছেন ওটা শতশত বছরের পুরনো; এটাই একমাত্র দালান যেটাকে ইউসুফ ক্বররানীর লোকেরা ভেঙে ফেলেনি। সুলতানী বাহিনী চিরুনি অভিযান চালিয়েছিল এই এলাকায়। সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় তারা। এই দালানটি কিন্তু অক্ষত থেকে যায়, এটাকে সিপাহসালার তার হেডকোয়ার্টার বানিয়েছিল। দোকানির কথা থেকে বুঝতে পারলাম গ্রামের বাসিন্দারা মুসলমান বিজয়ের পরে এখানে বসতি করেছে। সুলতানী বাহিনী তাদের অভিযানের সময় এই গ্রামে এবং আশপাশের এলাকায় জীবিত রাখেনি কাউকেই। নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করে এই দেশটিকে একটি বিরান এবং নীরব ভূমিতে রূপান্তরিত করে তারা। তারা চলে যাওয়ার অনেক পরে গ্রামের বর্তমান বাসিন্দারা নিচু এলাকা থেকে এখানে এসে ঘরবাড়ি বানিয়ে থিতু হয়ে বসেছে। দোকানির কথা শুনে মনে হলো না সুলতানী বাহিনীর গণহত্যায় সে খুব মর্মাহত। বরং তার কথা থেকে এটা স্পষ্ট হলো যে, গ্রামের আদি অধিবাসীদেরকে তার পূর্বপুরুষেরা প্রচণ্ড ভয় এবং ঘৃণার চোখে দেখত। গ্রামের আদিবাসীদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম তারা মাঝেমধ্যেই নিচু এলাকায় নেমে যেত এবং যুবতী মেয়েদের ও শিশুদের চুরি করে নিয়ে আসত। আদিবাসীরা এমনকী দেখতেও তাদের মত ছিল না; ওরা ছিল অতি প্রাচীন এক জাতি, কৃষ্ণকায়, ঋজু এবং বলশালী। এই আদিবাসীরা আসলে কারা সে সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। তবে সে এটুকু শুনেছে যে এরা ছিল অপদেবতার পূজারী এবং

অনেক আগে থেকেই এই পাহাড়ি উপত্যকায় বাস করত। সুলতানী বাহিনীর আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তারা।

পরদিন সকালে দোকানিকে ধরলাম কালো পাথরটির কাছে যাওয়ার রাস্তাটি আমাকে ভালমত বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি যাবই বুঝতে পেরে কীভাবে ওখানে যেতে হবে সুন্দর করে তা বুঝিয়ে দিল সে। তিন-চার ঘণ্টা ধরে শাল-পিয়ালে ভর্তি চড়াই বেয়ে বাঁকা মাথার পাহাড়টির গোড়ায় পৌঁছলাম। সরু একটা পায়ে চলা পথ এটাকে পেঁচিয়ে উপরে উঠে গেছে। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে নীচে উপত্যকার দিকে তাকালাম। দেখে মনে হলো পুরো গ্রামটি নীল আকাশের পটভূমিতে শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। যেখানটাতে আমি দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে গ্রাম পর্যন্ত না দেখলাম কোন বাড়ি, না ক্ষেত-খামার। চাষ-বাস, ক্ষেত-খামার সব গ্রামের উল্টোদিকে। কোন এক বিচিত্র কারণে গ্রামের এইদিকটিতে কোন কিছু গড়ে ওঠেনি। পাহাড়চূড়াটি আসলে সেগুন এবং মেহগনি গাছে ঢাকা একটি মালভূমি, টেবিলের পিঠের মত সমতল। ঘন গাছপালা ঝোপঝাড় পেরিয়ে কিছুটা যাওয়ার পরই দেখতে পেলাম সবুজ ঘাসে ছাওয়া ঝকঝকে সুন্দর বেশ চওড়া একটি ফাঁকা জায়গা। এই ফাঁকা জায়গাটির একেবারে শেষমাথায় অপার্থিব এক নির্জনতায় অস্বাভাবিক নৈঃশব্দ্যে একাকী দাঁড়িয়ে আছে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের শিলাস্তম্ভটি।

শিলাখণ্ডটি আটকোনা, লম্বায় ষোলো ফিটের মত এবং প্রায় ফুট দেড়েক চওড়া। একসময় এর গা ছিল চকচকে পালিশ করা তবে এখন এখানে-সেখানে চল্টা উঠে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে এটাকে ভেঙে ফেলার প্রচেষ্টার ফসল। হাতুড়ির ঘায়ে যে এটার খুব বেশি ক্ষতি হয়েছে তা বলা যাবে না। তবে এটাকে পেঁচিয়ে গোড়া থেকে একেবারে মাথা পর্যন্ত যে লেখাগুলো ছিল নীচ থেকে দশফুট ওপর অবধি তার দফা শেষ। এতে করে সমস্যা যেটা হয়েছে সেটি হলো লিপিগুলো কোন ডিরেকশনে পড়তে হবে তা বোঝার কোনও উপায় নেই। নারকেল গাছ বেয়ে ওঠার মত পাথরটি বেয়ে ফুট দশেক ওপরে উঠে গেলাম। ভাল করে নজর দিলাম লিপিগুলোর দিকে। কালের আবর্তে ওপরের লেখাগুলোও ঝাপসা হয়ে এসেছে। মনে পড়ল মান্না দে'র গাওয়া একটি গানের কথা: 'যদি পাথরে লেখো নাম...' তবে এটুকু বুঝতে পারলাম এই লিপির সাথে এযুগের কোনও বর্ণমালার একটুও মিল

নেই। এই শিলালিপির ভাষা অনেক দিন আগে পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে। প্রাচীন হাইরোগ্লিফিক এবং আধুনিক ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে বহু গবেষণাপত্র লিখেছি আমি এবং একথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, এই শিলালিপির সাথে অতীত এবং বর্তমানের কোনও লিপির কোনরকম মিল নেই। একবার গবেষণার জন্যে ইউকাটান বা মধ্যআমেরিকার একটি দেশে যেতে হয়েছিল; সেখানে প্রকাণ্ড এক পাথরের গায়ে কাঁচাহাতে আঁকা অদ্ভুত কিছু চিত্রলিপি দেখেছিলাম। এই লিপিগুলো অনেকটা সেইরকমের। ওখানে বেশকিছুদিন ধরে খোঁড়াখুঁড়ি করছে এমন একজন আমেরিকান প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে ওগুলো কী জানতে চেয়েছিলাম। উত্তরে সে বলেছিল পাথরের গায়ে বহুদিন ধরে বাতাস লেগে লেগে ওগুলো তৈরি হয়েছে অথবা এমনও হতে পারে যে, কোনও রেড ইণ্ডিয়ান বসে বসে মনের খেয়ালে পাথরের গায়ে আঁকিবুঁকি এঁকেছে। তাকে বলেছিলাম, আমার ধারণা এই পাথরটি আসলে অনেক বড় একটি স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ। ধারণা শুনে হেসে ফেলেছিল লোকটি, বলেছিল যদি এটি কোন শিলাস্তম্ভের গোড়াই হয়ে থাকে তা হলে এর সাথে মিল রেখে যে স্তম্ভ তৈরি হবে তা হবে হাজার ফুট উঁচু। যা ওই যুগের লোকের পক্ষে তৈরি করা অসম্ভব। তার ব্যাখ্যা অবশ্য আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।

আমি একথা বলব না যে এই লিপিগুলোর সাথে ইউকাটানের পাথরটির গায়ের ছাপগুলোর হুবহু মিল আছে, তবুও একথা ঠিক যে, দুখানেই পাথরের গোড়া থেকে শুরু হয়ে অদ্ভুত শিলালিপি ওপরের দিকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে গেছে। স্তম্ভটি যে পাথর দিয়ে তৈরি তার গুণাগুণও অবাক করা। এটা যে শুধু চকচকে তাই-ই না অনেক স্বচ্ছও; যে জায়গাগুলো তখনও অক্ষত ছিল সেখান দিয়ে ভেতরের দিকে অনেকখানি দেখা যায়। সারা দুপুর পাথরটার কাছে কাটিয়ে পড়ন্ত বিকেলে যখন ফিরলাম তখন আমি পুরোপুরি হতবুদ্ধি। দুনিয়ার অন্য কোন প্রান্তের কোন পুরাকীর্তির সাথে এই পাথরটির কোন মিলই নেই। যেন স্তম্ভটি কোন ভিনগ্রহের প্রাণী এসে তৈরি করেছে এমন এক সময়ে যখন মানবজাতির অভ্যুদয় এই গ্রহে ঘটেনি। গ্রামে ফিরে টের পেলাম পাথরটির ব্যাপারে আমার আগ্রহ আগের চেয়ে হাজারগুণ বেড়েছে। কারা ওটা তৈরি করল আর কেনই বা করল সেটা না জানা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

দোকানির ভাগ্নাকে খুঁজে বের করে তার স্বপ্নের ব্যাপারে জানতে চাইলাম। সে বলল অনেক কিছুই, কিন্তু সেসবের কোন হাতামাথা নেই।

একই স্বপ্ন সে বারবার দেখে এবং যখন দেখে তখন সবকিছুই তার কাছে খুব পরিষ্কার থাকে। শুধু ঘুম থেকে জাগলেই তার মন থেকে সব কিছু মুছে যায়। সে শুধু মনে করতে পারে সাপের জিভের মত লকলকে আগুনের শিখার কথা আর প্রকাণ্ড একটা ঢাকের দ্রিম-দ্রিম আওয়াজ। তবে একবার সে স্বপ্নে দেখেছিল বিশাল এক কালো দুর্গ-প্রাসাদের পেল্লায় এক গম্বুজের মাথায় পাথরটি দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামের অন্য কেউ এ সম্পর্কে কোনও কথা বলতে নারাজ, ব্যতিক্রম এক স্কুল-মাস্টার। এই বাজপড়া অজগ্রামে যে এত শিক্ষিত একজন মানুষ আছে তা জেনে অবাক হয়েছিলাম। এ সারা দুনিয়া মারা লোক। দেখা গেল উগ্র পাথরের যে বয়সের কথা বলেছে তার সাথে সে পুরোপুরি একমত। তার বিশ্বাস পুরো গ্রামটিই ছিল আসলে একটি ডাইনী সমাজ এবং কালো পাথরটি ছিল তাদের প্রেত-পুজোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান যেখানে নিয়মিত সর্বোচ্চ স্তরের ডাকিনী সভা বসত। এদের এই অভিশপ্ত পৈশাচিক ধর্মকর্ম এবং আদিম আচার-আচরণ আশপাশের সনাতনী ভারতীয় সভ্যতা ও ঐতিহ্য থেকে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তার মতে, লোককাহিনি অনুসারে যে জাতি শিলাস্তম্ভটি বসিয়েছিল তাদের বলা হত যুথালটান। আশপাশের সব জাতিগুলোই মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত এবং এ জাতীয় নাম কোনটিরই নেই। এখানকার আদি বাসিন্দারা যাদু বিদ্যা এবং প্রেত-সাধনায় প্রায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। স্কুল মাস্টারের ধারণা, শিলাস্তম্ভটি এত প্রাচীন যে ওটা আসলে কারা বসিয়েছিল সে ব্যাপারে কারও কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে একথা নিশ্চিত যে, প্রেত-সাধনার তীর্থপীঠ হিসেবে ওটাকে হাজার হাজার বছর ধরে ব্যবহার করা হয়েছে। সমস্ত ডাকিনী ক্রিয়া-কর্মের মূল কেন্দ্র ছিল ওটা; ওটার গোড়ায় যে বেদী রয়েছে সেখানে অসংখ্য যুবতী এবং শিশু বলি দেয়া হয়েছে। লোককথায় আছে যুথালটানেরা সবাই মিলে সুর করে অদ্ভুত এক মন্ত্র পড়ত এবং নরবলি আর রহস্যময় এক যজ্ঞ করে চৈত্র সংক্রান্তির রাতে নরকের এক অপদেবতাকে আহবান করত। সে ওখানে কখনও গিয়েছে কিনা জানতে চাইলাম। উত্তরে বলল, সে কখনও ওখানে যায়নি তবে তার না যাওয়ার পেছনে প্রেত-যোনির ভীতি নয় যা কাজ করেছে সেটা হলো ওখানে যেয়ে লাভটা কী। শিলাখণ্ডটি মুছে যাওয়া অন্ধকার অতীত আর বর্তমানের ভেতর ছোট্ট একটি যোগসূত্র ছাড়া আর তো কিছু নয়। তবে স্কুল-মাস্টার আমাকে স্কন্দাল নামে আরও একটি গ্রামের কথা বলল

যেখানে ইউসুফ কুররানীর সাথে প্রতাপ সিংহ-এর শেষ যুদ্ধটি হয়েছিল। যুদ্ধের পর ইউসুফ বেশিদিন বাঁচেনি। অদ্ভুত এক মানসিক রোগ হয়েছিল তার। প্রায় কখনোই ঘুমাতে পারত না সে। ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন তাড়া করে ফিরত তাকে। সেই অবস্থাতেই মৃত্যুর কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে নকল-নবীশকে প্রতিদিন ডিকটেশন দিত সে। ওখানেই প্রাচীন এক হিন্দু মঠের কাছে তার লাশ দাফন করা হয়। ইউসুফ কুররানীর পূর্বপুরুষ ইরাকের বসরার অধিবাসী। সেই এলাকার নিয়মানুযায়ী একটি মূল্যবান কাঠের বাক্সে ভরে তার প্রিয় পাণ্ডুলিপি কফিনে ভরে দেয়া হয়। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে পাথরে তৈরি হিন্দু মঠটি দুশো বছর আগে ভেঙে পড়ে এবং ওটার পাশে ইউসুফ কুররানীর যে কবরটি ছিল তা চাপা পড়ে যায় শতমণ পাথরের নীচে।

কোমৌচ গ্রামে আসা আমার এক সপ্তাহ হয়ে গেছে। স্কুল-মাস্টারের সাথে নিয়মমাফিক চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে একদিন সন্ধ্যায় দোকানে ফিরছি এমন সময় মনে পড়ল চৈত্র সংক্রান্তি এগিয়ে এসেছে। আজকের রাতই চৈত্র সংক্রান্তির রাত। দোকানে আর গেলাম না; গ্রামটিকে পিছে ফেলে এগিয়ে গেলাম কালো পাথরটি যে পাহাড়ের ওপর সেটার দিকে। থালার মত বড় একটি চাঁদের ঘোলাটে অস্বচ্ছ আলোতে ডুবে আছে চরাচর। বাতাসের কোন চলাচল নেই; চারদিকে গুমোট একটি ভাব অথচ পাতার অন্তহীন খসখস এবং ফিসফিস করে কথা বলার আওয়াজ চমকে দিল আমাকে। মনে হলো শত শত বছর আগে এমনই এক রাতে অশুভ শক্তি ও তাদের পূজারীরা পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে এসে হাজির হত এখানে, নিবেদন করত নিজেদের শয়তানের পদমূলে। ঝুঁকে থাকা পর্বতশিরাগুলোকে চাঁদের আলোয় মনে হলো বহুদিন আগের অতিকায় কোন দুর্গপ্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ যা পাহারা দিচ্ছে এক নিষিদ্ধ জগৎ যেখানে আমি অবৈধভাবে প্রবেশ করেছি। ভাবনাটিকে পাত্তা দিলাম না। বনের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে মনে হলো কে যেন আমাকে অনুসরণ করছে; নিশ্চিত হওয়ার জন্যে হঠাৎ করেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। নরম ভেজাভেজা কী যেন আমার মুখ ঘষে চলে গেল।

ঘাসে ঢাকা খালি জায়গাটিতে বেরিয়ে এলাম, চোখে পড়ল অভিশপ্ত ঋজু স্তম্ভটি। খোলা মাঠটির একদিকে পাহাড় ঘেঁষে টেবিলের মত একটি পাথর দেখতে পেলাম। ওটার ওপর গিয়ে বসলাম এবং ঠিক তখনই মনে হলো কল্যাণ মিত্র এই পাথরটির ওপর বসেই তার কবিতাটি লিখেছিল। দোকানির

ধারণা পাগল হওয়ার পেছনে শিলাস্তম্ভ দায়ী। কিন্তু আমার ধারণা ওর ভেতর পাগলামি অনেক আগে থেকেই ছিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত প্রায় বারোটা। হেলান দিয়ে আরাম করে বসে কী হয় দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। হালকা বাতাসে মেহগনির পাতায় খসখস আওয়াজ উঠল এবং হঠাৎ করেই হালকা একটি বাঁশির সুর শুনতে পেলাম। সেই সঙ্গে মনে হলো কারা যেন ফিসফিস করে খুব অশুভ কিছু উচ্চারণ করছে। আওয়াজটা একঘেয়ে হয়ে উঠল এবং একভাবে স্তম্ভটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনেকটা সম্মোহিত হয়ে পড়লাম; ঘুমে চোখের পাতা বুজে আসতে চাইল। আপ্রাণ চেষ্টা করলাম ঘুম তাড়ানোর, কিন্তু পারলাম না। মনে হলো শিলাস্তম্ভটি পেণ্ডুলামের মত দুলছে; ঝাপসা হয়ে এল চোখের দৃষ্টি এবং একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎই, ধড়মড় করে উঠে বসতে চাইলাম। কিন্তু না, কে যেন গঙ্গোত্রী হিমবাহের মত ঠাণ্ডা হাতে আমাকে পাথরটির সাথে চেপে ধরে রেখেছে। দেখলাম খোলা জায়গাটি মোটেও আর জনশূন্য নেই। সেখানে অদ্ভুত একজাতের নারীপুরুষ জড় হয়েছে যাদের পোশাক-আশাক এতই প্রাচীন যে দুনিয়ার কোথাও কেউ আর ওগুলো এখন পরে না। প্রথমে ভাবলাম কোমৌচ গ্রামের লোকেরাই হয়তো তাদের গোপন অনুষ্ঠান করার জন্যে এখানে এসেছে। তবে ভাল করে লক্ষ করতেই দেখলাম মানুষগুলো গ্রামের লোকদের মত মঙ্গোলীয় না, এরা যথেষ্ট লম্বা এবং ভারি গড়নের। অনেক ঘন নীচের দিকে নামানো ভ্রু, মুখগুলো বড় তবে ভোঁতা ধরনের। লোকগুলো কাটাকাটা চেহারার না মোটেও। এরা আসলে প্রাচীন দ্রাবিড় এবং অস্ট্রিক জাতির মিশ্রণ। এদের চেহারায় দেখতে পেলাম উদগ্র কামনা এবং নিষ্ঠুরতার এক জটিল সমন্বয়। এসব দেখে যে শুধু ভয় পেলাম তাই-ই না—লোকগুলোর ওপর একধরনের ঘৃণা জন্মাল।

অবাক হয়ে দেখলাম ওরা আমাকে কেউ খেয়ালই করছে না। সব নারীপুরুষ স্তম্ভটিকে ঘিরে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে একসাথে সুর করে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। শুরু করল দুহাত উপরে তুলে কোমরের ওপর থেকে একসাথে শরীর দোলাতে। দুলতে থাকা মানুষগুলো একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল স্তম্ভটির মাথার ওপর, মনে হলো কাউকে তারা একাগ্রচিত্তে আহ্বান করছে। আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ গজও হবে না এতগুলো নারীপুরুষ মন্ত্রোচ্চারণ

করছে অথচ মনে হলো অনন্ত সময়ের ওপার থেকে অস্পষ্ট গুনগুন আওয়াজ ভেসে আসছে। শিলাটির কাছেই তেপায়ার ওপর প্রকাণ্ড এক তামার জালা রাখা। সেখান থেকে বিশ্রী এক হলুদ রঙের ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে দেখলাম। যেন একটি ঘিনঘিনে সাপ আস্তে আস্তে দুলতে থাকা স্তম্ভটিকে পেঁচিয়ে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। জালাটির একদিকে হাত-পা বাঁধা একজন যুবতী উলঙ্গ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে তার পাশে তিন-চার মাস বয়সের একটি ছোট্ট শিশুকে নিয়ে। অন্যদিকে ভয়ানক কুৎসিত এক বুড়ি কোলের ওপর কিম্ভূতাকারের কালো রঙের একটি ঢোল কোলে বসে আছে। ওটাতে হাতের চেটো দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট ঘা দিয়ে একধরনের আওয়াজ তুলছে। যদিও সে আওয়াজ আমার কানে পৌঁছেনি।

শরীরগুলো আরও দ্রুতলয়ে দুলতে শুরু করল। কালো পাথরটি এবং মানুষগুলোর মাঝে ফাঁকা জায়গাটিতে যেন মাটি ফুঁড়ে হাজির হলো নগ্ন এক তরুণী। চকচক করছে তার চোখ এবং হাওয়ায় উড়ছে লম্বা চুল। পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে ফাঁকা জায়গাটিকে একপাক ঘুরে সাষ্টাঙ্গে পাথরটিকে প্রণাম করল সে এবং পড়ে থাকল সেভাবেই। এরপর উদয় হলো বিচিত্র পোশাকপরা এক লোক; মেয়েটির মত একই কাজ করল সেও। তার মুখ ঢাকা ছিল বিশাল এক নেকড়ের মাথা দিয়ে বানানো মুখোশে এবং কোমরে পেঁচানো ছিল ছাগলের কাঁচা চামড়া। মানুষ এবং পশুর সংমিশ্রণে একমূর্তিমান দুঃস্বপ্ন সে। একসাথে করে বাঁধা অনেকগুলো বেত একহাতে ধরে ছিল লোকটি। তার গলায় পেঁচানো ছিল ভারি সোনার শেকল। দেখতে পেলাম গলার কাছে শেকলটির সাথে সরু ছোট্ট একটি চেন ঝুলছে। হয়তো ছোট্ট চেনটির সাথে আগে একটি লকেট ছিল। অদ্ভুত লোকটির লাফঝাঁপ দেখে চিৎকার করে উঠল জনতা। প্রণামের ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা মেয়েটির পিঠে হাতের বেতগুলো দিয়ে বাতাসে শিসের আওয়াজ তুলে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল সে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি, শুরু করল অস্বাভাবিক মাদকতাপূর্ণ নাচ। মুখোশ পরা লোকটিও নাচতে শুরু করল তার সাথে এবং কিছুক্ষণ পরপর শপাং শপাং করে মেয়েটির নগ্ন শরীরে বাড়ি মারতে লাগল। যতবার মার খেল মেয়েটি ততবার একটি শব্দই উচ্চারণ করল সে এবং তার সাথে তাল মিলিয়ে ধুয়ো তুলল জনতাও। আমি দেখলাম লোকগুলোর ঠোঁট নড়ছে, শুনতে পেলাম বহুদূর থেকে ভেসে আসা মন্ত্র

পাঠের গুনগুন শব্দ। চোখে পড়ল কী এক বীভৎস আনন্দে তাদের মুখ থেকে ঝরে পড়ছে লালা। ফাঁকা জায়গাটিতে ঢোলের আওয়াজের তালে-তালে অদ্ভুত সেই জুটি ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকল, দোলাতে লাগল শরীর। নাচতে থাকা উলঙ্গ মেয়েটির চোখে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল উন্মাদের দৃষ্টি যা সঞ্চারিত হলো জনতার মাঝেও। যেন পাগল হয়ে গেল অসংখ্য নারীপুরুষ। মেয়েটি তার নাচের গতি বাড়িয়ে দিল তিনগুণ, তার সাথে যোগ দিল মুখোশপরা লোকটিও। ধীরে ধীরে ঘিনঘিনে এবং অশ্লীল হয়ে উঠল তাদের নাচ। কুৎসিত বুড়ি তার ঢোলে ঘনঘন বাড়ি দিতে লাগল। মেয়েটির পিঠে বেত ভাঙার মড়মড় আওয়াজ উঠল। তার ঘামে পিচ্ছিল নগ্ন পিঠ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল রক্তের ধারা। দেখে মনে হলো বেতের বাড়ি খেয়ে তার যতখানি ব্যথা লাগছে তারচেয়ে বেশি যেন সে ওটা থেকে নাচের উৎসাহ পাচ্ছে।

স্তম্ভটির মাথা ছাড়িয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে গেল আকাশের দিকে, ছড়িয়ে পড়ল পাথরের গোড়া থেকে ঘাসের ওপর। ঢাকা পড়ল মেয়েটি ধোঁয়ার নীচে। হঠাৎ করেই ধোঁয়ার বেষ্টনি ছাড়িয়ে তীর বেগে খোলা জায়গায় বের হয়ে এল সে, পেছনে ধেয়ে এল মুখোশপরা অদ্ভুত সেই পুরোহিত। বেতের প্রচণ্ড বাড়ি খেয়ে অস্বাভাবিক এক চিৎকার বেরিয়ে এল মেয়েটির মুখ থেকে। শেষবারের মত দুহাত ওপরে তুলে লাফ দিয়ে মাটি থেকে বেশ কিছুটা ওপরে উঠে গেল সে, ভারি পাথরের মত দড়াম করে পড়ল ঘাসের ওপর। কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল তার চকচকে শরীর। মুখোশপরা পুরোহিত তার পাশবিক শক্তি দিয়ে মেরেই চলল এবং সেই অবস্থাতেই পেট ঘষটে ঘষটে মোচড় খেতে খেতে স্তম্ভটির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল মেয়েটি, পেছনে পড়ে থাকল রক্তের মোটা একটি ধারা। শেষমেশ ঘেমে নেয়ে কাঁপতে কাঁপতে শিলাটির কাছে পৌঁছে দুহাতে আলিঙ্গন করল হিমের মত ঠাণ্ডা পাথরটিকে। শিলাখণ্ডটিকে ভরিয়ে দিতে লাগল অশ্লীল, অপবিত্র আদর-সোহাগে।

পুরোহিত তার রক্তে লাল হয়ে যাওয়া বেতের গোছাটিকে ছুঁড়ে দিল আকাশের দিকে। বিশাল এক হুঙ্কার দিয়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা জনতা প্রবল আক্রোশে আর পাশবিক উন্মত্ততায় ঝাঁপিয়ে পড়ল একজন আর একজনের দিকে। আঁচড়ে খামচে ছিঁড়তে লাগল একে অপরের পরিধেয়। ছোঁ মেরে মাটি থেকে শিশুটিকে তুলে নিল পুরোহিত, ওপরের

দিকে শূন্যে ছুঁড়ে মারল। ডুকরে কেঁদে উঠল শিশুটি। অনেক উঁচু থেকে আছড়ে পড়ল স্তম্ভটির গোড়ায়। কালো ভিতের ওপর ছিটকে পড়ল ওটার মগজ। ছোট্ট মৃতদেহটিকে আবার তুলে নিল পুরোহিত। প্রচণ্ড টানে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে ফেলল কচি তুলতুলে হাত-পাগুলো। ভক্তিভরে স্তম্ভটির গায়ে লেপে দিল শিশুটির রক্ত। এরপর ছুঁড়ে দিল ছিন্নভিন্ন শরীরটিকে গনগনে তামার জালাটির দিকে। ছেঁড়াখোঁড়া মাংসে ঢাকা পড়ল জ্বলন্ত কয়লা এবং লকলকে আগুনের শিখা। উল্লাসে ফেটে পড়ল উন্মত্ত জনতা, চিৎকার করে বারবার অদ্ভুত একটি নাম উচ্চারণ করতে থাকল তারা। হঠাৎ করেই মাটিতে উপুড় হলো সবাই সাষ্টাঙ্গ প্রণামের ভঙ্গিতে, সাপের মত মোচড় দিতে লাগল। বিজয়ের ভঙ্গিতে ওপরে তার দুহাত ওঠাল পুরোহিত। ভয়ের চোটে গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে চিৎকার করতে চাইলাম আমি কিন্তু গোঁ গোঁ শব্দ ছাড়া আর বেশি কিছু বের হলো না মুখ দিয়ে। তাকিয়ে দেখলাম কালো চকচকে মোটা একটি সাপ পেঁচিয়ে আছে স্তম্ভটিকে। শিলার মাথা ছাড়িয়ে অনেক উপরে পুরো তৃণভূমিটিকে ঘিরে যেন কুয়াশার ভেতর বাতাসে ভেসে আছে প্রকাণ্ড মাথা। অথচ কোন সাপের মাথা নয় সেটা। ওটা একটি অতিকায় মোষের মাথা। বিশাল ঢেউ খেলা বাঁকা শিং যেন দুদিক থেকে ধরে আছে চাঁদকে। লাল টকটকে চোখগুলোর কালো নীলচে মণিতে বরফের মত ঠাণ্ডা ভয়ানক নিষ্ঠুর দৃষ্টি। যেখান থেকে ঝরে পড়ছে অন্তহীন কামনা, সীমাহীন লালসা, অপার্থিব নিষ্ঠুরতা এবং দানবীয় পৈশাচিকতা যা বংশপরম্পরায় আজন্ম মানবজাতিকে তাড়া করে ফিরছে। ওই বীভৎস চোখগুলোতে ফুটে উঠল পৃথিবীর যা কিছু অশুভ, অসংখ্য শহর-নগর-বন্দর-জনপদের জঘন্য সব অনাচার এবং অসংখ্য গোপন পাপাচার। হারিয়ে গেছে মানুষ, কালের প্রবাহে বিলুপ্ত হয়েছে সভ্যতা, কিন্তু যা কিছু গোপন এবং অশুভ তা যদি সব জমা হয়ে থাকে কোন এক আদিম গুহার চির অন্ধকারে, তা হলে বলতে হবে সেই আদিম গুহার সব আঁধার যেন জমা হয়েছে কালো ওই চোখগুলোতে।

হঠাৎ করেই অস্বাভাবিক এক নীরবতায় ঢেকে গেল এই পাশবিক, অপবিত্র, নিষ্ঠুর প্রেতপুজোর সব অনুষ্ঠান, মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা পূজারীদের শরীর, তৃণভূমি এবং পাহাড়। রাতের স্বাভাবিক যে শব্দ শোনা যায় সেগুলোও মনে হলো বন্ধ, পুরো এলাকাটিকে যেন গ্রাস করল মহাশূন্যের

নীরবতা। নেকড়ের মুখোশপরা পুরোহিত এবার হাত-পা বাঁধার ভয়ে আধমরা হয়ে যাওয়া যুবতী মেয়েটিকে দুহাতে তুলে ধরল, নিবেদন করল বাতাসে ভেসে থাকা বীভৎস মাথাটির কাছে। দেখলাম যেন কুয়াশা ভেদ করে অনেক নীচে নেমে এল মাথাটি, ফুলে ওঠা ভেজাভেজা কালো কুচকুচে প্রকাণ্ড নাসারন্ধ্র দিয়ে টেনে নিতে লাগল অসহায় মেয়েটির প্রাণের সমস্ত নির্যাস। দেহসম্ভোগের মত গভীর এক তৃপ্তিতে বুজে এল ওটার চোখগুলো। ঠিক সেই সময়ে আমার চেতনার গভীরে কে যেন ভীষণ জোরে আঘাত করল, তলিয়ে গেলাম কল্পনাহীন এক গভীর অন্ধকারে।

চোখ মেলে দেখলাম চারদিকে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। মনে পড়ল রাতের সব ঘটনা। ধড়মড় করে উঠে চারদিকে তাকালাম। সবুজ ঘাসে ঢাকা সমতল ভূমি ঠিক আগের মতই। তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে ঋজু, কালো চকচকে পাথরটি; বয়ে যাচ্ছে ভোরের হিমেল বাতাস। ঘাসের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেখানে যুবতী মেয়েটি হাত-পা বাঁধা হয়ে পড়েছিল সেখানটায় গেলাম। যে ঘাসের ওপর এত হুলস্থুল হলো তা অসংখ্য পায়ের চাপে সম্পূর্ণ নেতিয়ে পড়ার কথা। এ ছাড়া রক্তের মোটা একটি ধারা পেছনে রেখে নর্তকী মেয়েটি ঘসটে ঘসটে স্তম্ভটির কাছে এগিয়ে গিয়েছিল। সেই রক্তের দাগও থাকার কথা ঘাসের ওপর। কিন্তু নাহ। ঘাসের প্রতিটি মাথা একেবারে খাড়া, লালের কোন ছোপ কোথাও নেই। এমনকী স্তম্ভটির গোড়ার কাছে শিশুটির যে মগজ ছিটকে পড়েছিল সেসবের কোন চিহ্নই নেই। তা হলে কি ওটা ছিল কোন প্রখর কল্পনা অথবা দুঃস্বপ্ন? কিন্তু তাই-ই যদি হবে তা হলে এত পরিষ্কার এবং অনুপুঙ্খভাবে সবকিছু মনে থাকল কীভাবে!

খুব দ্রুত গ্রামে ফিরলাম। আমি নিশ্চিত দোকানের পেছনে আমার ঘরে ঢোকা পর্যন্ত কেউ আমাকে দেখেনি। বিছানার ওপর বসে গতরাতের ঘটনাগুলো সব প্রথম থেকে মনে করার চেষ্টা করলাম। বুঝতে পারলাম ওগুলো কোন স্বপ্ন ছিল না। যা কিছু দেখেছি তা ছিল এক ধরনের প্রহেলিকা, যেন আমি প্রবেশ করেছিলাম এক মায়ার জগতে যা আসলে সুদূর অতীতে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা এবং যেভাবেই হোক তা আমার চোখের সামনে আবার ঘটেছে অথবা যে উপায়েই হোক আমি গিয়ে হাজির হয়েছিলাম হাজার বছর আগের কোনও এক বিশেষ রাতে। কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার উপায় কী, কীভাবে বুঝব ওটা আমার মস্তিষ্কের কোন কল্পনা নয় বরং অনেককাল আগে

ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা যার রয়েছে বাস্তব অস্তিত্ব?

হঠাৎই মনে পড়ল ইউসুফ ক্বররানীর নাম। সুলতানী বাহিনীর এই সিপাহসালার এখানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল। খুবই স্বাভাবিক সে কালো পাথরটির কাছেও গিয়ে থাকবে যা প্রকারান্তরে তার সর্বনাশ ডেকে এনেছে। সিপাহসালারের কফিনে পার্চমেণ্টে লেখা যে পাণ্ডুলিপি রাখা হয়েছিল তাতে নিশ্চয় কোমৌচ এবং কালো পাথরটির কথাও লেখা থাকবে। আজ পর্যন্ত ইউসুফ ক্বররানীর হাড়গোড় দেহাবশেষ এসব কিছুই পাওয়া যায়নি। হয়তো এখনও সিপাহসালারের ভেঙে পড়া স্মৃতি সৌধ বা কবরের ভেতর পার্চমেণ্ট পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া যাবে। শুরু থেকেই লক্ষ করেছি কোমৌচ গ্রামে প্রচুর নীলগাই এবং ছাগল পালা হয়। গোলগাল ছোটখাট নীলগাই টানা একটি গাড়ি ভাড়া করে চার ক্রোশ দূরে স্কম্ভাল গ্রামের পাশে মূল যুদ্ধ যে জায়গাটিতে হয়েছিল সেখানে পৌঁছলাম। এই গ্রামে বড় একটি চায়ের দোকান আছে। সেখানে গাড়োয়ান সমেত গাড়িটি রেখে আমি বের হলাম সমাধির খোঁজে। বলে গেলাম আশপাশটা একটু ঘুরে দেখব। ফিরতে দেরি হলে তারা যেন দুশ্চিন্তা না করে।

সরু একটি পাহাড়ি উপত্যকায় দেখতে পেলাম ভেঙে পড়া মঠটি। সন্ধে হতেই চাঁদ উঠল; ফকফকে জোছনায় ব্যস্ত হাতে সমাধির পাথর সরানোর কাজে লেগে গেলাম। অমানুষিক পরিশ্রম করলাম সারারাত। ভাবতে আজও অবাক লাগে আমার মত একজন অলস অধ্যাপক কীভাবে সূর্য ওঠা অবধি শত মণ পাথর সরিয়েছিল। ভোরের আলো যখন ফুটল তখন কফিনের কাঠের ডালার ওপর থেকে পাথরের শেষ টুকরোটি সরিয়ে ফেলেছি। শতশত বছর মাটির নীচে থেকে ভুসভুসে হয়ে উঠেছে কাঠ। টান দিতেই অর্ধেক ভেঙে উঠে এল। ভেতরে তাকিয়ে দেখলাম কতগুলো হাড়গোড় এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে, একপাশে জটিল কাজ করা কাঠের কালো রঙের একটি বাক্স; ওপরে রজনের ঘন পালিশ থাকায় এত বছর পরেও ওটার কিছু হয়নি। পালিশের এই প্রযুক্তি অনেক আগে জাপান থেকে ভারতবর্ষে আনা হয়। ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন গাছের রস ফার্মেণ্ট করে তৈরি হত পালিশের মালমশলা। যেগুলো জাপানীরাই শুধু বানাত এবং রপ্তানী করত। শাহবাগের জাতীয় যাদুঘরে রাজরাজড়াদের কিছু খাটপালং এখনও দেখতে পাওয়া যায়। শত বছরের পুরনো এই আসবাবের পালিশ আজও অটুট। দারুণ ব্যয়বহুল বলে

পালিশের এই পদ্ধতি এখন আর নেই। ছোঁ মেরে বাক্সটি তুলে নিলাম। হাড়গুলোর ওপর কোনরকমে কয়েকটি পাথর চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়লাম ওখান থেকে। এলাকার কোন লোক যদি এ অবস্থায় আমাকে খুঁজে পায় তা হলে আর দেখতে হবে না। কবর খুঁড়ে লাশ চুরির দায়ে ফেঁসে যেতে হবে তা সে যত বছরের পুরনোই হোক।

চায়ের দোকানে ফিরে নাশতা করে গাড়োয়ানকে বললাম ফিরতি পথ ধরতে। সন্ধের মুখোমুখি মুদি দোকানে আমার ঘরে ফিরে বাক্সটি খুলে দেখলাম পার্চমেণ্ট পুরোটাই অক্ষত আছে। ওটার পাশে বাক্সের ভেতর সিল্কে মোড়া ছোট্ট আটকোনা শক্ত আর বেশ ভারী একটি জিনিসও পেলাম। বহুকাল আগের হলদে হয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপির পাতাগুলোতে কী লেখা আছে তা জানার ভীষণ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ওটা পড়তে পারলাম না। ক্লান্তিতে চোখের পাতা জড়িয়ে এল। দুদিন ঘুমাইনি এর ওপর যোগ হয়েছে সারারাত পাথর সরানোর মত অমানুষিক পরিশ্রম। বিছানায় পিঠ ঠেকানো মাত্র তলিয়ে গেলাম গভীর ঘুমে, উঠলাম পরদিন দুপুরে। গোসল করে খেয়েদেয়ে দোকানির সাথে কিছুক্ষণ গল্প করে যখন ঘরে ফিরলাম তখন সন্ধে নামছে।

মোম জ্বেলে পাণ্ডুলিপিটি খুললাম। বুঝলাম পাঠোদ্ধারের কাজটি সহজ হবে না। আটশো বছর আগের ফার্সিতে লেখা ওটা, এই ভাষায় আমার খুব বেশি দখল নেই। তবে পড়ে ভাসাভাসা যেটুকু বুঝতে পারলাম তাতে সড়সড় করে ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল। আরও গভীরভাবে পড়ে পুরো ব্যাপারটির অনেকটাই যখন পরিষ্কার হলো তখন প্রচণ্ড ভয় পেলাম। বাইরের ঝিঁঝির ডাক ছাপিয়ে কানে ভেসে এল কুৎসিত বুড়িটির কালো রঙের আজব ঢোলটির ডুগডুগ আওয়াজ। মনে হলো ভীষণ অপবিত্র এবং দারুণ অশ্লীল কোন এক অশুভ শক্তির বীভৎস নিঃশ্বাসে ভারী হয়ে উঠেছে রাতের আঁধার যা প্রভাব ফেলছে আমার আত্মার ওপর। এভাবে কতক্ষণ কেটেছে বলতে পারব না। হঠাৎ খেয়াল করলাম জানালার ওপাশে ভোরের আলো খেলা করছে। পাণ্ডুলিপি বন্ধ করে নজর দিলাম রেশমী কাপড়ে পেঁচানো অভিশপ্ত বস্তুটির দিকে। পার্চমেণ্টের বর্ণনার সমস্ত প্রমাণ যেন বহন করছে ওটা। কাপড় সরিয়ে তালুর ওপর রাখলাম চ্যাপ্টা আটকোনা জিনিসটিকে। গভীর মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলাম ওটাকে। অশুভ জিনিসদুটোকে আবার বাক্সে ভরলাম।

সকালের নাস্তা সেরে ওটা নিয়ে রওনা হলাম খরস্রোতা দীক্ষু নদীর উদ্দেশে। দুপুরে পৌঁছে গেলাম নদীর পাড়ে। পাড় থেকে অনেক নীচে বয়ে চলেছে দীক্ষু। এত ওপর থেকেও শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে স্রোতের। বাক্সটিতে বেশ কিছু পাথর ভরে ছুঁড়ে ফেললাম নদীতে। নীচে নামতে নামতে ছোট হতে হতে একসময় পানিতে পড়ে দৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেল নারকীয় বাক্সটি।

সবদিক বিবেচনা করে মনে হলো নরক থেকে উঠে এসেছিল এই প্রেতপূজারীরা এবং বহু আগেই নরকে ফিরে যেতে হয়েছে এই বীভৎস অপদেবতাকে। বহুকাল আগে সভ্যতার সূচনাকালে শতশত বছর ধরে সে প্রভাব বিস্তার করেছিল আদিম মানুষের সমাজে, বনে জঙ্গলে, পর্বতে, উপত্যকায় দোর্দণ্ডপ্রতাপে নিয়ন্ত্রণ করত সে সবকিছু। কিন্তু মানুষের আত্মার ওপর তার সেই অশুভ নিয়ন্ত্রণ চিরস্থায়ী হতে পারেনি; কালের অসীম প্রবাহে লুপ্ত হয়েছে তার সাম্রাজ্য। রাজ্যের প্রজারা সবাই এখন মৃত; প্রেত হয়ে আজও পুজো করছে তারা তাদের চেয়েও বড় ভীষণ অশুভ অন্য আর একটি প্রেতকে। পূজারী এবং দেবতা উভয়ই আটকা পড়েছে অনন্ত সময়ের বলয়ে। ওই রহস্যময় রাতে নরকের দরজা খুলে কীভাবে তারা বের হয়ে এসেছিল বলতে পারব না। কিন্তু তাদেরকে নিজের চোখে দেখেছি, পরে সিপাহসালারের বর্ণনাতেও পড়েছি কোমৌচ গ্রামটি পতনের পর শিলাস্তম্ভটির উপত্যকায় গিয়ে কী দেখতে পেয়েছিল তারা। সেখানে যা দেখতে পেয়েছিল সে বর্ণনা সেখানে তো আছেই এর ওপর পুরোহিত এবং পূজারীদের ধরে অমানুষিক নির্যাতন করে তাদের মুখ থেকে যে সব গোপন কথা বের করে নেয় সিপাহসালার এবং তার সৈন্যেরা সেসব কথাও লিখে রেখেছে তারা। এ যেন দু হাজার বছর আগে রোমানদের ইংল্যাণ্ড বিজয় এবং সর্বনাশা ড্রুয়িড ধর্মের প্রধান পুরোহিত রানী বোয়াডিক্কা ও আর তার অনুসারীদের নির্বংশ করার মত। কে বলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় না? কাছেই একটি পাহাড়ের গুহায় বিজয়ীরা খুঁজে পায় প্রাচীন এক গুহা; সেখানে তারা দেখতে পায় অসংখ্য নরবলির রক্তে কালচে হয়ে যাওয়া হিম ঠাণ্ডা গ্রানাইট পাথরের বেদীর ওপর চকচকে কষ্টিপাথরে তৈরি বিকট আকৃতির অপদেবতা সেথের মূর্তি। গুহার ভেতরে ঘন অন্ধকার মশালের আলোয় বীভৎস সেই মূর্তি দেখে কাঁপুনি উঠে গিয়েছিল দুর্ধর্ষ আফগান সেনাদের। ইউসুফ কুররানীর নির্দেশে গুহামুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। তবে এই ঘটনার পরপরই ভয়ঙ্কর

ছোঁয়াচে এক কালাজ্বরে ক্বররানীর অর্ধেক সৈন্য উজাড় হয়ে যায়।

কাপড়ে পেঁচানো আটকোনা জিনিসটি ছিল মাঝখানে মোষের মাথাঅলা মোটা একটি সাপের মূর্তি। সেথের আকৃতি খোদাই করা খাঁটি সোনার একটি লকেট ওটা। মনে পড়ল অদ্ভুত সেই পুরোহিতের গলায় ঝোলানো সোনার শেকলের কথা যেটাতে একটি ছোট্ট চেন ঝুলছিল অথচ তাতে কোন লকেট ছিল না। কল্যাণ মিত্র স্তম্ভটির কাছে গিয়েছিল দিনের বেলায় এবং ওখানে বেশ কিছু সময় কাটিয়ে চলে গিয়েছিল অন্য কোথাও। যদি সে আমার মত রাতের বেলা পুজোর পুরো অনুষ্ঠানটি দেখত তা হলে হয়তো একপর্যায়ে চেতনা হারিয়ে ফেলত এবং বেঁচে যেত। তবে তাই-ই যদি হবে তা হলে দুজন কিষাণ এবং কলেজপাশ যুবকটিরও তো ভাল থাকার কথা। হতে পারে সেথের বাক্সবন্দি লকেটটি সমাধি থেকে তুলে নদীতে ফেলে দিয়ে নরকের এই জঘন্য জীবটিকে খুশি করেছি আমি। আমাকে বাঁচিয়েছে সে পাগল হওয়া থেকে।

আজ সেথ নেই, নেই তার পূজারীরা; কিন্তু প্রতি বছর বিশেষ একরাতে তাদের তীর্থভূমিতে এখনও মঞ্চস্থ হয় সেই প্রহেলিকা। সেথের ভয় আমাকে যতখানি কাহিল করল তার চেয়ে বেশি বিচলিত হয়ে পড়লাম এই কথা ভেবে যে, এইরকম বীভৎস এক অপদেবতা একসময় হয়ে উঠেছিল মনুষ্যসমাজের একমাত্র নিয়ন্ত্রক। উগ্র গরীবুল্লাহর ডায়েরীর অসংখ্য পাতায় আরও যে সব বিভীষিকা রয়েছে সেগুলো পড়ার আগ্রহ উবে গেল সম্পূর্ণ। শিলাস্তম্ভটির কথা বারবার লিখেছে সে, বলেছে চাবির কথা। এখন বুঝতে পারছি সে আসলে বলতে চেয়েছে ওটা অতীতে ফিরে যাওয়ার চাবি, কিন্তু কোন্ অতীত? যে অতীতের ইঙ্গিত সে দিয়েছে তা হলো অশুভ যাদুবিদ্যা এবং প্রেত সাধনার এক পাপ পঙ্কিল অতীত। দোকানদারের ভাগ্না যে নগরদুর্গের স্বপ্ন দেখে এবং পাথরটিকে দেখতে পায় সুউচ্চ এক গম্বুজের চুড়োয় এটা অলীক কোন দৃশ্য না, এই উপত্যকায় তৃণভূমির নীচে হয়তো মাটিতে পুরোপুরি ঢাকা পড়ে আছে বিশাল এক দুর্গ যার প্রতিটি কামরায়, [illegible] বারান্দার বাঁকে বাঁকে শতশত বছর ধরে জমা হয়েছে অকল্পনীয় পাপ, বঞ্চনা ও অশুভ বিভীষিকা। হয়তো দুর্গের নীচ থেকে সূচনা হয়েছে এক সুড়ঙ্গের যা শেষ হয়েছে নরকের শেষ ধাপে। ইউসুফ ক্বররানী ও তার সেনারা যা মাটিচাপা দিয়েছে, অনন্তকালের জন্যে যাকে দৃষ্টির আড়াল করেছে তাকে উন্মোচিত না করাই

ভাল। অশুভ কালো পাথরটির নীচে যা আছে তা থাকুক ওখানেই। চার্চের ফাদারের কথাই ঠিক, যে রহস্য প্রকৃতি গোপন রাখতে চায় তাকে গোপন থাকতে দেয়াই ভাল। তবে একথা মানতেই হবে যে, সেথ এবং তার পূজারীরা অতীতের অন্ধকারে বিলীন হলেও শিলাস্তম্ভটির অশুভ প্রভাব আজও অটুট। এখনও ক্ষমতাধর তার সেই প্রভু।

[বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে]
মুহম্মদ আলমগীর তৈমূর

যারা কালো চশমা পরে

তাদেরকে মোটেও বিশ্বাস করবেন না। ভুলেও বিশ্বাস করবেন না। একদম বিশ্বাস করবেন না। আপনারা যাঁরা মাঝে-মধ্যে ফ্যাশন করে চোখে কালো চশমা লাগান, কিংবা অন্ধত্বের কারণে এমন চশমা চোখে দেন—আমি তাঁদের কথা কিন্তু বলছি না। তাঁদের কথাও বলছি না, যাঁরা চোখের রোগের কারণে বাধ্য হয়ে চোখে চড়ান অমন চশমা। কিংবা যাঁদের প্রখর রোদ সহ্য করে বাইরে কোন কাজ করতে হয় তাঁরা চোখে কালো-চশমা লাগালেও আমার কিচ্ছুটি বলার নেই।

কিন্তু যাঁরা এমনিতেই কোন কারণ ব্যতিরেকেই রাত-দিন চোখে কালো-চশমা লাগিয়ে ঘোরেন তাঁদের থেকে সাবধান। ভুলেও তাঁদের ঘেঁষতে দেবেন না কাছে। দিলে? দিলে পস্তাতে হবে আমার মত।

কেন? কী দোষ কালো চশমায়? দুনিয়া জোড়া এত-শত নামি-দামি চশমার কোম্পানি তা হলে আছে কী করতে? লোকে যদি কালো-চশমা না কিনবে তা হলে তো কোম্পানিগুলো দেউলিয়া হয়ে যেত কবেই। তবে?

না, আমাকে ভুল বুঝবেন না দয়া করে।

আমি কালো-চশমার বিরুদ্ধে নই।

কিন্তু যাঁরা কালো-চশমা চোখে দেন তাঁদের বিরুদ্ধে।

না, সবার বিরুদ্ধে, এমনও না।

যারা অন্ধকারে চোখে কালো-চশমা দেয় তাদের বিরুদ্ধে।

না, তাদের সবার বিরুদ্ধেও না।

তাদের মধ্যে কারও কারও কথা বলছি আমি।

কিন্তু, তারা কারা—তাদের তো চিনতে পারবেন না আপনি।

তাই, ঝুঁকি নেবেন না।

কালো-চশমা দেখলেই সাবধান হয়ে যান।

সাবধান!

এটা কিন্তু কোন গল্প নয়। একদম সত্য। একবিন্দু মিথ্যে নেই এতে।

আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু যে পরিস্থিতিতে আমি এই লেখাটি লিখছি তখন বানিয়ে বানিয়ে–কল্পনা করে একটা গল্প তৈরি করা সম্ভব নয় দুনিয়ার কারও পক্ষেই। অসম্ভব। বিশ্বাস করুন!

ভাবছেন আমি উন্মাদ? পাগলের প্রলাপ বকছি? তা ভাবতেই পারেন। আজকাল সবাই ব্যস্ত। কিন্তু আপনাদের অনুরোধ করি একটু ধৈর্য ধরে লেখাটা পড়তে। পাগলের প্রলাপই না হয় শুনলেন আপনার মহামূল্যবান সময়ের একটুখানি নষ্ট করে। প্লীজ, না পড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন না লেখাটা। বিশ্বাস করুন–তাতে করে ভাল হবে আপনারই। সত্যি বলছি! কসম!

আমার এখনকার শারীরিক এবং মানসিক অবস্থায় আমি যা বলতে চাইছি সেটা গুছিয়ে বলতে পারব কিনা জানি না। হয়তো ভাববেন–নেশাখোর কোথাকার। তাও, আমাকে বলে যেতেই হবে কথাগুলো। না হলে মরেও যে শান্তি পাব না আমি। এমনিতেই জীবনে ভাল কাজ করিনি বললেই চলে, তাই আজ এই শেষ মুহূর্তে এসে অন্তত একটা ভাল কাজ করে যেতে ইচ্ছে করছে। হয়তো আমার এই কথায় আপনাদের কেউ একজন একটু সতর্ক হলেও হতে পারেন। অশুভ আর অস্বাভাবিক পরিণতির হাত থেকে বেঁচে যেতে পারেন আপনি; শুধু একটু সতর্ক হলেই।

বিশ্বাস করুন দয়া করে।

এটাই আমার জীবনের শেষ কথা।

কীভাবে শুরু করব জানি না।

তবে আসল কথাটা বলে ফেলি প্রথমেই।

আর খানিকক্ষণের মধ্যেই রক্তচোষা এক ভ্যাম্পায়ারে পরিণত হতে যাচ্ছি আমি। হ্যাঁ, ভুল হয়নি শুনতে আপনার–ভ্যাম্পায়ার হয়ে যাচ্ছি আমি। সময় আছে আর বড়জোর বারো ঘণ্টা। যা বলার তাড়াতাড়ি বলতে হবে আমাকে।

শুনবেন কেউ? প্লীজ!

আর দশজনের মত একটা স্বাভাবিক জীবন বোধহয় কখনওই ছিল না আমার। অবশ্য এও ঠিক যে নিজের কষ্টগুলোকে বরাবরই অন্যের তুলনায় বেশি গভীর মনে হয়। আমার বাবা ছিলেন মাদ্রাসার দরিদ্র শিক্ষক। সাদাসিধা–নিতান্ত ধর্মপরায়ণ মানুষ। জ্ঞান হবার পর থেকে নিজের ইচ্ছায়

কোন বড় অপরাধ তিনি করেননি। অথচ, জগতের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট আমি তাঁর জীবনেই ঘটতে দেখেছি। তিনি হাসিমুখে বলতেন, 'এসবই হচ্ছে আল্লাহপাকের পরীক্ষা।' কিন্তু এই 'পরীক্ষা' নেবার অমানবিক পদ্ধতিটাকে আমি মেনে নিতে পারিনি কখনওই। একজন মানুষ কি শুধু পরকালের জন্যই পুণ্য সঞ্চয় করবেন? ইহকালের কি কোন মূল্যই নেই। আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে আমার মা মারা যান। হাত-পা ধরেও বড় ডাক্তারকে নাকি তখন আনতে পারেননি বাবা। আমার বড়বোনকে তার জামাই কুপিয়ে মেরে ফেলে চাহিদা মত যৌতুক না পেয়ে। লোকটার কোন বিচার তো হয়ইনি বরঞ্চ উল্টো আমাদেরই ভয়ে ভয়ে কাটাতে হত দিন। আমার বড় ভাই কোন এক অজ্ঞাত কারণে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। আমি আর বাবা মিলে দড়ি কেটে লাশটা নামাই নীচে। কোটর থেকে চোখ জোড়া ছিটকে বেরিয়ে আসছিল যেন। জিহ্বাটা বাইরে বেরিয়ে ছিল অতি বীভৎস এক চেহারা নিয়ে। লাশ নামাবার পর বাবা আর সহ্য না করতে পেরে বুকে হাত দিয়ে শুয়ে পড়েন। বাবার স্ট্রোক হয়। বেঁচে গেলেও পুরো শরীর অবশ হয়ে যায় তাঁর। দু'বছর বিছানায় পড়ে থাকেন। বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে একসময় পিঠে পচন ধরে যাচ্ছিল বাবার। অথচ আমাদের কোন আত্মীয়ও একটা কোন সাহায্য তো দূরে থাক, একটু ভাল কথাও বলেনি ওই দুঃসময়ে। দীর্ঘ দু'টি বছর নরক যন্ত্রণা ভোগ করে বাবা মারা যান। বাবা পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। সম্ভবত তিনি বেহেস্তে সুখেই আছেন। কিন্তু তিনি আমাকে এই কঠিন পৃথিবীতে একদম একা করে চলে গেলেন। আমার জন্য, সেটা দোযখের চে' কম ছিল না।

বাবা যখন মারা যান তখন আমার বয়স ছিল সতেরো। কোনমতে টেনেটুনে মেট্রিকটা পাশ করেছি, কোন কলেজে ভর্তি হওয়া হয়নি আর। বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি রায়েরবাজার হাই স্কুলের সামনের রেস্টুরেন্টটায় বাবুর্চির হেলপার হিসেবে কাজ আরম্ভ করি। দিন-রাত খুব খাটতে হত। সাথে বাবুর্চির চড়-থাপ্পড়ও ছিল নিত্য সহচর। তবে রেস্টুরেন্ট তো তাই খাবার অভাব হয়নি ওই সময়টায়। মধ্যরাতে হোটেল বন্ধ করে ভেতরে বসে আমরা কর্মচারীরা সারাদিনে বেঁচে-যাওয়া তরকারি একত্রিত করে রাতের খাবার খেতাম পেটপুরে। মাঝে-মধ্যে গরমের দিনে তরকারিতে পচন ধরে টক গন্ধ বেরোত, কোনদিন খদ্দের বেশি থাকলে তরকারির উচ্ছিষ্টই মিলত।

তারপরও, আপনারা যাঁরা খিদের কষ্ট জানেন না তাঁরা বুঝবেন না যে ওই সব বাসি কিংবা উচ্ছিষ্টের খাদ্যও কী করে কারও কারও জন্য অমৃতসম হয়ে ওঠে।

কিন্তু বাবার মৃত্যুর সাথে সাথেই কাকতালীয় ভাবেই যেন রেস্টুরেন্টটাও বন্ধ করে দিল মালিক। প্রতিদিন নিশ্চিন্ত অন্নের সংস্থানটা এমন হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যেন অকূল সমুদ্রে পড়ি আমি। অন্য কোথাও কাজও পাই না খুঁজে। বাড়ি ভাড়া বাকি পড়ে গেল বলে বাড়িঅলাও একদিন দরজায় তালা মেরে দেয়। সবমিলিয়ে আমি রাগে-শোকে-ক্ষুধায় যেন উন্মাদ হয়ে উঠি। তারপরও, বোধহয় বাবার কাছ থেকেই এক-আধটু সততা আর নীতিবোধ ঢুকে গিয়েছিল আমার ভেতরে; তাই কোন অন্যায় পথে উপার্জনের দিকে যেতে আমার একটু সময় লাগছিল। কিন্তু সে আর কতদিন। একবার পরপর তিন দিন যখন পেটে প্রায় কিছুই পড়েনি, তখন মাথাটা যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যায় আমার। সেই সন্ধ্যায় একটা নির্জন গলিতে ছুরি দেখিয়ে এক লোকের কাছ থেকে মানিব্যাগটা ছিনিয়ে নেই। কাজটা সহজেই সমাধা হয়ে যায়। লোকটা কোন প্রতিবাদ করেনি, বরঞ্চ ভয়ে কাঁপছিল থরথরিয়ে। এইটুকুন একটা ছোরার এত শক্তি! আমি মোহিত হই। আমি বুঝে যাই–জগতের রীতিই এই, জোর যার–মুলুক তার।

তবে মানুষ একা একা বাঁচতে পারে না। ছিনতাইকারীকেও থাকতে হয় কোন না কোন দলে। আমিও দ্রুত তেমনই এক দলের সাথে ভিড়ে যাই এবং খুব অল্প সময়েই ওস্তাদের খুব কাছের লোক হয়ে উঠি। আমার সাহসের খুব তারিফ করতেন ওস্তাদ। বলতেন, 'আসলে তোর বাপ-মা-ভাই-বোন কেউ নাই বইলা তোর কোন পিছুটান নাই। আর যাগো পিছুটান নাই, তাগো সাহস থাকে বেশি।'

এমনই এক দিনে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। একাই। আমার সাথে যে ছেলেটা থাকে ওর জ্বর বলে একাই কাজে নেমেছি আমি। সন্ধ্যা। পার্কের কাছটায় এমনিতেই অন্ধকার। আর এদিকে প্রেমিক প্রেমিকাদের আনাগোনা বেশি। এই জুটিগুলো খুব সহজ শিকার হয়। আমি একটা সিগারেটে টান দিতে দিতে অপেক্ষা করছিলাম শিকারের।

হঠাৎ করেই চোখে পড়ে একটা মেয়ে আসছে। আমি যেন ভূত দেখবার

মত চমকে উঠি। এমন অপ্সরার মতও হয় মানুষ? লম্বা-ফর্সা-গায়ে পেঁচানো দামি শাড়ি–এমনকী গলায় একটা চেন। আমার জহুরির চোখ বলে দেয়–সোনার। কিন্তু আমাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত করে ডাকে মেয়েটার কালো-চশমাটা। যেন মেয়েটার পান পাতার মত মুখের কথা মাথায় রেখেই তৈরি হয়েছে চশমার ফ্রেমটা। নাকের ওপর কী সুন্দর করেই না চেপে বসে আছে কালো চশমাটা! আমি মোহাবিষ্ট হয়ে যাই যেন। অমন কম আলোতেও আমি মেয়েটার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই। কী টান টান উদ্ধত শরীর! কী আত্মপ্রত্যয়ী দাঁড়ানো! বয়স কত হবে মেয়েটার? পঁচিশের ধারে কাছেই হবে বোধহয়। ফলে তরুণীর লাবণ্য যেমন এখনও ঘিরে আছে মেয়েটাকে, কিন্তু পূর্ণ এক নারীর ব্যক্তিত্বও বাসা বেঁধে আছে যেন।

কিন্তু কেন কে জানে আমি মেয়েটার নিখুঁত বুক এবং আনুষঙ্গিক অনেক মোক্ষম জিনিস বাদ দিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি মেয়েটার কালো-চশমাটার দিকে। সিনেমার নায়িকারাও যেখানে কালো-চশমা পরে নিজের চেহারার খুঁত ঢাকতে পারে না। সেখানে এই কালো-চশমাটা যেন মেয়েটার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে শতগুণ।

কিন্তু এই সন্ধ্যায় একাকী মেয়েটা এখানে কেন?

সন্ধ্যার সময়ও কেন কালো-চশমা ওর চোখে?

তবে কি দেহপসারিণী?

নাহ্, দেখে তো তেমন মনে হচ্ছে না।

এসব ভাবতে ভাবতে ছিনতাই-এর কথা যেন বেমালুম ভুলে যাই আমি। নিজের অজান্তেই কী এক অমোঘ আকর্ষণে মেয়েটার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। সিগারেট টানতে থাকি জোরে জোরে।

হঠাৎ করেই মেয়েটা বলে ওঠে, 'আপনি তো আজব লোক! সিগারেটের আগুন নিভে গেছে অথচ টেনেই যাচ্ছেন!'

মেয়েটার কথায় লজ্জিত হই আমি–তাই তো, মনের ভুলে নেভানো সিগারেটই টানছি আমি! কী কাণ্ড! আমার তো এমন হয় না! কিন্তু যতটা না লজ্জিত হই, তার চে' বেশি শিউরে উঠি মেয়েটার কণ্ঠস্বর শুনে–কী তীক্ষ্ণ, কিন্তু কী মায়াবী! আর কী সাহস, এমন সন্ধ্যায় এমন করে কথা বলছে এক অপরিচিত পুরুষের সাথে।

সবমিলিয়ে, আমার মত 'সাহসী' এবং 'মেয়েদের কাছ থেকে শত

হৃস্ত দূরে থাকা' আমিও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। আবার, কেমন যেন একটা ভাল লাগাও জড়িয়ে পড়তে থাকে আমার মধ্যে। কোনমতে বলি, 'তাই তো, খেয়ালই করিনি যে কখন নিভে গেছে সিগারেটটা। আজ খুব বাতাস তো।'

'হ্যাঁ, খুব বাতাস,' ঘন চুলগুলো কপালের সামনে থেকে সরাতে সরাতে বলে মেয়েটা। কী সুন্দর কপাল! কী সুন্দর কালো-চশমা। না জানি কী সুন্দর চোখ জোড়া।

'এখানে একা একা দাঁড়িয়ে আছেন যে? জায়গাটা তো ভাল না।'

হাসে মেয়েটা। বলে, 'কী হবে? ছিনতাই? আমি অত ভয় পাই না আপনার মত।'

কী সুন্দর করেই না কথা বলছে মেয়েটা!

'আপনার বুঝি খুব সাহস?'

'কেন?'

'নাহ্, এই যে এমন করে একটা অপরিচিত ছেলের সাথে কথা বলছেন।'

আবার হাসে মেয়েটা, 'কেন? কথা বলা কি বারণ?'

'না, তা না,' কী বলব ভেবে পাই না আমি।

এমন কেন লাগছে আমার! এত ভাল!

একটু ধাতস্থ হয়ে বলি, 'সে যাই হোক—এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। সাহস থাকা ভাল, কিন্তু যেচে-পড়ে বিপদ টেনে আনা বুদ্ধিমানের কাজ না।'

'বাহ্! আপনি তো দিব্যি মানুষ! চেনা নেই-জানা নেই—অথচ আমাকে নিয়ে এত ভাবছেন?' কী সুন্দর করেই না হাসে মেয়েটা।

আমি অস্বস্তিতে পড়ি। তাই তো, কোথায় মেয়েটার সোনার চেইনটা হাতাব তা না, রাজ্যের হ্যাংলামি যেন এসে ভর করছে আমার মধ্যে। কিন্তু আমি যেন বেসামাল। বলি, 'মানুষই মানুষকে নিয়ে ভাবে।'

'বাব্বাহ! দার্শনিকের মত কথা!' খিলখিলিয়ে হেসে বলে মেয়েটা, 'ঠিক আছে, একটা রিকশা করে দিন—আমি খিলগাঁও যাব।'

আমি কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠি।

চলে যাবে মেয়েটা?

তাড়াতাড়ি মিথ্যা করে বলি, 'আমিও ওদিকে যাব। চলুন নামিয়ে দিয়ে

আসি। অবশ্য আমার সাথে যেতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে।'

একটুক্ষণ কী যেন ভাবে মেয়েটা। তারপর কী মায়াবী ভঙ্গিতে একটু হাসে। বলে, 'ঠিক আছে, চলুন।'

আমি যেন হাতে চাঁদ পাই।

এত সৌভাগ্যও হয় মানুষের?

এমন করে কোনো মেয়ে বিশ্বাস করে কোনো ছেলেকে?

আজ যে কার মুখ দেখে উঠেছি ঘুম থেকে!

রিকশা ঠিক করি। উঠি দু'জনে। প্রথমে মেয়েটা। তারপর আমি। সংযত হয়েই বসি আমি। তাও, গায়ের সাথে গা একটু ছোঁয়াছুঁয়ি হয়েই যায়। ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠি আমি।

হঠাৎ করেই শুরু হয় টিপটিপিয়ে বৃষ্টি।

নিজের সৌভাগ্য যেন বিশ্বাসই হতে চায় না আমার। তাড়াতাড়ি রিকশার হুড উঠিয়ে দেই। এবার আমরা আরও সংলগ্ন হই। মেয়েটার শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে বুকের একটা পাশ আমার হাতে এসে লাগে বারবার। কিন্তু অস্থির হলেও, অভদ্র হই না আমি।

অস্থিরতা কাটাতে কথার কথা হিসেবে জিজ্ঞেস করি, 'এমন অন্ধকারেও কালো-চশমা চোখে দিয়ে আছেন যে?'

'আছে, একটা ব্যাপার আছে।'

'কী, চোখ উঠেছে আপনার?'

'নাহ্।'

'তবে?'

একটু থেমে অনেক গভীর থেকে বলে মেয়েটা, 'দেখবেন?'

'দেখব।' যন্ত্রের মত বলি আমি।

মেয়েটা তার সরু সরু আঙুল দিয়ে কালো-চশমাটা খোলে। তাকায় আমার দিকে।

কী জ্বলজ্বলে চোখ!

জ্বলছে!

আগুনের মত জ্বলছে!

আতঙ্কে হিম হয়ে যাই আমি!

মানুষের চোখ না ও দু'টো!

তারপর?

তারপর বিদ্যুৎ গতিতে মেয়েটা কামড়ে ধরে আমার ঘাড়। বাধা দেবার কোন চেষ্টাই করা হয় না আমার। ওর সূঁচালো দাঁত প্রবেশ করে জামার ভেতরে! কী যন্ত্রণা! কী আনন্দ!

মোহাচ্ছন্নের মত এক সময় আমি আসি মেয়েটার বাসায়। ধীরে ধীরে ধাতস্থ হই। জানতে পারি, ভ্যাম্পায়ারে পরিণত হচ্ছি আমি। হ্যাঁ, রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার। জানতে পারি, মেয়ে ভ্যাম্পায়ারটা আমাকে যেভাবে আকর্ষণ করেছিল সেভাবে এত সহজেই আকর্ষিত করতে পারে না। কেউ কেউ আকর্ষিত হয়। যেমন হয়েছি আমি। কালো-চশমা পরে থাকতে হয় যেন ওদের জ্বলজ্বলে চোখ দেখে না ফেলে কেউ। কালো-চশমার আড়ালে ঢাকা থাকে ভ্যাম্পায়ারের চোখ।

আমিও পরিণত হচ্ছি ভ্যাম্পায়ারে। রক্তের ভেতর কী অমোঘ এক টান, যন্ত্রণা। আনন্দও। কিন্তু এখনও আমি যে মানুষ; এখনও যে আমার মনটা একজন মানুষের। তাই, আপনাদের সাবধান করছি—যারা কালো-চশমা চোখে দেয় তাদের বিশ্বাস করবেন না ভুলেও, দোহাই আপনাদের।

আর সময় বাকি নেই আমার!
তারপর, আমিও চোখে দেব কালো-চশমা!
জ্বলজ্বলে চোখ জোড়া লুকিয়ে অপেক্ষায় থাকব।
আহ্ রক্তের স্বাদ কী বিচিত্র!
আপনাদের রক্ত!
আপনার রক্ত!
আহ্!

আসমার ওসমান

খাটের নীচে কী থাকে?

বিস্তর মাল-সামান থাকে লোকের খাটের নীচে।

আমার খাটের নীচে কী কী আছে?

একটা ফুটবল, ক্লাস সেভেনের পুরনো বই, একটা নষ্ট টেপ রেকর্ডার, জুতোর বাক্স ভরা একগাদা ভিউকার্ড, একজোড়া কেড্‌স। আরও আছে মোট বাইশখানা তিন গোয়েন্দার বই–মা দেখলে রাগ করেন বলে ওখানে লুকিয়ে রেখেছি আমি। একটা বড় সুটকেস–ওটা নাকি বাবা-মা'র বিয়ের সুটকেস। মা'দের ঘরে জায়গায় কুলাচ্ছিল না বলে আমার ঘরে খাটের নীচে জায়গা হয়েছে ওটার। এতকিছুর পরও বেশ অনেকখানি জায়গা খালি আছে খাটটার নীচে। একদম ছোটবেলায় বাবা কিংবা মা'র পিটুনির ভয়ে ওখানে গিয়ে লুকাতাম আমি। এ ছাড়াও যখন বাবা-মা খুব ঝগড়া করত, খুব ভয় লাগত আমার; তখন ওখানে গিয়ে লুকাতাম। কেন জানি খাটের নীচে অন্ধকার-অন্ধকার জায়গাটাকে তখন খুব নিরাপদ মনে হত আমার। মনে হত ওখানে কোন বিপদ হবে না আমার। এমনও হয়েছে যে কোন কোন রাতে বাবা-মা যখন তুমুল চিৎকার আর বাজে বাজে গালিগালাজ করে ঝগড়াঝাঁটি করছে তখন ভয়ে আর খাটের নীচ থেকে বের-ই হইনি আমি–ওখানেই একসময় ঘুমিয়ে পড়েছি।

সেই থেকে খাটের নীচটা বরাবরই আমার দুঃসময়ের বন্ধু, খুব প্রিয় জায়গা।

কিন্তু এখন তো আমি আর ছোট্টটি নেই, ক্লাস এইটে পড়ি একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। তাই খাটের নীচে গিয়ে লুকোবার মত ভয় এখন আর পাই না আমি। তবে কিছুদিন আগে 'বুগিম্যান' নামে একটা সিনেমা দেখেছিলাম কম্পিউটারে ডিভিডি চালিয়ে; সেটা দেখে খুব ভয় লেগেছিল ক'দিন রাতের বেলায়। সিনেমাটায় দেখিয়েছিল একটা মেয়ে একা একা একটা বাড়িতে থাকত আর তার খাটের নীচে বাস করত এক অশরীরী। সেটা একদিন হঠাৎ

করে বের হয়ে আসে, আর ঘরটায় নানারকম বীভৎস কাণ্ড। ওই সিনেমাটা দেখে খুব ভয় পেয়েছিলাম আমি। রাতের বেলা টয়লেট চাপলে খুব ভয় হত খাট থেকে নামতে–মনে হত নামা মাত্রই খাটের নীচ থেকে কোন অপার্থিব শক্তি টেনে ধরবে আমার পা। ক'দিন তো ভয়ে টয়লেট চেপে রেখেই রাত পার করেছি। তারপর যেমন হয়, সময়ের সাথে সাথে কমে যায় ভয়।

স্কুল থেকে ফিরে প্রাইভেট স্যারের কাছে পড়া শেষ করে যখন ফাঁকা বাড়িতে চুপচাপ থাকি আমি, তখন মাঝে মধ্যেই সেই ছোট্টবেলার মত খাটের নীচটায় ঢুকে শুয়ে থাকি। খুব ভাল লাগে আমার। নিজেকে খুব নিরাপদ মনে হয়।

আমাদের বাড়ি সারাটাদিন খুব ফাঁকা থাকে। বাবা-মা দু'জনেই চাকরি করেন। অফিস শেষে প্রায়ই আবার পার্টি, কিংবা ক্লাবের মিটিং। ফিরতে ফিরতে সেই মধ্যরাত। শুধুমাত্র সকালবেলাটাতেই যা একটু কথা হয় বাবা-মা'র সাথে। বাকি দিনটা ড্রাইভার আর বুয়া ছাড়া বাড়িতে থাকে না কেউ। ছুটির দিনে মাকে একটু কাছে পেলেও বাবা ওই দিন খুব বেলা করে ঘুম থেকে ওঠে বলে আমার সাথে তেমন দেখাই হয় না। কারণ শুক্রবারে আমি আবার মিউজিক স্কুলে গিটার শিখতে যাই। ছুটির সন্ধ্যাগুলোয় বাবার সাথে দেখা করা মানা–কারণ তখন তিনি তাঁর রুমে বন্ধুদের সাথে নিয়ে মদ খান। এই সময়টা আমি খুব ভয়ে ভয়ে থাকি। মদ খেলে বাবার মাথা ঠিক থাকে না। অকারণে খুব রেগে যান, খুব গালিগালাজ করেন।

আমার খুব ভাল মনে আছে যখন আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন একবার বাবা যখন মাতাল অবস্থায়, আমি তাঁর কাছে নতুন এক বাক্স রঙ পেন্সিলের আব্দার করেছিলাম। তার ফল হয়েছিল ভয়াবহ। আমার ওই আব্দার শুনে বাবা যেন রেগে উন্মাদ হয়ে উঠলেন। সোফা থেকে উঠে প্রচণ্ড এক চড় কষালেন আমার চুল মুঠি করে ধরে। চড় খেয়ে আমার গাল যখন ব্যথায় দপ্‌দপ্‌ করছে এবং নিজের অজান্তেই চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে তখন বাবা তাঁর চামড়ার বেল্ট নামিয়ে এনে বেধড়ক পেটাতে আরম্ভ করলেন আমাকে। ব্যথায়-আতঙ্কে আর্তচিৎকার করতে লাগলাম আমি। পাশের ঘর থেকে মা ছুটে এসে আমাকে বাঁচাতে চাইলেন বাবার হাত থেকে। তাতে করে

বাবার যেন রোখ চেপে গেল আরও বেশি—মা আর আমাকে দু'জনকেই পেটাতে লাগলেন এলোপাথাড়ি। আমি কোনও মতে ওখান থেকে ছুটে পালিয়ে এলাম আমার রুমে। বাবাও দৌড়ে এলেন আমার পিছে পিছে। কিন্তু ততক্ষণে আমি খাটের নীচে ঢুকে গেছি। বাবা এতটাই মাতাল ছিলেন যে আমি খাটের নীচে গিয়ে লুকাতে পারি সেটা তাঁর মাথাতেই আসেনি। তাই আমাকে খুঁজে না পেয়ে ফোঁস ফোঁস করতে করতে বেরিয়ে গেলেন রুম থেকে।

আমাকে বাঁচিয়ে দিল আমার সেই প্রিয় জায়গাটা—অন্ধকার খাটের নীচ।

সবমিলিয়ে, খাটের নীচের জায়গাটা আমার খুব ভাল লাগে—ঠাণ্ডা, আধো-অন্ধকার, নীরব। শুধু আমার থাকবার খাট নয়, যখন যে খাটই পাই আমি সেটাই আমার জন্য হয়ে ওঠে ভারি কৌতূহলের এক বিষয়। আমাদের বাড়িতে মোট পাঁচটি খাট। বাবা-মা'র একটা বড় খাট। কিন্তু প্রায় রাতেই মা অন্য রুমে ঘুমাতে যান বলে সেখানে তাঁর জন্য আলাদা একটা খাট। আমার একটা খাট। গেস্টরুমে মেহমানদের জন্য একটা খাট। আর বুয়ার একটা খাট। সুযোগ পেলেই লুকিয়ে লুকিয়ে ওই খাটগুলোর তলায় উঁকি-ঝুঁকি মারি আমি। বাবা-মা'র ঘরটায় খাটের নীচে আছে বাবার বিদেশী মদের গোটা দশেক খালি বোতল, আর কয়েকটা কনডমের প্যাকেট। কনডম জিনিসটা যদিও আমাদের মত ছোটদের জন্য নিষিদ্ধ বস্তু কিন্তু আমার বন্ধু সজীব আমাকে ওটা চিনিয়েছে। সজীব খুব ডেয়ারিং ছেলে—ও ভীষণ বাজে বাজে কথা বলে; আমার শুনতে খুব লজ্জা করে, কিন্তু মজাও লাগে। মা'র খাটের নীচটা একদম ফাঁকা; মা'র একটু শুচিবায়ু মত আছে, তাই তাঁর খাটের নীচটা একদম ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে থাকে। গেস্টরুমের খাটের তলায় রাজ্যের পুরনো জিনিস ডাঁই করে রাখা—পুরনো জুতা, পুরনো হাঁড়ি, পুরনো খবরের কাগজ এমন কত্ত কী। বুয়া যখন গোসল করে দুপুর বেলায় তখন আমি লুকিয়ে লুকিয়ে বুয়ার খাটের নীচেও হানা দিয়েছি। বুয়ার একটা তালা মারা টিনের ট্রাংক আছে ওখানে। আছে স্পঞ্জের দুজোড়া স্যাণ্ডেল, একটা পুরনো হামানদিস্তা। একটা চাদরের মধ্যে পুটুলি বেঁধে রাখা আছে বুয়ার শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট। এককোণে রাখা মায়ের ফেলে দেয়া ক'টা ব্রা।

মাঝে মধ্যেই খাটের নীচগুলোয় হানা দেই আমি। প্রায়ই চোখে পড়ে

নতুন কিছু। আমার কেন যেন ভীষণ ভাল লাগে। খাটের নীচটা ভীষণ অন্যরকম, কী তার অমোঘ আকর্ষণ!

আমার বন্ধু সজীবের খাটের নীচে থাকে নানান নিষিদ্ধ সব বস্তু। ওর বাবা-মা'র ডিভোর্স হয়ে গেছে। সজীব থাকে ওর মা'র সাথে। ওর মা আর বিয়ে করেননি–সারাদিন ব্যস্ত থাকেন অফিস নিয়েই। একটা মোবাইল ফোন কোম্পানির অনেক বড় অফিসার নাকি সজীবের মা। সজীব-ও তাই আমারই মতন একা একা দিন কাটায় স্কুলের সময়টুকু ছাড়া। আমাদের পাড়াতেই ওদের বাসা। কোনও বিকেলে ও আমার বাড়িতে আসে, কোনও বিকেলে আমিই যাই ওর বাড়িতে। ওর বাড়িতে যাওয়ার প্রধান আকর্ষণ ওই খাটের নীচের নিষিদ্ধ বস্তুগুলো। একগাদা বড়দের বই আছে ওর কাছে–লুকানো থাকে খাটের নীচে। বইগুলোয় কী সব বাজে বাজে গল্প আর ছবি! প্রথম প্রথম ছবিগুলা দেখতে কেমন ভয় আর ঘেন্না লাগত আমার, ইদানীং ভালই লাগে। খাটের নীচে ও লুকিয়ে রেখেছে একগুচ্ছ সিডি আর ডিভিডি। তাতে সব বাজে বাজে সিনেমা। দেশী মেয়েদের সিনেমা, বিদেশী মেয়েদের সিনেমা। ওর থেকে বয়সে প্রায় পাঁচ বছরের বড় এক মামাতো ভাই রায়হান ওকে এগুলো দেয়। এর চেয়েও ভয়াবহ কিছু ছবি আছে ওর কাছে। যেমন আমাদের টিচার শিউলি মিস্-এর ভিডিও ছবি। রায়হান নাকি মোবাইলে গোপনে টিচারদের বাথরুমের ফুটো দিয়ে ভিডিও করে সিডি-তে রাইট করে ওকে দিয়েছে। সেই সিডি-ও রাখা আছে ওর খাটের নীচে। প্রথম প্রথম এসব দেখতে খুব অপরাধবোধ হত, কিন্তু এখন ভাল লাগে ভীষণ। সজীবের খাটের নীচটা আমার এখন খুব প্রিয়, খুব আকর্ষণীয় জায়গা।

আজ দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে আমি একদম একা। বুয়া গেছে গ্রামের বাড়িতে। বাবা-মা অফিসে। বাড়িতে আমি ছাড়া কেউ নেই। কম্পিউটারে গেম খেললাম খানিকক্ষণ, একটুক্ষণ গান শুনলাম। আজ প্রাইভেট টিচারেরও আসবার দিন নয়–তাই একা একা লম্বা সময় কাটানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম আমি। খালি বাড়িটায় ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছলাম মায়ের ঘরে। মা-এর শুচিবায়ু মত আছে বলে তাঁর রুমটা সবসময়ই খুব পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন করে রাখেন। আসলেই ভাল লাগে–কেমন শান্তি শান্তি বোধ হয়। এই রুমটায় মা একা থাকেন। মা-বাবার সম্পর্ক এখন দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে–তাঁরা

এখন এক রুমে আর থাকেনই না। সকালবেলাটায় শুধু রোবটের মত এক টেবিলে বসে নাস্তা করেন। আমি বুঝি সজীবের বাবা-মার মত আমার বাবা-মাও ডিভোর্সের দিকে এগোচ্ছেন।

এসব ভাবতে ভাবতে আমি মায়ের রুমটার মেঝেতে শুয়ে পড়ি আনমনে। কী আরাম আরাম ঠাণ্ডা। চোখ যায় মায়ের খাটের তলায়। মা এখন একা শুলেও খাটটা অনেক বড়—কিং সাইজ। খাটের নীচটা একদম পরিষ্কার, কিচ্ছু নেই ওখানে। কেন যেন ছোটবেলার মত করে ওখানে গিয়ে ঢুকি আমি। শুয়ে থাকি চুপচাপ। খাটটা অনেক বড়, বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই যে নীচে কেউ একজন শুয়ে আছে।

হঠাৎ করেই মায়ের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম আমি। মা-এর কাছে চাবি থাকে—তিনি ভেতরে ঢুকতেই পারেন, কিন্তু এমন সময় তো মা'র অফিসে থাকার কথা? আরে, মায়ের সাথে একটা পুরুষ কণ্ঠও তো শোনা যাচ্ছে। আমি পুরুষ কণ্ঠটা চিনতে পারি—মা'র বন্ধু রাজীব আঙ্কেল। খাটের নীচ থেকে এখন কেমন করে বের হই আমি? ততক্ষণে মা আর রাজীব আঙ্কেল রুমে ঢুকে গেছেন, ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

আমি ততক্ষণে বুঝে গেছি ঘটনাটা কী ঘটতে চলেছে।

আমার খুব খারাপ লাগতে থাকে।

আমার খুব রাগ হতে থাকে।

কেন এমন করে মানুষ?

আমি খাটের নীচে চুপচাপ শুয়ে আমার মা আর তাঁর গোপন প্রেমিকের কথা আর হাসি শুনি স্থবিরের মত। এখন কী করব আমি? বেরিয়ে আসব খাটের নীচ থেকে? নাকি শুয়ে থাকব এমন করেই? আমি দেখতে পাচ্ছি মেঝেতে দাঁড়িয়ে কাপড় খুলছেন মা আর রাজীব আঙ্কেল। আমি খাটের নীচ থেকে শুধু তাঁদের পায়ের গোছা দেখতে পাই।

আমার ভীষণ কান্না পেতে থাকে।

আমার খুব কষ্ট হতে থাকে।

তারপর, আমার ঠিক মাথার ওপর, খাটের ওপরে তাঁরা দু'জন মেতে ওঠেন।

ওদের দেহ সঞ্চালনে খাট কেঁপে ওঠে।

শীৎকারে শীৎকারে ভরে ওঠে পুরো ঘরটা।

আমার খুব ঘেন্না হতে থাকে।

খুব রাগ হতে থাকে।

মাথায় যেন খুন চেপে যায় আমার।

ওই কুত্তার বাচ্চা রাজীবকে ছাড়ব না আমি, জানে মেরে ফেলব আমি এই হারামিটাকে।

কী যেন হয়ে যায় আমার। ভীষণ রকম ক্রোধ আর উন্মাদনা ঘিরে ধরে আমাকে। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে সংগমরত দুই জনকে ভয়াবহ রকম চমকে দিয়ে আমি যেন ছিটকে বেরিয়ে আসি খাটের নীচ থেকে। কোনও মতে দৌড়ে গিয়ে ছিটকিনিটা খুলে দৌড়ে গিয়ে রান্নাঘর থেকে ধারাল বটিটা নিয়ে ফিরে আসি আবার। মা ততক্ষণে কোনমতে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নিয়েছেন।

আমি উন্মাদের মত কোপাতে আরম্ভ করি রাজীব আঙ্কেল-কে। মা তখন এক কোণে আতঙ্কে কাঁপছেন থরথরিয়ে।

আমি সর্বশক্তি দিয়ে কোপাতে থাকি।

কোপাতে থাকি।

কোপাতেই থাকি।

রক্ত ছিটকে ছিটকে এসে গায়ে লাগে আমার।

রাজীব আঙ্কেল একটা মাত্র চিৎকার দিতে পেরেছিলেন।

কোন মা-ই চান না তার সন্তান জেলে পচে মরুক। আর বিষয়টার সাথে যখন তাঁর সামাজিক সম্মানও জড়িত থাকে তখন তো তিনি আমার পক্ষেই থাকবেন। তাই না? মা ধাতস্থ হয়ে ওঠেন দ্রুত, আমার কাছে ক্ষমা চান এবং আমাকে সাথে নিয়ে পরিকল্পনা আঁটেন কী করে লাশটা গুম করা হবে এবং আমি আর মা ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ কখনওই জানবে না এই ঘটনা।

কোরবানির মাংস কাটার ছুরি দিয়ে দুজনে মিলে লাশটাকে পিস্ পিস্ করি আমরা। তারপর আমার খাটের নীচ থেকে বাবা-মা'র বিয়ের সুটকেসটা বের করে তাতে ভরে ফেলি লাশের টুকরোগুলো। এরপর সবকিছু ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করি। পরিকল্পনা হয় রাতের বেলা গাড়িতে করে আশুলিয়ার কাছে

গিয়ে নদীতে ফেলে দেব ওটা আমরা। গাড়ি ড্রাইভ করবে মা।

সুটকেসে ভরা লাশটাকে আমরা রাখি মা'র খাটের নীচে।
রাত পর্যন্ত ওখানেই থাকবে ওটা।
খাটের নীচটা কী ভীষণ ঠাণ্ডা আর অন্ধকার।

আসমার ওসমান

খাদক

এক

ঈদে বাড়ি এলে মজাই হয়। তবে সত্যি বলতে সেই মজার কতটুকু নিজের তা মাপতে মনে হয় নতুন কোনও যন্ত্র আবিষ্কার করতে হবে। এত ঝক্কি পাড়ি দিয়ে গ্রামে আসা। তিনদিন থাকা আবার শহরের যান্ত্রিকতার মাঝে ফিরে যাওয়া। এই আমার ঈদ। বাচ্চাদের ঈদের আনন্দ অন্যরকম। কেবল ওদের উদ্যমে মনে হয় কখনও ঘাটতি পড়ে না। কিন্তু আমার আনন্দ শপিং করবার সময় ব্যাগ বহন এবং বাড়ি আসবার সময় গাঁটরি-বোঁচকার নীচে সবসময়ই চাপা পড়ে যায়। যা-হোক, বাড়িতে এসেছি এটাই আসল কথা।

ডাইরিটা এবার আর ফেলে আসিনি। যদিও ব্যাপারটা রুনুর পছন্দ নয়। কিন্তু কী করব, সবাই তো সামান্য একটু হলেও সময় ও অবসর নিজের জন্য রাখতে চায়। এটাই আমার অবসর। রুনু গেছে মা'র সাথে আমার চাচার বাড়িতে। বাচ্চারা অবশ্য যেতে চাইছিল না। কিন্তু রুনুর রক্তচক্ষুর সামনে ওদের খেলতে যাওয়ার ইচ্ছা ঝরে পড়া বেগুন গাছের মত নুইয়ে গেছে।

বেচারারা!

ওদের আর কী দোষ। ওরা তো আর বছর ভরে ধুলো-মাটি নিয়ে খেলার সুযোগ পায় না। ঈদেই শুধু গ্রামে আসার সুযোগ।

কিন্তু সবার সাথে ওদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, কাজেই ওদের মা ওদেরকে ধরে নিয়ে গেছে।

কী আর করা!

আর আমি বেচারা এ বিষয়ে কোনও কথা বলি না।

সকালে আমরা এসেছি। এখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ওই যে, অলি মিয়া এসেছে। তার সাথে বসে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করি গিয়ে।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি, গ্রামের এই লোকগুলো সবসময়ই আশপাশের দশ গ্রামের সমস্ত খবর রাখে। এমন না যে এতে তাদের বিশেষ

কোনও ফায়দা আছে। কিন্তু গল্পগুজবের খাতিরেই হোক বা গ্রাম্য রাজনীতির কারণেই হোক, এরা সব খবর রাখে।

আরেকটা ব্যাপারও হতে পারে, আসলে পরচর্চা ও প্রতিবেশীকে নিয়ে রসাল রগরগে গল্প ছাড়া কোনও আড্ডার আসর জমে না। চাই সেটা তথাকথিত, অতিসভ্য ইউরোপ-আমেরিকানদের আড্ডাই হোক বা হোক আমাদের তৃতীয় বিশ্বের নাম না জানা একটা গ্রামের কোনও রজব আলী ও কলীমুল্লাহদের আড্ডার আসর। আড্ডা মানেই পরচর্চা অবধারিত।

দুই

গ্রামের মানুষগুলো মাঝে মাঝে এমন সব গল্প বলে যে বিশ্বাস করা তো দূর, ভাবতেই ইচ্ছে করে না। কিন্তু কখনও আবার না ভেবেও পারা যায় না। অলি মিয়ার কথা বলছি। ও গতকাল ভারী অদ্ভুত গল্প শুনিয়ে গেছে। বলেছে, তার ভাষায়, আমাদের গ্রামে নাকি 'আত্মাখোর' এসেছে।

জানতে চাইলাম আত্মাখোর কী জিনিস। বলল, আত্মাখোর জিনিস না। একটা লোক। কোত্থেকে এসেছে কেউ জানে না। আমাদের গ্রামের শেষে কবরস্থানে সে আপাতত থাকছে।

জানতে চাইলাম, লোকটার নাম আত্মাখোর হলো কী ভাবে? সে কি নিজের এই নামই বলেছে নাকি?

অলি মিয়া জানাল, লোকটা নাকি কোনও কথাই বলে না। চুপচাপ বসে থাকে আর কেউ কিছু বললে মাথা নেড়ে হাসে।

অলি মিয়ার ভাষায়, 'আজব কারবারখান হইল, ভাইজান, মানুষটা গোসল করার ধারও ধারে না, কিন্তু গা থেইকা কেমুন খোশবু পাওন যায়।'

গোসল না করলে খোশবু কেন, ওর গায়ের গন্ধে তো ভূত পালানোর কথা। তবে মানুষের একটা সাইকোলজি এখানে কাজ করতে পারে বলে আমার মনে হয়। সেটা হচ্ছে, কোনও কিছু বুঝতে না পারলে তখন আমাদের মগজ সে ফাঁকাটা পূরণ করার জন্য নিজেই উদ্যোগ নেয়। আর আমাদের সমাজের পীর ফকিরদের বুজরুকীর কথা না-ই বা বললাম। হয়তো সবাই

এই লোকটাকেও তেমন কেউ বলেই ধরে নিয়েছে। ফলে তার গায়ের 'বদবু' আমাদের অলি মিয়ার ভাষায় 'খোশবু' হতে সময় লাগে না। তবে এ স্রেফ আমার ধারণা। মনে হয় লোকটার সাথে দেখা হলে খারাপ হবে না।

অলি মিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ওর নাম আত্মাখোর হলো কী করে?'

'ভাইজান, লোকটা পুরান গোর খুইরা মাটি খায়। পচা মাটি। কন দেখি, কিমুন পিশাচী কারবার।'

'এহ্, কী যা-তা বলছ? মাটি আবার খায় কী ভাবে, তাও আবার গোর খোঁড়া মাটি?'

'সেজন্যই তো, ভাইজান, সবাই ওরে আত্মাখোর কয়। মাটিতে আর কী আছে কন্? মাটি হইল গিয়া মাটি। এইটার মধ্যে তো আর কিছুই নাই। তাইলে মাটি সে কেন্ খাইব? বদমাইশটা নিজে কোনও কথা কয় না, কিছু জিগাইলে উত্তরও দেয় না। খালি হাসে। মাটিতে একটা মানুষরে গোর দিছি, ওইখানে তার আত্মা ছাড়া আর কী আছে? তাইলে মাটি থেইকা সে আত্মা ছাড়া আর কী খাইব? এই কারণেই সবাই হের নাম দিছে আত্মাখোর। আমগো কলীম মিয়া চাইছিল হেরে খেদাইতে। কিন্তু তার আগের রাইতে হে স্বপ্নে দেখছে ওই বদমাইশটার দিকে চোখ তুইলা চাইলেও হের বংশ নির্বংশ হয়া যাইব। এমুন স্বপ্নের তো একটা অর্থ আছে, নাকি কন, ভাইজান? সেই থেইকা হেরে আর কেউ ঘাঁটায় না। হে হের মতন থাকে। আমরা থাকি আমগো মতন।'

'অলি মিয়া, সত্যি করে বলো তো, তোমরা কেউ লোকটাকে মাটি খেতে দেখেছ, বা কবর খুঁড়তে দেখেছ?'

'হ, ভাইজান। আমাগো সেলিমের বাড়ি কবরস্থানের ধারে। হে দেখছে। রাইতে ছোট কাম করতে হে ঘর থনে বাইর হইছিল। দেহে, ওই বদমাইশটা পাগলের মতন কব্বর খুঁড়তেছে। এমুন কারবার দেইখা সেলিম জরুরত বাদ দিয়া খাড়ায় পড়ে। কতক্ষণ পর দেহে ব্যাডায় কব্বরের গর্ত থনে পিচাশের মত খাবলায়া খাবলায়া মাটি তুইলা খাইতাছে।'

'আচ্ছা! এর পর লোকটা কী করল?'

'সেইটা বলতে পারতাম না, ভাইজান। কারণ এই কারবার দেইখা সেলিম মিয়া বেজায় ডর পায়। সেলিম মিয়া ডরপোক্কা না। কিন্তু এমুন আন্ধার রাইতে চোহের সামনে কাউরে খাবলায়া কব্বরের মাটি খাইতে

দেখলে কারও আর সাহস থাহে, কন দেহি? বেচারা দৌড়ায়া ঘরে চইলা আসে।'

'ওর সাথে আমার দেখা করার ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'ভাইজান, কী যে কন। বদমাইশটা তো কোনও জজ ব্যারিস্টার না যে হের লগে দেহা করতে অনুমতি লওন লাগব। হে কবরস্থানের ধারে বইসা থাকে। ওহানে গেলেই হ্যারে পাওন যাইব। তয় সন্ধ্যা ঘনায়া আইছে। কাইল দিনে দেহা করনটাই ভাল হইব মনে লয়।'

তিন

অলি মিয়ার গল্পে সত্যতা কতটুকু আছে বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় একটুও নেই। কারণ একটা জলজ্যান্ত মানুষ সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু মাটি খাবে, তাও আবার কবরের মাটি–এটা বাস্তবসম্মত হতে পারে না। তবে শুনেছি সিলেটের কিছু লোক মাটি খায়। কিন্তু সেটা তো বিশেষ ধরনের সুগন্ধী মাটি। তা-ও পুড়িয়ে নেয়া হয়। আর এ লোক নাকি কবরের মাটি খায়! সে-তো লক্ষ পদের রোগ জীবাণু দিয়ে ভরা থাকার কথা। তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি, ঠেকায় পড়ে এক দু'দিন হয়তো কারও পেট কোনও ভাবে তা সহ্য করে নিতেও পারে। কিন্তু দিনের পর দিন তা কোনওমতেই সম্ভব নয় বলেই আমার বিশ্বাস। আমার ধারণা অলি মিয়াসহ গ্রামের সবাই তিলকে তাল ভেবে বসে আছে।

ঢাকা শহরে একবার এক গুজব উঠেছিল যে আজিমপুর কবরস্থানে এক লোক নাকি এসেছে। সে সদ্য গোর দেয়া মৃতদেহ চুরি করে তুলে আনে, তারপর সেটার বুক চিরে কলিজা বের করে খায়। কিন্তু আমার জানা মতে সেটা ছিল শুধুই গুজব। (নাকি অন্য কিছু?)

যা-হোক, আগামীকাল আত্মাখোরের দেখা পাব। তখনই সব জানতে পারব আশা করি।

চার

প্রকৃতি রহস্যময় আমরা সবাই জানি। অজস্র রহস্য সে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে। আমার কাছে তো সাধারণ সব জিনিসও অসাধারণ মনে হয়। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম না। তাই আলো যে একই সাথে কণা আবার তরঙ্গ হতে পারে, এই সাধারণ ব্যাপারটাও আমার মাথায় ভাল ঢোকে না। আর আজ যা শুনলাম তাকে কী বলব নিজেও বুঝতে পারছি না।

অলি মিয়ার আত্মাখোরের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। লোকটার কাছে যাওয়া মাত্রই সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত সুন্দর একটা হাসি দেয়। যেন শিশুর সারল্য ছিল তাতে। অলি মিয়া অবশ্য বলছিল, ওর দিকে তাকিয়ে নাকি সে নেকড়ের মতো হিংস্র ভঙ্গিতে হাসছিল।

যা-হোক, আত্মাখোর লোকটা আমার সাথে কথা বলেছে। নিজের আসল নাম অবশ্য বলেনি। সেটা নাকি তার মনেও নেই। সত্যি না মিথ্যা বলতে পারব না। লোকটা বলে, তার বয়স যখন উনিশ বছর, তখন সে জণ্ডিসে আক্রান্ত হয়। তার ভাষায়, 'মাইট্যা জণ্ডিশ'। এই রোগে সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে ও মারা যায়। তার পরিবারের লোকজন যথাযথ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সারার পর তাকে গোর দেয়।

কিন্তু একসময় সে আবার প্রাণ ফিরে পায়। লোকটা নিজেকে আবিষ্কার করে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মাঝে। তখন অনেক দূরে সে এক আলোক বিন্দু দেখতে পায়। তখন তার প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল পানিতে ডুবে যাচ্ছে। ঘোর লাগা ঘুমঘুম ভাবও ছিল। তখন তার কানে কে যেন ফিসফিস করে বলে, 'মাটি খা।' হাত-পা সে নাড়তে পারছিল না, শুধু মুখ নাড়তে পারছিল। পাগলের মত সে তখন মাটি খেতে থাকে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, যে কথা বলেছিল, তাকে সে দেখেছিল কি না। সে বলে যে তাকে দেখেনি। কিন্তু তার গন্ধ পেয়েছিল। শ্যাওলার মত সোঁদা গন্ধ। কবর থেকে উঠে সে যখন নিজের বাড়িতে যায়, কেউ আর তাকে মানুষ বলে গ্রহণ করেনি। সবাই ভেবেছে ভূত। এমন কী তার পরিবারের

লোকজনও। সে থেকেই সে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। পরে একসময় আবিষ্কার করে, সে আর সাধারণ কোনও খাবার খেতে পারছে না। ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মাটি খেতে থাকে। একসময় তাও আর সহ্য হয় না। তারপর এক রাতে সেই কণ্ঠটা আবার তাকে কানে ফিসফিস করে বলে যায়, 'মাটি খা, কবরের মাটি।' সেই শুরু। এর পর সে আর কখনওই অন্য কোনও খাবার খায়নি। সব খাবার থেকেই তার নাকে পচা লাশের গন্ধ আসত। কিন্তু কবরের মাটি থেকে আসত নাম না জানা কোনও খাবারের ঘ্রাণ।

লোকটা একসময় আরও বুঝতে পারে, যার সাথেই সে কথা বলে, সে-ই কোনও না কোনওভাবে ভয়াবহ বিপদে পড়ে যায়।

সেই থেকে তার কথা বলা বন্ধ।

কিন্তু আজ আমাকে দেখে লোকটার মনে হয়েছে, সামনে আমার খুব বড় বিপদ আসছে। জীবন-মৃত্যু নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। তাই আমাকে সাবধান করতেই সে অনেক দিন পর কথা বলেছে।

পাঁচ

আজ এত বছর পর ডাইরিটা পড়ছি, আজও আমার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সেদিন লোকটার কথার এক কণাও আমি বিশ্বাস করিনি। ভেবেছি বুজরুকি। কিন্তু বাড়ি ফিরে আসার পর অলি মিয়া অবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'ভাইজান, বললেন আপনি তার সাথে কথা কইবেন। কিন্তু আপনে তো তার সামনে পাঁচ সেকেণ্ডও বসলেন না। গেলেন, বদমাইশটা আমার দিকে ফিরা খাডাশের মতন একটা হাসি দিল আর আপনে আইসা পড়লেন।'

কী বলব?

ভুল শুনেছিলাম?

আমি লোকটার কথা শুনলাম, কিন্তু অলি মিয়া শুনল না কেন?

আমি কি তা হলে হ্যালুসিনেশনের শিকার হয়েছিলাম?

কিন্তু তাই বা হয় কী করে?

কারণ গ্রাম থেকে ফিরে আসার পথে বাস অ্যাক্সিডেন্ট হয়। হারাই রানা, মানে আমার ছোট ছেলেটাকে। রুনু মরতে মরতে বেঁচে যায়।

আর হ্যাঁ, লোকটাকে সেদিনের পর আর কেউ দেখেনি। কোত্থেকে সে এসেছিল আর কোথায়-ই বা গায়েব হলো, কেউ বলতে পারেনি।

কী বলব একে?

প্রকৃতির রহস্য?

কারও মধ্যে ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা কী করে আসে তা আমার বোধের বাইরে। আর লোকটা যে গল্প শুনিয়েছিল, তা আমি আজও বিশ্বাস করিনি।

জানি না সেটা বিশ্বাস করবার যোগ্য কি না। তবে এটা নিশ্চিত যে লোকটা প্রকৃতি মাতার অজস্র মহা রহস্যের একটা অংশ।

সাইফুল আরেফিন অপু

অশুভ প্রভাব

আমি যখন খুব ছোট, এই সাড়ে চার কি পাঁচ বছরের, ঘটনার শুরু তখনই। একদিন বিকালে মা বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে দেখে আমি সুর ধরলাম, 'মা আমি তোমার সাথে যাব। আমি তোমার সাথে যাব।'

মা আপত্তি করলেন না। মা যেখানেই যান আমি মায়ের আঁচল ধরে সেখানে যাই। ছোট ছেলেকে বোধ হয় মায়েরা একটু বেশিই ভালবাসেন। বাবাদের ভালবাসার পাল্লা বড় মেয়ের দিকেই ভারী থাকে।

রাস্তায় বেরিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি, মা?'

'খুকুমণিদের বাড়িতে।'

'কেন, মা?'

মা আমার দিকে একটু ঝুঁকে মাথা নিচু করে বললেন, 'ওদের বড় রাজহাঁসটার ডিম ফুটে ফুটফুটে বাচ্চা বেরিয়েছে। আমরা তাই দেখতে যাচ্ছি।'

'তোমাকে কে বলেছে? তুমি জানলে কীভাবে?'

'তোর বড়বু বলেছে। স্কুলে রানু নাকি ওকে বলেছিল। নে, রাস্তায় আর বকিস নে তো। খারাপ দেখায়।'

আমরা খ্রিস্টানপাড়ার গির্জাটার কাছে পৌঁছে গেলাম। এখানেই পিযুষ কাকুর, মানে পিযুষ হালদারের বাড়ি। উনি খুকুমণির বাবা। পিযুষ কাকু গির্জার সেবক না কি যেন। অবশ্য বাজারে একটা মনোহরির দোকানও আছে। আব্বার সাথে ওঁর দোকানে গেলে আমাকে সবসময় একটা করে লজেন্স খেতে দেন। কোন পয়সা নেন না। ইস, সব দোকানদারেরা যদি এমন হত!

দরজা খুলে দিল মিতাদি। পিযুষ কাকুর পাঁচটা না ছয়টা, কয়টা যেন মেয়ে। কোন ছেলে নেই। আমাকে দেখেই মিতাদি আদর করে গাল টিপে দিলেন। আমি লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম।

রান্নাঘরের সামনের উঠোনে রাখা আছে বাচ্চাগুলো। কী সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চা! হলুদ এবং সবুজ মেশানো গোল নরম তুলোর বল যেন একেকটা! দেখলেই শুধু হাতে নিয়ে গালের সাথে চেপে ধরতে ইচ্ছে করে। ছোট্ট ছোট্ট রাঙা পা দুটি দিয়ে কুটকুট করে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকিয়ে অবাক বিস্ময়ে আমাদের দেখছে। মা রাজহাঁসটা পাশে দাঁড়িয়ে 'ক্যাং ক্যাং' শব্দ করে ডাকছে।

দুটো বাচ্চা কী মনে করে, বোধ হয় আমাকে ছোট দেখে আমার দিকে এগিয়ে আসে। আমি সাথে সাথে আমার কচি হাত দিয়ে একটাকে ধরে ফেলি। বাচ্চাটা খুব একটা আপত্তি করে না। কী নরম তুলতুলে শরীর!

বারান্দা থেকে আমার চেয়ে একটু বড় খুকুমণি চিল চিৎকার দিয়ে ওঠে, 'ওভাবে ওদের গায়ে হাত দিয়ো না। গায়ের রোয়া পড়ে যাবে। ওরা আর বড় হবে না।'

আমি হাতের বাচ্চাটা সাবধানে মাটিতে রেখে দিয়ে মায়ের আঁচলের তলায় মুখ গোঁজ করে ফিসফিস করে মাকে বলি, 'মা, আমি রাজহাঁসের বাচ্চা নেব। আমাকে নিয়ে দাও।'

মা একটু ইতস্তত করে বলেন, 'দেখি তোর কাকিমাকে বলে। যদি একজোড়া বাচ্চা আমাদের কাছে বিক্রি করেন।'

মা বারান্দার খাটে বসে কাকিমার কাছে আমার কথা বলে বাচ্চা কেনার প্রস্তাব দেন।

মোটাসোটা কাকিমা হাঁসফাঁস করে বলেন, 'না, না। বাচ্চা তো আমরা বিক্রি করব না। কত শখ করে তুলেছি। একটা তুলতেই পাঁচটা ডিম নষ্ট হয়েছে। তা ছাড়া ওগুলোর মালিকও আমি না। আমার মেয়েরা। ওরা বাচ্চা বিক্রি করবে না।'

আমি বাচ্চার জন্য আবদার করছি শুনেই বোধ হয় কাকিমা ঘর থেকে একটা পাকা ছবেদা এনে আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। যেন ছবেদা পেলেই আমি বাচ্চার কথা ভুলে যাব। আমি ছবেদা হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। পাকা ছবেদা আমাকে আকর্ষণ করল না। এ ফলটি আমাদের বাড়িতে আছে। আমার সব মনোযোগ হলদেটে ওই চলন্ত ফুটফুটে বলগুলোর দিকে। ওর থেকে অন্তত দুটো না নিতে পারলে এই মানবজনম বৃথা।

বাচ্চা বিক্রি করবে না শুনে আমার মনের মধ্যে, বুকের মধ্যে এত কষ্ট

হতে থাকে যে মনে হয় বাচ্চা না পাওয়ার কষ্টে বোধ হয় আমি মারাই যাব।

আমার বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে মা আমার কষ্টটা বুঝতে পারেন। মাও কষ্টে নীল হয়ে আবার বাচ্চা বিক্রির জন্য চাপাচাপি করতে থাকেন। এবার বাচ্চার মালিকদের অর্থাৎ মেয়েগুলোকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। সাতটা বাচ্চা থেকে দুইটা বিক্রি করলে তাদের খুব একটা কমে যাবে না। মা বাজারে প্রচলিত দামের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ দামের প্রস্তাব দেন শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। তাতে মেয়েগুলোর সিদ্ধান্তের নড়চড় হয় না। ওরা এমন ভাবে ভ্রুকুটি করে যেন বলতে চাইছে, 'যেখানে বিক্রির প্রশ্নই আসছে না সেখানে দামের প্রশ্ন আসে কোথা থেকে?' মেয়েরা বোধ হয় ছেলেদের চেয়ে একটু বেশি হৃদয়হীন হয়।

বাচ্চা কিনতে না পারার কারণে একটা গুমোট আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। কষ্টের কারণে আমি পথে মায়ের সাথে একটা কথাও বলতে পারলাম না। মা আমার কষ্টটা বুঝে একহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে রাখলেন। তারপর একটু ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, 'আমরা কালই বাজার থেকে বড় বড় দুটো রাজহাঁস কিনে আনব। সেই রাজহাঁস ডিম পাড়বে। ডিমগুলোকে আমরা বসিয়ে দেব। ডিম ফুটে অমন ফুটফুটে বাচ্চা বের হবে। সবগুলো বাচ্চাই তোর থাকবে। তুই ইচ্ছেমত বাচ্চাগুলোর সাথে খেলতে পারবি, ধরতে পারবি। কেউ বাধা দিতে আসবে না।' মার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় আমার মন ভিজল না। আমার যে এক্ষুণি চাই।

পরদিন সকালে বারান্দায় বসে তারস্বরে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় বইটা পড়ছি। আব্বা পাশে বসে মাঝে মাঝে দেখিয়ে দিচ্ছেন। মা রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত। মাকে সাহায্য করছে বড়বু। আব্বা গরম ভাত খেয়ে বাজারে চেম্বারে যেয়ে বসবেন। সকাল সকাল না গেলে নাকি রোগী অন্য ডাক্তারের কাছে চলে যায়।

এমন সময় মিতাদি ও খুকুমণি বাড়িতে ঢোকে। আব্বার সাথে কুশল বিনিময় শেষে খুকুমণি সোজা রান্নাঘরে ঢুকে উত্তেজিত গলায় বলে, 'কাকিমা, কাকিমা, মা এক্ষুণি আপনাকে আমাদের বাসায় যেতে বলেছে।'

মা ভয় পেয়ে যায়। তাড়াতাড়ি আঁচলে হাত মুছে বলে, 'কী হয়েছে, মা?'

খুকুমণি হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'মা বলতে নিষেধ করেছে। বলেছে আপনি গেলেই দেখতে পাবেন। এখন বলা যাবে না।'

মা রান্নাঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে বাইরে আসতেই মিতাদি বলে, 'কাকিমা তেমন কিছু হয়নি। আপনি ধীরে সুস্থে চলেন। ওই রাজহাঁসের বাচ্চার ব্যাপারে। একটা রহস্যময় ব্যাপার ঘটেছে।'

রাজহাঁসের বাচ্চার কথা শুনে আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠি। উঠেই মায়ের পিছ ধরি। বড়বু আব্বাকে খাওয়ানোর ব্যাপারটা সামলাবে।

ওদের বাড়িতে ঢুকে যে দৃশ্য দেখি তার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। রাজহাঁসের সাতটা বাচ্চাই উঠোনে মরে পড়ে আছে। লাল লাল কচি পাগুলো আকাশের দিকে দিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে উঠোনের উপর। কিছু লাল পিঁপড়া সারবেঁধে ওদের নরম হলদেটে বুকের উপরে উঠে যাচ্ছে। ওদের রোয়াওয়ালা পিঠ পড়ে আছে মাটিতে। পাশে মা রাজহাঁসটা একবার বাচ্চাগুলোর দিকে তাকায় আরেকবার গলা উঁচু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারস্বরে ক্যাং ক্যাং শব্দ করে শূন্যের দিকে তার অবুঝ মনের অভিযোগ জানাচ্ছে। কী আশ্চর্য! ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর মৃত্যুতে আমার দুঃখ না হয়ে অদ্ভুত এক ধরনের আনন্দ হতে থাকে। হিংস্র আনন্দ। ধ্বংসের আনন্দ।

বাকি বোনগুলো আর কাকিমা বারান্দায় চুপ করে বসে আছে। কাকু নাস্তা না করেই দোকানে চলে গেছেন।

আমাকে দেখে কাকিমা কাছে ডেকে জড়িয়ে ধরলেন। ওগুলো মরে যাওয়ার পর আমাকে এই আদরের হেতু আমার কাছে স্পষ্ট হলো না। মেয়েগুলো আমার দিকে এমন ভাবে তাকাতে লাগল যেন বাচ্চাগুলোকে আমিই কোন কৌশলে মেরে ফেলেছি।

মা কাকিমার কাছে জানতে চাইল কীভাবে সাত সাতটি বাচ্চা একবারেই মারা গেল। কাকিমা বললেন, 'সকালে খুকুমণিই আগে বাচ্চাগুলো ওদের আলাদা দেয়াল থেকে বের করতে যায়। মা রাজহাঁসটা বেরিয়ে আসে। বাচ্চাগুলো বের হয় না। কোনও সাড়াশব্দও করে না। ও ভয় পেয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। আমি ভেতরে হাত দিয়ে একটা বাচ্চা বের করে আনি। মরা। এরকমভাবে একে একে সাতটা বাচ্চাই মরা পাই। তারপর আর কী! কীভাবে মারা গেছে কিছুই বুঝতে পারিনি।'

একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'গতকাল বাবু এত করে দুটো বাচ্চা চাইল। দিলাম না। ও মনে কষ্ট পেয়ে বাড়িতে ফিরে গেল। আর

বাচ্চাগুলোও সকালে মারা গেল। কোন কারণ ছাড়াই। কারোর মনে কষ্ট দিলে যে তার পরিণাম এমন হতে পারে তা আজ নিজের চোখেই দেখলাম।'

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে তার অল্প কিছুদিন পরেই। তখন আমার সাঁতার শেখার বাই উঠেছে। বাড়ির পাশেই বিশাল এক পুকুর। নাম সরকারী পুকুর। স্কুলের লাগোয়া পুকুর এবং কোন মালিকানা ছিল না বলেই বোধ হয় ওই বিশাল পুকুরটিকে অমন নামে ডাকা হত। সেই পুকুরে আমি সাঁতার শিখতে যেতে শুরু করলাম। আমাদের বাড়িতে জলিল নামে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের এক লোক কামলা খাটত। সবাই ওকে জলু বলে ডাকত। আব্বাকে দাদা ডাকত বলে আমরা ছোটরা ওকে জলুচা বলে ডাকতাম। জলু চাচার ছোট সংস্করণ। বাড়ির পুকুরে একটু আধটু মায়ের সাথে গেলেও জলুচাই আমাকে সাঁতার শেখানোর দায়িত্ব নেয়। সে নিজে সরকারী পুকুরে তার কামলা টাইপের বন্ধুদের সাথে গোসল করত বলে আমাকে সাঁতার শেখাতে সরকারী পুকুরে নিয়ে যেত। প্রতিদিন একটু একটু হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করলেও একা একা সাঁতার কাটার মত দক্ষতা তখনও আমার হয়নি। সেদিন জলুচা কী মনে করে আমাকে মাঝ পুকুরে নিয়ে সাঁতার শেখাতে থাকে। ওর দুজন চোয়াড়ে মার্কা রাখাল বন্ধুই ওকে ওই বুদ্ধি দিয়েছিল। সাঁতার শেখাতে শেখাতে হঠাৎ ওর মাথায় ভূত চাপে। এক পর্যায়ে আমাকে একাকী পানিতে ছেড়ে দেয়। আমি যখন হাবুডুবু খেতে খেতে পানিটানি খেয়ে তলিয়ে যেতে থাকি তখন আমাকে উপরে তোলার পরিবর্তে আরও পানির ভিতরে চেপে ধরে। হয়তো ওটাও সাঁতার শেখার কোনও প্রক্রিয়া। কিন্তু তা বোঝার মত অবস্থা আমার নেই। আমার ফুসফুস বাতাসের পরিবর্তে পানিতে ভরে যায়। একটু বাতাসের জন্য আমি হাঁসফাঁস করতে থাকি। পানির উপরে অক্সিজেনের সমুদ্র বয়ে বেড়াচ্ছে অথচ পানির নীচে অক্সিজেনের অভাবে আমি নীল হয়ে যেতে থাকি। অক্সিজেনের জন্য মুখ হাঁ করতেই ভলকে পানি ঢুকে যায় ফুসফুসে। অবশিষ্ট যেটুকু অক্সিজেন ছিল ফুসফুস তা দ্রুততার সাথে বের করে দেয়। আমি যখনই জীবনের আশা ত্যাগ করে পানির জগতে পাড়ি জমানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকি, তখনই জলুচা আমাকে উপরে টেনে তোলে। উপস্থিত দাঁড়িয়ে থাকা জলুচার দুই কুপরামর্শী বন্ধু বলে ওঠে, 'একবার কায়দা মত পানি খাওয়াতে পারলে সাঁতার শেখাটা ওয়ান-টু এর ব্যাপার।'

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমার নয়, জলুচার। আমি বেঁচে গেছি ঠিকই। কিন্তু জলুচা?

বাড়িতে এসে মাকে জলুচার এহেন আচরণের কথা বলার চেষ্টা করলেও মা তেমন একটা পাত্তা দিলেন না। সাঁতার শিখতে যেয়ে পানি খাওয়াটা নাকি স্বাভাবিক ব্যাপার। হামেশাই ঘটছে। কেউ অভিযোগ করে না। মাও সাঁতার শেখার সময় প্রতিদিন ভরপেট পানি খেয়ে আসত। তার জন্য কোন অভিযোগ করত না। শেখার আনন্দটাই প্রধান ছিল।

ওইদিন সন্ধেয় বিলের কাদাপানি থেকে এক পাজা তাজা ঘাস কেটে এনে জলুচা গাইয়ের বাছুরটাকে দিতে দিতে মাকে জানায়, 'দিদি, শরীরটা কেমন যেন লাগছে। দুর্বল দুর্বল। কোন যুত পাচ্ছি না।'

মা বললেন, 'গরুটরুগুলো গোয়ালে তুলে খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়। সব ঠিক হয়ে যাবে। সারাদিন ভূতের মত খাটিস। শরীর তো একটু খারাপ লাগবেই। তোর দাদা ফিরুক তখন ওষুধ পত্র চেয়ে নিস।'

জলুচার দাদা অর্থাৎ আব্বা ফেরার আগেই তার অবস্থা খারাপ হতে থাকে। সমস্ত শরীর কোন এক অজানা কারণে নীল হয়ে যেতে থাকে। থুতু শুকিয়ে আসতে থাকে। একটু পর গাল দিয়ে যখন গেঁজা ভাঙতে থাকে, তখন আমি দৌড়ে আব্বার চেম্বার থেকে আব্বাকে ডেকে আনতে যাই।

আব্বার সাথে বাড়ি এসে শুনি জলুচার অবস্থা আরও খারাপ। তাকে নাকি সাপে কেটেছে। ঘাস কাটতে যেয়ে পায়ে কীসে খোঁচা লাগা বা কামড়ানোর মত একটা হয় তার। নিজের কাজে এত ব্যস্ত ছিল যে সেদিকে খেয়াল দেয়নি সে। ভেবেছে কোন পচা শামুক বা কাঁচে হয়তো পা কেটে গেছে। এখন বুঝতে পারছে তাকে সাপে কেটেছিল। কোন বিষাক্ত সাপ। গ্রামের একজন ওঝাকে আনা হয়েছে। সে নানারকম মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে বিষ নামানোর চেষ্টা করছে। তাতে যে খুব একটা সফল হচ্ছে না তা রোগী নয়, ওঝার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

আব্বা এসে জলুচার উপর ডাক্তারী বিদ্যা ফলাবার কোনরকম চেষ্টা করলেন না। ডাক্তারী বিদ্যা ফলাবার যে আর কোনও জায়গা নেই তা আব্বা বুঝে গেছেন। আগে থেকেই যদি জলু কাটার উপরে শক্ত বাঁধন দিয়ে রাখত তা হলে ডাক্তারী বিদ্যা কাজে লাগত। অবহেলা করায় বিষ সারা শরীরে ছড়িয়ে গেছে। এখন যা করার ওঝাই করবে। বাকি আল্লার ইচ্ছা।

আমাদের গ্রামের ওঝা তার অপরাগতা স্বীকার করে বলল, 'এ রোগী আমার সাধ্যের বাইরে। আপনারা তাড়াতাড়ি সরাবপুরে (সোহরাবপুর) কালিনারায়ণী ওঝাকে নিয়ে আসেন। তিনি আমার গুরু। তিনি যদি পারেন তো পারবেন। আর না হলে ওর মায়া ত্যাগ করতে হবে।' বলে সে তার ঝোলাঝুলি তুলে বাড়ির পথ ধরল।

আব্বার কথামত পাশের বাড়ির আনিস ভাই তার চায়না ফিনিক্স সাইকেল নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সরাবপুরের উদ্দেশে।

আনিস ভাই সাইকেলের পিছনের ক্যারিয়ারে করে কালিনারায়ণ ওঝাকে আনার পর সবার মুখে কিছুটা স্বস্তির ভাব ফিরে এল। শুধুমাত্র আব্বা গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। জলুচার বাবা-মা-ভাইরা এসে বসে আছে সেই সন্ধে থেকেই। তাদের মুখের বিমর্ষভাবটাই সবার চোখে পড়ে।

কালিনারায়ণী ওঝা প্রায় সারারাত জেগে থেকে নিজের বিদ্যাবুদ্ধিতে যতটুকু কুলায় তার সবটুকু করলেন। কিন্তু বিষ নামল না। যার সারা শরীরে বিষ উঠে গেছে তার বিষ কোথা দিয়ে নামাবে?

বিষের তীব্রতা পরীক্ষা করার জন্য মাঝে মধ্যে জলুচাকে নিমের পাতা চিবাতে দেওয়া হচ্ছে। জলুচা তিক্ত নিমের পাতা এমন ভাবে চিবাচ্ছে যেন ওটা নিম পাতা নয় মিষ্টি জাতীয় কিছু। নিমের গাছ থেকে ছাল তুলে আনা হলো। জলুচা একটু পরপর সেটা চিবিয়ে জানাল যে মিষ্টি লাগছে। আস্তে আস্তে এমন হতে লাগল যে, নিম ছালের মিষ্টতা বাড়তেই থাকল। আর এদিকে জলুচার কথা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যেতে লাগল।

অগত্যা শেষমেশ কালিনারায়ণী ওঝাও হাল ছেড়ে দিলে আব্বা তাড়াতাড়ি করে ওকে সদর হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। হাসপাতালে নেওয়ার পরদিন সকালে জলুচা বিষক্রিয়ায় নীল হয়ে মারা গেল।

তখনও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি এই মৃত্যু রহস্য। এর পরবর্তী ঘটনার পর আমি দুইয়ের সাথে দুই মিলিয়ে চার পেতেই বুঝতে পারি এসব ঘটনার কারণ এবং তার পিছনের মানুষটি কে!

পরবর্তী ঘটনা আমার স্কুল জীবনে। তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি। ছাত্র মাঝারী মানের। ঊনপঞ্চাশজন ছাত্রের মধ্যে আমার রোল তেইশ। পড়াশুনার

চেয়ে দুষ্টুমিতে আমার নাম বেশি। টিফিনের পরে প্রায়ই আমাকে পাওয়া যায় না। সিনেমা হল এলাকায় খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে।

তো একদিন ম্যাথ স্যর আসার আগ মুহূর্তে আমি 'মুতখা মুতখা' বলে জানালার বাইরে দাঁড়ানো ক্লাসমেট মুক্তাকে ডাকতে এবং সেই সাথে খেপাতে লাগলাম। বাইরে থেকে মুক্তা নয় ভিতরে ঢুকলেন আকরাম স্যর। পিছনে মুক্তা। তখনও আমি কিছু সন্দেহ করিনি। স্যর এসেই গম্ভীর মুখে সবার হোমওয়ার্ক দেখতে থাকেন। অন্যান্য দিন হোমওয়ার্কের খাতাগুলো ঝাপ করে টেবিলের উপরে থাকে। স্যর অংক করাতে করাতে ঘণ্টা পড়ে যায় বলে খাতাগুলো দেখতে পারেন না। এজন্য মাঝে মাঝে আমরা হোমওয়ার্ক না করে পুরানো খাতাটা জমা দেই খাতার ঝাপ বাড়াতে। আজ আমি সহ আমার মত অনেকেই হোম ওয়ার্ক আনিনি। ধরা খেলাম। স্যর এক মাথা দিয়ে পিটাতে শুরু করলেন। স্যর দুটো করে বেত আনেন। প্রথম কয়েকজনের মারতে মারতে একটা বেতের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল।

এরপর স্যর আমাকে ধরলেন। ধরে যে কথাটা বললেন সেটা হচ্ছে আমি কেন মুক্তাকে মুতখা বলে ডেকেছি। আমি অবাক হলাম। এটা বড় ধরনের কোনও অপরাধ কীভাবে হলো সেটা আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। আমরা হরহামেশা এরকম নাম বিকৃত করে ডাকি। শুধু ছেলেদের না। মেয়েদেরও। শিখাকে ডাকি খাসি বলে। নিপাকে পানি, রিপু কে আরেকটু বড় করে ডাল পুরি। সবচেয়ে বড় ব্যাপার স্যরেরও একটা নাম আছে। যেটা স্যরের আড়ালে আবডালে নিজেদের মধ্যে ডাকি। স্যর সবসময় বেত নিয়ে আমাদের আক্রমণ করেন বলে স্যরকে আমরা আকরাম স্যর থেকে বানিয়ে নিয়েছি আক্রমণ স্যর।

কিন্তু স্যর আজ আমাকে এভাবে কেন আক্রমণ করলেন বুঝতে পারলাম না। সপাসপ বেত পড়তে লাগল আমার পিঠে। আমি দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে লাগলাম। ক্লাসে মেয়েরা থাকায় স্যরেরা যতই মারপিট করুক আমরা ছেলেরা কান্না চাপার চেষ্টা করে চলি। ছেলেদের কান্না মেয়েদের দেখা ভীষণ লজ্জার ব্যাপার।

আক্রমণ স্যর প্রথম বেতটা আমার পিঠে ভেঙে ক্লাস মনিটরকে টেবিল থেকে দ্বিতীয় বেতটা আনতে বললেন। দ্বিতীয়বারের মত আক্রমণ শুরু করার জন্য।

ক্লাসে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। এক স্যারের বেতের সপাসপ শব্দ এবং স্যারের হাঁপানো ছাড়া। আমিও কেমন যেন হয়ে গেছি। এত বেতের বাড়ি পড়ছে আমার পিঠে কিন্তু কোনও অনুভূতি যেন হচ্ছে না আমার। যেন আমি এক জম্বি। কোনও অনুভূতিশক্তি, বোধশক্তি, ব্যথাবোধ কিছুই আমার নেই।

স্যার হিস্টোরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত একনাগাড়ে আমাকে পিটাতে থাকেন। আমি অপেক্ষা করতে থাকি কখন এটা শেষ হবে। আমার বন্ধুরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে রেখে মনে মনে বেতের বাড়ির সংখ্যা গুনতে থাকে।

আমি যেন কোমার মত অবস্থায় চলে যাই। বাইরের জগতের কোনও শব্দই যেন আমার কানে ঢোকে না। কান হঠাৎ করে কীভাবে জানি বন্ধ হয়ে গেছে। আর আমি বুঝে গেছি এই বেতের বাড়ি আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শেষ হবে না। আমি পিঠ পেতে দিয়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে করতে একসময় অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ি বেঞ্চের উপরে।

জ্ঞান ফিরতেই চোখ মেলে দেখি আমি অফিস রুমে, টেবিলের উপর শোয়া। প্রায় সব স্যার এবং ম্যাডাম ঝুঁকে আছেন আমার মুখের উপরে। কোত্থেকে জানি একগ্লাস গরম দুধ জোগাড় করেছে। সেটাই খেতে হলো আমাকে। মারপিটের পর সত্যি আমার খিদে লেগেছিল। দুধের পরে যখন কলা হাতে ধরিয়ে দিল, গপগপ করে খেয়ে ফেললাম আমি। মারপিটের পর আবার এরকম জামাই আদর করছে কেন বুঝতে পারলাম না। বুঝাবুঝির চেষ্টা না করে খেয়ে যেতে থাকলাম। খানিকপরে আব্বা এলেন স্কুলে। আমার হেঁটে যাওয়ার অবস্থা নেই দেখে ভ্যানগাড়িতে আধশোয়া করে আমাকে বাড়িতে নেওয়া হলো। হেডস্যার সহ দুজন স্যারও এলেন সাথে সাথে। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শিহাব জানাল যে আক্রমণ স্যার নাকি আমাকে সাতষট্টিটি বেত মারার পরে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। অজ্ঞান হতেই স্যার ভয় পেয়ে যান। সবাই ধরাধরি করে আমাকে অফিস রুমে নিয়ে যায়। আব্বাকে খবর দেওয়া হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

ওইদিনই স্কুল থেকে স্যারকে কারণ দর্শাও নোটিশ দেওয়া হয়। সরকারী চাকরি। এরকম মারপিটের পরেও চলে যাওয়া সহজ নয়।

রাতে মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটে। আমাকে মারপিট এবং স্কুলের নোটিশের কারণে মনটন খারাপ করে আকরাম স্যার খেতে বসেন। সাধারণ মানের খাওয়া। আলু ভাজি, কৈ মাছের তরকারী ও ডাল। মাছের তরকারী খাওয়ার

মাঝামাঝি পর্যায়ে স্যারের গলায় না কোথায় জানি মাখানো ভাত বেধে যায়। স্যার কথা বলতে এবং শ্বাস নিতে পারেন না। পানি খেতে যেয়ে পানি খেতে পারেন না। অবস্থা খারাপ হতেই দ্রুত গতিতে স্যারকে সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। কৃত্রিম অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা হয়। ডাক্তাররা জানায় ভাত পথ ভুল করে খাদ্যনালী দিয়ে না গিয়ে শ্বাসনালীতে আটকে গেছে। আটকে পথ ব্লক করে দিয়েছে। তবে ভয়ের কিছু নেই। আপাতত কৃত্রিম অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। বড় ডাক্তার এলে অপারেশন করে ভাত বের করা হবে। রাতেই অপারেশন করা হয়। স্যার কথা টথা বলেন। ভোর রাতে যখন রোগীর অ্যাটেনডেন্টরা সবাই সারারাতের ক্লান্তিতে ঘুমে ঢলে পড়েছে, তখন স্যার নিঃশব্দে শ্বাস না নিতে পেরে মারা যান।

আর এইবার আমি আগের দুইয়ের সাথে এই দুই মিলিয়ে নিজেকে নিয়ে আতঙ্কে জমে যেতে থাকি।

স্যারের মৃত্যুর সাথে আমার কোনও যোগ থাকতে পারে এরকম ধারণা সবার মধ্যে রটলেও সেটা ছিল অন্যরকম। বাচ্চা একটা ছেলেকে মারার জন্য আল্লা নিজে হাতে শাস্তি দিয়েছেন জাতীয়। কিন্তু আমি যে ব্যাপারটা নিয়ে আতঙ্কিত হলাম সেটা হচ্ছে আমার ব্যাপারে। কেউ আমাকে খুব কষ্ট দিলে যে রকম কষ্ট মানুষ মরার সময় পায় বা যে রকম কষ্টে মানুষের মরে যেতে ইচ্ছে করে, অবধারিত ভাবে সে-ই মারা যাচ্ছে। এটা আপাতদৃষ্টিতে সুখের মনে হলেও আমার কাছে আতঙ্কের বিষয় বলে মনে হচ্ছে। এটা নিয়ে কারোর সাথে আলাপ যে করব তারও উপায় নেই। এরকম আজগুবি কথা কেউ পাত্তাই দেবে না। মাকে একদিন বলেছিলাম। মা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বড়বু বললেন, 'বাব্বাহ, এখন থেকে তো তোকে সমঝে চলতে হয়। দুনিয়াতেই আজরাইল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। খুব খারাপ কথা।'

আমিই মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছি ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম এরকমভাবে চলাফেরা করব যাতে কেউ আমাকে মৃত্যুযন্ত্রণার মত কষ্ট না দিতে পারে। সব রকম সংঘাত এড়িয়ে চলব। সবার সাথে ভাল ব্যবহার করব, যাতে এরকম কোনও ঝামেলায় জড়াতে না হয় যে আমি কারও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াই।

আশ্চর্যের ব্যাপার, অনেকদিন কেটে গেলেও আমি আর কারও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ালাম না। ব্যাপারটা আমার মনের গহীনে থাকলেও বার বার

মনে পড়ে আমাকে অস্বস্তিতে ফেলল না। সত্যি বলতে কি, অনেক সময় মনেও থাকত না।

মধ্যম মানের ছাত্র হিসাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এলাকা থেকেই পাস করে ঢাকায় চলে এলাম ভার্সিটিতে ভর্তি হতে। কিন্তু আমার মানের ছাত্ররা ভার্সিটিতে ভর্তি হয় না। কাজেই নিজের ক্যালিবার বুঝে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আণ্ডারে মিরপুরের বাংলা কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্সে ভর্তি হয়ে গেলাম।

থাকি শ্যামলীর রিং রোডের একটা মেসে। আমাদের এলাকার দুটো ছেলে ওখানে থাকে সেই সুবাদে।

নিজেই আজরাইলের ভূমিকায় আছি বলেই বোধ হয় আমার ভয়ডর কম। রাত বিরাতে বাসায় ফিরি। ইদানীং মোবাইল নিয়েছি বলে একটু আগে ভাগে বাসায় ফেরার চেষ্টা করি। মোবাইলটা টিউশনির টাকায় অনেক কষ্টে কিনেছি। ওটা হাতছাড়া করতে রাজি নই।

একদিন রাত বোধ হয় দশটা টশটা হবে, হেঁটে হেঁটে ফিরছি শ্যামলী থেকে। পিসি কালচারের অন্ধকারাচ্ছন্ন ফাঁকা মাঠটা হেঁটে কিছুদূর এগিয়ে আসতেই ক্লাব ঘরের দিক থেকে একটা চোয়াড়ে চোখা ছেলে ডাক দিল, 'এই যে ভাই, শোনো।'

আমি পিছন ফিরে তাকানোর আগেই ওরা আমার পাশাপাশি চলে আসে। যে ডাক দিয়েছিল সে-ই বলে ওঠে, 'পায়ে পাড়া দিয়ে চলে গেলেন একটু সরিও বললেন না। এটা কোন দেশী ভদ্রতা, ভাই। অন্তত সরি তো বলবেন।'

আমি স্পষ্টত জানি আমি কারও পায়ে পাড়া দিয়ে আসিনি। ওরা রাস্তার পাশের ফেলে রাখা পিলারের উপরে বসে ছিল। আমি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেই এসেছি।

কী ভেবে বোকার মত বলে বসলাম, 'সরি ভাই খেয়াল করিনি।' ভেবেছিলাম সরি বললেই যদি ল্যাঠা চুকে যায় তো যাক।

ল্যাঠা চুকল না। ছেলে দুটো পরিচিত বন্ধুর মত দুপাশে দাঁড়াল। রাস্তা দিয়ে কত লোকজন যাচ্ছে আসছে। তারা ভাবছে তিন বন্ধু দাঁড়িয়ে গল্প করছে। কেউ এদিকে খেয়াল করছে না।

দ্বিতীয় ছেলেটি বলল, 'এই যুগে শুধু সরিতে কি আর চিড়ে ভেজে, ভাই।

আমাদের দুজনকে মিষ্টি খাওয়ান, ভাই। কাছে কত টাকা আছে?'

এর আগেই আমি বুঝে গেছি যে ছিনতাইকারীদের খপ্পরে পড়েছি। গতসপ্তাহে আমাদের মেসের ইলিয়াস ভাই এই মাঠের কোণটাতেই আক্রান্ত হয়েছিল। এরা (ল্যাংটা মাসুমের গ্রুপ) ইলিয়াস ভাইয়ের সাথে খুব ভদ্র ব্যবহার করে দুইশো টাকা ধার নিয়েছিল ফেন্সি খাবে বলে। জনম বাকি।

আমি কাষ্ঠ হাসি হেসে বললাম, 'টাকা পয়সা নেই, ভাই। টাকা থাকলে কি আর হেঁটে চলাচল করি।'

এই সময় প্রথম ছেলেটা আমার ডানহাতটা টেনে নিয়ে ওর পেট কোচড়ে রাখল। ঠাণ্ডা কিছুর স্পর্শ পেলাম। জিনিসটা হাতলওয়ালা অনুভব করে বুঝলাম ছুরি। পিস্তল নয়। বুকে যেন একটা বল পেলাম। পিস্তলের সাথে হেরিতেরি চলে না। ছুরির বিরুদ্ধে রিস্ক নেওয়া যায়।

প্রথম ছেলেটাই আবার স্বাভাবিক গলায় বলল, 'বুঝতেই তো পারছেন, ভাই, আমরা কী চাচ্ছি। ঝামেলা না করে যা আছে দিয়ে দেন।'

আসলেই আমার কাছে টাকা পয়সা তেমন ছিল না। কুড়িয়ে কাড়িয়ে ষাট সত্তর টাকার মত দিলাম ওদের হাতে। ভাবলাম বিপদ থেকে রেহাই পেয়েছি।

হাতের ঘড়িটাও খুলে নিল। পুরানো ঘড়ি। তেমন একটা কষ্ট পেলাম না।

এবার প্রথম ছেলেটা প্যান্টের পকেটে হাত দিতে যেতেই আমি বাধা দিলাম। মোবাইলটা প্যান্টের পকেটে।

বাধা দেওয়ার কারণে ওর আগ্রহ আরও বাড়ল। ভাবল দামি কিছু আছে পকেটে। জোরাজুরি করতে লাগল। যদিও সেটা রাস্তা দিয়ে যাওয়া লোকের চোখে তেমন অস্বাভাবিক কোন দৃশ্য হবে না। বন্ধুবান্ধব একত্র হলে অমন একটু জোরাজুরি হয়ই।

ও বাম পকেটে হাত ঢুকিয়ে মোবাইল বের করার চেষ্টা করতেই আমি সজোরে মোবাইল সহ আমার পকেট চেপে ধরলাম। তারপর আমার কী হলো আল্লাই জানে ছেলেটাকে জোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলাম মাটিতে পাশের ছেলেটা হতভম্ব হয়ে ওকে ধরে তোলার চেষ্টা করতেই আমি ঝেড়ে দৌড় শুরু করলাম। ওদের দলে বোধ হয় আরও একজন ছিল। সামনে থেকে আমাকে জাপটে ধরল। আমি ওটার সাথে ঝাপটাঝাপটি করে ছাড়িয়ে

নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকলাম। ততক্ষণে বাকি দুজন এসে পড়েছে।

প্রথম ছেলেটা, যার কোমরে ছুরি গোঁজা ছিল, সে ছুরি বের করে ফেলল। ভয়ে আমার শরীরে পশুর শক্তি ভর করল। ধস্তাধস্তি করে যখন দুজনের কবল থেকে নিজেকে প্রায় ছাড়িয়ে ফেলেছি তখনই ছুরির প্রথম আঘাতটা আসে। আমার বাম হাতের কনুইয়ের উপরটা বেশ খানিকটা ফাঁক হয়ে ছুরিটা বেরিয়ে যায়। প্রচণ্ড ব্যথায় আমি ককিয়ে সাহায্য চাই। রাস্তার ওপাশ দিয়ে অনেক লোকজন চলাচল করলেও কেউ এগিয়ে আসে না। বরং আরও তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এই ভয়ঙ্কর জায়গাটা ত্যাগ করে। দ্বিতীয় আঘাতটা পেটে করতে যাওয়ার আগেই আমি ঘুরে বসে পড়ার চেষ্টা করায় আঘাতটা বাম বগলের নীচে হৃৎপিণ্ডের একপাশে লাগে।

আমার বোধশক্তি চলে যেতে থাকে। আমি ঘোরের মধ্যে গোঙানির শব্দ করে মাটিতে উবু হয়ে পড়ে যাই। ওরা ততক্ষণে আমার পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে নিয়ে ক্লাব ঘরের পাশের মাঠের দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আমি জ্ঞান হারাতে থাকি। কিন্তু জানি এ অবস্থায় জ্ঞান হারালে চলবে না। কেউ এগিয়ে এসে হাসপাতালে না নিলে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণেই মারা যাব আমি। গলায় যত জোর ছিল সবটুকু দিয়ে চিৎকার করলাম আমি। চিৎকারে কাজ হলো। কারা যেন এসে আমাকে ধরাধরি করে রিকশায় তুলতে লাগল। এ সময়ে আমি আবছা আবছা ভাবে আমার মেসের ঠিকানা বলে দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

পরদিন নিজেকে আবিষ্কার করলাম সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের বেডে। পাশে আমার মেসের গ্রাম সম্পর্কীয় ভাই মিজান। ব্যান্ডেজ ট্যান্ডেজ বাঁধা দেখে গত রাতের ঘটনা মনে পড়ল। মিজান জানাল ভয়ের কিছু নেই। স্ট্যাব তেমন হয়নি। অল্প কটা সেলাই লেগেছে। কদিনেই ভাল হয়ে যাব আমি।

আমি ওকে বললাম, 'এখানে পেপার পাওয়া যায় না?'

'নীচ থেকে কিনে আনা যাবে।'

'নিয়ে আয় তো একটা।'

মিজান একটা জাতীয় দৈনিক কিনে নিয়ে আসে। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি গতরাতে শ্যামলী এলাকায় কোন সন্ত্রাসী মারা গেছে কিনা। নেই। হয়তো পেপারওয়ালারা খবর পায়নি, অথবা আমার সেই ক্ষমতার প্রভাব চলে

গেছে।

অশুভ প্রভাবটা চলে গেছে ভাবতেই এত কষ্টের মাঝেও আমি এক ধরনের আনন্দ অনুভব করি। মুক্তির আনন্দ।

কিন্তু মুক্তি যে পাইনি তা বুঝতে পারি সপ্তাহখানেক পরে। তিনদিনের মধ্যেই আমি হাসপাতাল থেকে রিলিজ পাই। এবং একসপ্তাহের মধ্যেই আমি আবার রাতে ঘরে ফেরা শুরু করি। যদিও এখন একটু সকাল সকাল ফিরি। আটদিনের মাথায় আটটা কি সাড়ে আটটার দিকে রুম থেকে বেরিয়ে হক সাহেবের গ্যারেজের ওখানকার দোকানের ভিডিও ক্লাবে একটা সিডি কিনতে যেয়ে দেখি রাস্তা ভর্তি পুলিশ। জানতে পারি একটু আগে এই মোড়টাতে একটা খুন হয়েছে। মোড়ের দোকানে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসী ল্যাংটা মাসুম (কবে নাকি লোকজন ধরে ওকে ল্যাংটা করে দিয়েছিল সেই থেকে নাম ল্যাংটা মাসুম) সিগারেট নিচ্ছিল। কিনছিল না। মাস্তানরা কিছু কেনে না। নেয়। এই সময় তিন যুবক মোটর সাইকেল নিয়ে দোকানের কাছটাতে আসে এবং স্টার্ট না থামিয়ে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ল্যাংটা মাসুমকে কয়েক রাউণ্ড গুলি করে ওই অবস্থায় পালিয়ে যায়। পুলিশ হত্যাকারীদের ধরতে পারেনি।

দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সিডি নেওয়া হলো না। ফিরে এলাম রুমে এবং বুঝতে পারলাম এই ল্যাংটা মাসুম আর কেউ না, আমাকে মৃত্যুর মুখে দাঁড় করিয়েছিল যে হতভাগা।

আমি হাল ছেড়ে দিলাম। অশুভ (নাকি শুভ!) প্রভাবটা এখনও আমার উপর থেকে যায়নি। বেশ বহাল তবিয়তেই আছে।

এখন যে সমস্যাটায় পড়েছি সেটা বলেই শেষ করছি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাবজেক্ট এবং কলেজ বাংলা কলেজ হওয়ায় কলেজে খুব একটা বেশি যেতাম না। কিন্তু হাসনাত নাসরীন নামের এক দেবী গোত্রীয় ক্লাসমেটের প্রেমে পড়ায় কলেজ আমার ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠল। কারণ কলেজে এলেই শুধু ওর সাথে দেখা হয়।

আমরা চুটিয়ে প্রেম করতে লাগলাম।

কিন্তু ক্লাসমেটের সাথে প্রেম করলে যে সমস্যাটায় পড়তে হয় সেটায় পড়লাম। ক্লাসমেট মেয়েরা সমবয়সী হওয়ায় তাড়াতাড়ি বিয়ের যুগ্যি হয়ে ওঠে কিন্তু ছেলেরা তখনও ছাত্র থাকায় বিয়ের ব্যাপারে তাকে নীরব থাকতে

হয়। বেকার ছেলের হাতে কেউ মেয়ে দিতে চায় না। যদিও বেকার মেয়েদের বিয়ে নিয়ে কোন সমস্যা হয় না। তা ছাড়া গার্জিয়ানরাও ছেলেদের নিয়ে যাদের চিন্তা করে তারা হয় ইস্কুলে পড়ে বড় জোর ইণ্টারমিডিয়েটে।

কাজেই থার্ড ইয়ারে উঠতেই নাসরীনের বিয়ের প্রস্তাব চলে এল। ছেলে বুয়েট পাস সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। কীসে যেন চাকরিও করে।

এরকম লোভনীয় প্রস্তাব দেখে নাসরীনও বোকার মতো মত দিয়ে দিল। আমার কথা না ভাবে না ভাবুক, নিজের কথাটাও একবারও ভাবল না।

আগামীকাল নাসরীনের বিয়ে। একথাটা মনে উঠতেই আমার বুকের ভিতরটা কষ্টে নীল হয়ে যেতে থাকে। মনে হতে থাকে কেউ হৃৎপিণ্ডে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। কেউ আমার দু'ফুসফুস দুমড়ে মুচড়ে ধরেছে। আমি শ্বাস নিতে পারছি না।

পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা অসহ্য বোধ হতে থাকে।

আর একটা অজানা আশংকা অজান্তেই গ্রাস করে আমাকে, আতঙ্কিত করে তোলে।

আমার প্রিয়তমা নাসরীনের বিবাহযাত্রার পরিবর্তে আমাকে কেন তার শবযাত্রা দেখতে হবে! হায় খোদা!

প্রিন্স আশরাফ

পিশাচ বাড়ি

আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে নাটোর বেড়াতে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। এ সময়ে বৃষ্টি হলেও নাটোরের দিকে প্রচণ্ড গরম থাকে। কিন্তু ওয়ানাইজা আবদার করল তাকে নাটোরে বেড়াতে নিতে হবে। যদি এবার না যাই তা হলে আর কখনওই সে কোথাও বেড়াতে যাবে না। নাটোরের সিংড়া উপজেলায় আমার এক ছোট ভাই মুরাদদের বাড়ি। সে বহুদিন ধরে চেষ্টা করছিল আমাকে নিতে। কিন্তু আমি কখনওই কোথাও বেড়ানোর জন্য সময় করে উঠতে পারি না। এবার যেহেতু ওয়ানাইজা বেড়াতে যাবেই, সুতরাং আমি ফোন করলাম মুরাদকে। ভীষণ উচ্ছ্বসিত হলো মুরাদ। তার চেয়ে বেশি উচ্ছ্বসিত মুরাদের নববিবাহিতা স্ত্রী ফাতেমা। ওরা দু'জনেই ডাক্তার। আমাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাল।

আগস্টের ২০ তারিখ সকালে আমরা রওনা হলাম। গাবতলী থেকে উঠলাম বাসে। নাটোর পৌঁছলাম বিকেলে। ওখানে আমাদের জন্য একটা মাইক্রো অপেক্ষা করছিল। মাইক্রোতে চড়ে প্রায় চল্লিশ মিনিট পর পৌঁছলাম মুরাদদের বাড়িতে। বিশাল তিনতলা বাড়ি। পাশে পুকুর। পুকুরের চারদিকে ঘন জঙ্গল। চমৎকার জায়গা। পুকুরের উল্টোদিকে একটি দোতলা বাড়ি। গাছের আড়ালে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে আমি ওদিকটায় বারবার তাকাচ্ছি দেখে মুরাদ বলল, 'ভাইয়া, ওটা একটা খালি বাড়ি। যারা থাকত তারা অনেক আগে ইণ্ডিয়া চলে গেছে।'

'ইণ্ডিয়া! ওরা কি হিন্দু ছিল নাকি?' আমি জানতে চাইলাম।

'হ্যাঁ। কিন্তু ওদের আত্মীয়-স্বজন বগুড়া থাকে।'

'বাড়িটা কেউ দাবি করতে আসেনি?'

'মতলববাজ মানুষেরতো অভাব নেই। অনেকেই আত্মীয় পরিচয় দিয়ে এসেছে, কিন্তু প্রমাণ দেখাতে পারেনি কেউ। চেয়ারম্যান সাহেব সবাইকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। পরে উনি লোকজন নিয়ে নিজ থেকে সদর দরজায় বড় তালা মেরে দিয়েছেন। বলেছেন, যদি এ বাড়ির প্রকৃত মালিক কখনও ফিরে আসেন তা হলে চাবি শুধু তার কাছেই হস্তান্তর করা

হবে।'

আমি বললাম, 'তুইতো ইতিহাস ভালই জানিস।' মুরাদ হেসে বলল, 'এসব এখানের সবাই জানে। আমি তার বেশি কিছু জানি না।'

আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো তিনতলার কোনার রুমে। এই রুমটাতে এসি রয়েছে। মুরাদ ও ফাতেমা এই রুমে থাকে। তাই আমি অন্যরুমে থাকার কথা বললাম। মুরাদের মা বললেন, 'তুমি আর ওয়ানাইজা হলে আমাদের স্পেশাল গেস্ট, এই গরমে তোমরা এই রুমেই থাকবে। মুরাদ আর ফাতেমা থাকবে পাশের রুমে। তোমরা ফ্রেশ হয়ে নাও, আমি টেবিলে খাবার দিচ্ছি।'

অনেক সময় নিয়ে আমি গোসল করলাম। তোলা ঠাণ্ডা পানিতে শরীর জুড়িয়ে গেল। আমার দেরি হচ্ছে দেখে ওয়ানাইজা পাশের ঘরের বাথরুমে গোসল সেরে এল। আমরা খেতে বসলাম। দেশি কই, ইলিশ মাছ আর হাঁসের মাংস রান্না করেছেন মুরাদের মা। চিকন চালের ভাতের সাথে তৃপ্তি সহকারে আমরা খেলাম। মুরাদ বলল, 'ভাই, আপনার পছন্দের গরুর মাংস রান্না হবে রাতে।'

আমি বললাম, 'এখন যা খেয়েছি, রাতে আর খেতে পারব বলে মনে হয় না।'

মুরাদের মা আমাদের চা দিলেন। গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আমি হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, 'খালাম্মা, ওই বাড়িটা সম্পর্কে আপনি কী জানেন?'

'কোন্ বাড়িটা?'

'পুকুরের উল্টোদিকের বাড়িটা।'

মুরাদ বলল, 'ভাইয়ার মনের মধ্যে দেখি বাড়িটা গেঁথে গেছে।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, বাড়িটা আমাকে টানছে।'

মুরাদের মা বললেন, 'পোড়ো বাড়ির দিকে কখনও নজর দিতে নেই, বাবা। ওই বাড়িটা আমার জন্মেরও আগে থেকে ওখানে আছে।'

আমি বললাম, 'তাই নাকি? তা হলে তো অনেক পুরান বাড়ি।'

মুরাদের মা বললেন, 'হ্যাঁ, অনেক পুরান। আমার জন্মের পর কখনও ওই বাড়ির দরজা খুলতে দেখিনি।'

'মুরাদ যে বলল চেয়ারম্যান সাহেব নাকি দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছিলেন!'

'হ্যাঁ, যে চেয়ারম্যান প্রথম তালা লাগিয়েছিলেন তিনি ছিলেন বর্তমান চেয়ারম্যানের দাদার দাদা। বংশানুক্রমে তারা চেয়ারম্যান হয়ে আসছেন। একটি কথা কী জানো, প্রত্যেক পোড়োবাড়ি নিয়ে অনেক গল্প থাকে; কিন্তু ওই বাড়ি নিয়ে কোনও গল্প নেই। একটা সাদা-সিদে পরিত্যক্ত বাড়ি। দেখার মতও কিছু নেই ওখানে, শুধু মান্ধাতা আমলের কয়েকটা খাট-পালংক ছাড়া।

'আপনি কখনও ওই বাড়িতে ঢুকেছেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না। আমি শুনেছি আমার মায়ের কাছ থেকে। আমার মা শুনেছেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে। আর তাঁর মা শুনেছেন...'

'থাক আর বলতে হবে না। আপনার চা চমৎকার হয়েছে। সাধারণত চা ভাল না হলে আমি খাই না। আমি আরেক কাপ চা খাব।'

চা শেষ করে আমরা বাড়ি থেকে বের হলাম। মুরাদ সব প্রোগ্রাম ঠিক করে রেখেছে, আমরা কখন, কবে, কোন্ কোন্ জায়গা পরিদর্শন করব। এখন যেতে হবে চলনবিলে। সন্ধ্যার পরে নৌকায় নাকি চলন বিলে ঘুরতে ভাল লাগবে। মাইক্রোবাসটি যথারীতি আমাদের জন্য তৈরি রয়েছে। মুরাদের বাবা এটি গত বছর কিনেছিলেন।

চলন বিল ঘুরে আসতে-আসতে আমাদের রাত দশটা বেজে গেল। ইঞ্জিন লাগানো নৌকায় আমরা অনেক ঘুরেছি। এখানে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাও ভাল। আমরা মুরাদদের বাড়িতে আসার পর একবারও বিদ্যুৎ চলে যেতে দেখিনি।

মুরাদের মায়ের পীড়াপিড়িতে খেতে বসতে হলো। ওয়ানাইজা রাতে কিছু খায় না, কিন্তু সে-ও বাধ্য হলো কলা পাতা দিয়ে মোড়ানো ধূমায়িত আস্ত ইলিশ ভাজা খেতে।

নাটোরে যতটা গরম ভাবছিলাম, তত গরম পড়েনি। আকাশে একটু মেঘ জমেছিল, তা কেটে গেছে। ওয়ানাইজা ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি লাইট অফ করে শুয়ে আছি। ঘুম আসছে না। কেন জানি বারবার পুকুরের ওপারের বাড়িটাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। এত টানছে কেন বাড়িটা আমাকে বুঝতে পারছি না। পুরান যে কোনও বিষয় আমাকে টানে—এই জন্য? সিগারেটের পিপাসাও লেগেছে।

বিছানায় উঠে বসলাম। বাইরের আলো কিছুটা ঘরের মধ্যেও আসছে

বলে দেখতে সমস্যা হচ্ছে না। বিছানা ছেড়ে নেমে আলনায় ঝোলানো প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট ও ম্যাচের বাক্স নিয়ে বারান্দায় গেলাম। বাইরে কী সুন্দর জ্যোৎস্না। ওই বাড়িটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। নির্জন, পরিত্যক্ত এক বাড়ি। ছাদে লম্বা একটা টেবিল। টেবিলের চারপাশে অনেকগুলো চেয়ার। দেখলে মনে হবে মিটিং করার জন্য রাখা হয়েছে। হয়তো একসময় এই বাড়ির মালিক এখানে পরিবারের সবাইকে নিয়ে মিটিংয়ে বসতেন। তার জন্য এক কোনায় আলাদা চেয়ার রয়েছে। এতদূর থেকে চেয়ারের সংখ্যা ঠিক গুণতে পারছি না। কিন্তু টেবিলের আকার ও সাজানো দেখে মনে হচ্ছে দশ-পনেরোর কম হবে না। কত বছর ধরে ওগুলো ওখানে পড়ে আছে কে জানে। হয়তো বৃষ্টিতে পচেও গেছে।

সিগারেট ধরালাম। ধীরে-ধীরে টানছি, আর তাকিয়ে আছি ছাদটার দিকে। কী যেন অসঙ্গতি লাগছে ঠিক ধরতে পারছি না। বাইনোকুলার থাকলে ভাল হত। একটা ছায়ার মত কিছু কী হেঁটে গেল! বাড়ির সামনে লম্বা কয়েকটি গাছ থাকায় দেখতে অসুবিধা হচ্ছে। ছাদে উঠলে ওই বাড়ির ছাদটাকে আরও স্পষ্ট দেখা যেত। জানি না এ বাড়ির ছাদে যাবার সিঁড়িতে দরজা তালা দেয়া থাকে কি না। মুরাদকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। হাত ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত প্রায় একটা। এত রাতে মুরাদকে ডাকা ঠিক হবে না। ছাদে যাবার সিঁড়ির দরজা বন্ধ থাকলে ফিরে আসব, সকালে যাওয়া যাবে। ওয়ানাইজা এখনও ঘুমাচ্ছে। ডাকলাম না ওকে। সন্তর্পণে বারান্দার দরজার ছিটকিনি খুললাম। পাশেই সিঁড়ি। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম।

ছাদের দরজা খোলাই পেলাম। খুব পরিষ্কার ছাদ। বোঝাই গেল মুরাদের মা এটাকে নিয়মিত পরিষ্কার রাখেন। ছাদের একপাশে ফুলের গাছ। তিনটে চেয়ার। একটা লোহার দোলনা। আমি একটা চেয়ার ছাদের সামনের দিকে টেনে নিয়ে বসলাম যাতে পুকুরের ওপারের বাড়ির ছাদটি ভালভাবে দেখা যায়।

ঝিরঝির বাতাস বইছে। নিঃস্তব্ধ চারদিক। আমার গলাটা একটু লম্বা করে রাখতে হচ্ছে। কারণ, মুরাদদের বাড়ির ছাদটা রেলিং দিয়ে ঘেরা।

এক দৃষ্টিতে আমি তাকিয়ে আছি ওই বাড়ির ছাদের দিকে। লম্বা টেবিল। টেবিলের দু'পাশ দিয়ে চেয়ারগুলো সাজানো। একটি বড় চেয়ার

টেবিলের শেষ মাথায়। বোঝা গেল মিটিংয়ের প্রধান ব্যক্তিটি ওটাতে বসতেন।

বসতেন? একটু দ্বিধা লাগল আমার মনে। দূর থেকে দেখেও বোঝা যাচ্ছে মোটেই শত বছরের পুরান নয় ওগুলো। শত বছরের পুরান হলে অত সুন্দর করে সাজানো থাকার কথা নয়। এর মধ্যে কত ঝড় হলো, কত বৃষ্টি হলো—চেয়ারগুলো তো এলোমেলো হয়ে থাকার কথা।

'কী দেখছ?' হঠাৎ মেয়েলি কণ্ঠের শব্দে চমকে উঠলাম। আরেকটু হলে চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম। নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'তুমি?'

হাসল ওয়ানাইজা। ঘুম-ঘুম চোখে দারুণ লাগছে ওকে। বাতাসে চুল উড়ছে। একটা চেয়ার টেনে বসল ও। বলল, 'ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম তুমি বিছানায় নেই। বারান্দায় গেলাম। নেই তুমি। ভাবলাম, নতুন জায়গায় তুমি ঘুমাতে পারছ না, নিশ্চয় ছাদে গেছ। তাই ছাদে এলাম।'

আমিও হাসলাম। বললাম, 'ভালই হলো। তবে চা খেতে পারলে আরও ভাল লাগত। আরে, তুমি দেখছি কাপড়ও পাল্টে এসেছ?'

'হ্যাঁ,' বলল ওয়ানাইজা। 'শাড়িটা কেমন হয়েছে?'

'দুর্দান্ত। তোমাকে আরও সুন্দর লাগছে।'

'চাঁদের আলোয় সব মেয়েকেই সুন্দর দেখায়।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'শাড়িটা ফাতেমা দিয়েছে আমাকে। নিতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু কিছুতেই শুনল না। একবার ভাবলাম কাল পরব। আবার কী মনে করে এখন পরে ফেললাম। তবে শাড়ির সাথে সবুজ ব্লাউজটা মানায়নি, কী বলো? খ্যাত খ্যাত লাগছে। নীল হলে ভাল হত।'

আমি বললাম, 'অনেক সুন্দর লাগছে।'

নিঃশব্দে কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত।

ওয়ানাইজা বলল, 'আমি ছাদে আসার পর থেকেই দেখছি তুমি ওই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছ।'

আমি বললাম, 'হুম, দেখছি। ছাদের টেবিলটা দেখছি। চেয়ারগুলো দেখছি। দেখে মনে হয় না ওগুলোর বয়স একশ'র বেশি।'

'কেন? কী হয়েছে?' ওয়ানাইজা জানতে চাইল। আমি বললাম, 'কী সুন্দর করে সাজানো। দেখেছ? একটুও এদিক-ওদিক নেই। মনে হচ্ছে

একটু আগে কেউ সাজিয়ে গেছে।'

খিলখিল করে হাসল ওয়ানাইজা।

আমি বললাম, 'হাসছ কেন?'

ওয়ানাইজা হাসতে হাসতেই বলল, 'ওই বাড়িটা অনেক প্রাচীন। সুধারাম জমিদারের বাড়ি ওটা। ওগুলো তো লোহার ভারি টেবিল-চেয়ার হতে পারে, যা ঝড়-বৃষ্টিতে কিছু হবে না। ছাদের সাথে ফিক্সড থাকতেও পারে!'

তাই তো! এটা আমার মনে আসেনি। আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। প্রাচীন বাড়িতে, বিশেষ করে জমিদার বাড়িতে এধরনের চেয়ার টেবিল থাকতেই পারে। নিজেকে বোকা মনে হলো। সেই কখন থেকে খামোকা ওগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি! তিনতলায় ভাল দেখা যাচ্ছিল না বলে ছাদে এসেছি! কেন যে মাথায় খেলল না এই সাধারণ বুদ্ধিটা! আমি উল্টো সবকিছু রহস্যময় ভেবেছি।

'সে যাক,' বললাম আমি। 'আবারও প্রমাণিত হলো তোমার ঘটে বুদ্ধি বেশি।'

ওয়ানাইজা বলল, 'তুমি কি সারারাত এখানেই থাকবা?'

আমি বললাম, 'নাহ চলো। তবে এক কাপ চা খেতে পারলে বেশ হত।'

ওয়ানাইজা বলল, 'তা হলে একটু অপেক্ষা করো। আমি চা বানিয়ে আনছি।'

আমি বললাম, 'এত রাতে আবার কষ্ট করবে?'

ওয়ানাইজা বলল, 'পতির জন্য সতী-সাধ্বী স্ত্রীর মাঝে-মাঝে একটু কষ্ট করতে হয় বৈ কি!'

ওয়ানাইজা ছাদ থেকে নেমে গেল। একটু পরেই ট্রেতে দু'কাপ চা নিয়ে ফিরল। আমি বললাম, 'এত তাড়াতাড়ি চা বানালে কীভাবে!'

ওয়ানাইজা হেসে বলল, 'ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে আনলাম। রাতে খাবার আগেই খালাম্মা চা বানিয়ে রেখেছিলেন।'

মনে পড়ল মুরাদের মা বলেছিলেন, 'ফ্লাস্কে চা বানানো আছে। যখন দরকার পড়বে খেয়ে নিয়ো।'

চা খেলাম দু'জনে। চা খেলেই আমার সিগারেটের তৃষ্ণা জাগে। হঠাৎ

মনে পড়ল সিগারেটের প্যাকেট তিনতলার বারান্দায় রেখে এসেছি। আমি বললাম, 'আর একটু ওয়েট করতে হবে। আমি সিগারেট নিয়ে আসি।'

ওয়ানাইজা হেসে বলল, 'আমি তোমার জন্য যুগ-যুগ অপেক্ষা করব।'

ওর হেঁয়ালিপূর্ণ কথায় আমিও হাসলাম। বললাম, 'জাস্ট এক মিনিট। যাব আর আসব।'

খুব দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নামলাম। তিনতলার বারান্দায় সিগারেটের প্যাকেট পেলাম। কী মনে করে ঘরে ঢুকতেই আতংকে জমে গেলাম। খাটে ওয়ানাইজা ঘুমিয়ে আছে। সাদা-কালো ছোপ-ছোপ রঙের সালোয়ার কামিজ পরা। ঠিক যেভাবে তাকে দেখে গিয়েছিলাম, সেই ভাবে। আমার মেরুদণ্ড বেয়ে ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। বোধহয় চিৎকার দিয়েছিলাম। কারণ, ওয়ানাইজা ধড়ফড় করে উঠে বসল।

'কী হয়েছে? লাইট জ্বালো,' বলতে-বলতে সে নিজেই সুইচ বোর্ডের কাছে গিয়ে সবগুলো সুইচ টিপতে লাগল। উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠল ঘর। আমি তখনও কাঁপছি। ওয়ানাইজা আমার কাছে এসে আমাকে ধরল।

'কাঁপছ কেন? কী হয়েছে বলো?' আমাকে ঝাঁকি দিল সে। আমি কিছুটা ধাতস্থ হয়ে বললাম, 'কিছু হয়নি। দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম।'

'এসো, ঘুমাবে।' ওয়ানাইজা আমার হাত ধরল। আহ, কী নির্ভরযোগ্য হাত!

আমিও আঁকড়ে ধরলাম ওয়ানাইজার হাতটা।

একবার ভাবতে চেষ্টা করলাম ওটা দুঃস্বপ্নই ছিল। হয়তো এখন ছাদে গেলে দেখব ওখানে কেউ নেই, কিছু নেই। চা-টা কিছু খাওয়া হয়নি ওখানে। সবটাই একটা স্বপ্ন। একটা দুঃস্বপ্ন। ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলাম, 'ফাতেমা কি কোনও শাড়ি তোমাকে গিফট করেছে?'

ওয়ানাইজা বিরক্তির সুরে বলল, 'ফাতেমা আমাকে শাড়ি গিফট করবে কেন? কী আবোল-তাবোল বলছ?' আমি আর কিছু বললাম না। বিছানায় উঠেই ঢলে পড়লাম। ঘুমিয়ে পড়লাম অতল ঘুমে। যখন ঘুম ভাঙল দেখি দশটা বাজে। সোফায় বসে গল্প করছে ওয়ানাইজা, মুরাদ আর ফাতেমা। আমার খুব অস্বস্তি লাগল, কারণ ঘুম জিনিসটা একান্ত নিজস্ব। আমি ঘুমিয়ে আছি আর সবাই আমার ঘুমন্ত ভঙ্গিটা দেখছে, ব্যাপারটা আমার কাছে খুব অশ্লীল মনে হয়।

'আমাকে জাগালেই পারতে,' ওয়ানাইজাকে বললাম আমি। বিছানায় উঠে বসলাম।

'মনে হচ্ছিল তোমার ঘুম প্রয়োজন,' উত্তর দিল ওয়ানাইজা। 'খুব টায়ার্ড লাগছিল তোমাকে।'

ফাতেমা বলল, 'ভাইয়া, টেবিলে নাশতা দেয়া হয়েছে। সবাই ওয়েট করছি আপনার জন্য। আপনি ফ্রেশ হয়ে নিন। আমরা নাশতা করে উত্তরা গণভবন দেখতে যাব।'

'গুড আইডিয়া,' আমি বললাম। 'আমাকে দশ মিনিট সময় দাও।'

ফাতেমা বলল, 'দশ মিনিট না, পুরো আধঘণ্টা সময় দেয়া হলো আপনাকে। আমরা ওখানেই লাঞ্চ করব।'

নাশতা খেতে-খেতে মুরাদকে বললাম, 'মুরাদ, নাশতা সেরে চল একটু ছাদে যাই। তারপর বেড়াতে যাব।'

মুরাদ বলল, 'ভাইয়া, ছাদে কালকের আগে যাওয়া যাবে না। ছাদের চাবি ইমান আলীর কাছে থাকে। আমাদের কেয়ার টেকার। কয়েকদিন আগে দেশে গেছে। কাল সকালেই চলে আসবে।'

আমি একটু চমকালেও নিজেকে সামলে নিলাম। বললাম,' নিশ্চয় সিঁড়ির দরজা খোলা আছে।'

মুরাদ বলল, 'না। আমি সকালেও চেক করেছি। তালা মারা।'

ফাতেমা বলল, 'তালা মারা তো কী হয়েছে? ভাইয়া ছাদে যেতে চাচ্ছেন, তুমি চাবিওয়ালাকে ডাক দাও। তালা খুলে আমরা ছাদে যাব। একঘণ্টা দেরি হলে এমন কিছু হবে না।'

শীর্ণ চেহারার চাবিওয়ালাকে ডাকা হলো। একটা তার ঢুকিয়েই খুলে ফেলল তালা। ওয়ানাইজা বলল, 'তোমরা ছাদে যাও, আমি আর ফাতেমা রেডি হয়ে নিই।'

মুরাদকে নিয়ে আমি ছাদে গেলাম। রাতে যেখানে চেয়ার রেখেছিলাম, সেখানেই আছে। আমার চেয়ারের পাশে আরেকটি চেয়ার। ওই চেয়ারে দুটো কাপ রয়েছে। কাপের মধ্যে চায়ের অবশিষ্টাংশ। একটি কাপের কিনারে গোলাপি লিপস্টিকের দাগ। বুঝলাম, গতরাতের ব্যাপারগুলো স্বপ্ন ছিল না। ঝট করে পুকুরের ওপারের বাড়িটার দিকে তাকালাম। শূন্য ছাদ। চেয়ার-টেবিলের লেশ মাত্র নেই। আমার মনের অবস্থা বুঝতে দিলাম না

মুরাদকে। শুধু বললাম, 'ওই বাড়িটা সম্পর্কে কী জানিস তুই?' মুরাদ তাকাল ওই দিকে। বলল, 'সেরকম কিছু জানি না, ভাইয়া। শুধু জানি ওটা একটা পোড়োবাড়ি।'

'বাড়িটাকে কখনও ভালমত খেয়াল করেছিস?' আমি বাড়িটার দিকে নজর রেখেই জিজ্ঞেস করলাম।

মুরাদ বলল, 'যে বাড়িতে লোকজন থাকে না, সে বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকার কী আছে?'

আমি কিছুটা আনমনে বললাম, 'জনশূন্যবাড়ি কখনও নিরাপদ হয় না। ওই বাড়িতে কোনও সমস্যা আছে।'

মুরাদ বলল, 'ভাইয়া, আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।'

আমি বললাম, 'না বোঝাই ভাল। তুই কি ওই বাড়ির ছাদ কখনও ভাল করে খেয়াল করেছিস?'

মুরাদ বলল, 'কেন বলুন তো?'

আমি বললাম, 'ছাদটা পুরাপুরি খালি।'

মুরাদ বলল, 'ছাদ খালি তাতে কী?'

আমি বললাম, 'ওখানে কখনও বিশাল টেবিল আর অনেকগুলো চেয়ার দেখেছিস?'

মুরাদ বলল, 'আমি ওইভাবে কখনও লক্ষ করিনি। তবে মনে হয় দেখিনি। আর ওই তো দেখা যায় ছাদের দরজা বন্ধ। মনে হয় বন্ধই থাকে।'

আমি বললাম, 'বাড়িটাতে ঢোকার কোনো ব্যবস্থা করা যায়?'

মুরাদ বলল, 'আব্বুকে বললে তিনি ব্যবস্থা করতে পারবেন। চেয়ারম্যান সাহেব আব্বুর কথা শোনেন।'

আমি বললাম, 'তা হলে খালুজানকে বলতে হবে। আমি এই বাড়ির রহস্য উন্মোচন না করে ঢাকা ফিরব না।'

মুরাদ বলল, 'আমি এতদিনেও ওই বাড়ির কোনো রহস্য পেলাম না, আর আপনি একদিনেই বাড়িটাতে রহস্যের সন্ধান পেলেন? মানুষ শুনলে হাসবে। ওখানে কোনও সন্ত্রাসী লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা নেই।'

আমি কিছুটা গম্ভীর হয়ে বললাম, 'মুরাদ, আমি সন্ত্রাসীদের কথা বলছি না। আমি অন্য কিছু ভাবছি। তোকে ভয় পাওয়ানো আমার উদ্দেশ্য না।

আমি শুধু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইছি, ওখানে কারা মিটিং করে?'

মুরাদের মুখ কিছুটা ঝুলে পড়ল। বলল, 'মিটিং করে মানে? কারা, কোথায় মিটিং করে?'

আমি বললাম, 'বাদ দে। চল, ওদের বোধহয় সাজগোজ করা শেষ।' আমরা তিনতলা নেমে এলাম।

দরজার বাইরে তিনটে ব্যাগ রাখা। ঘরের ভেতর থেকেই ওয়ানাইজা চেঁচিয়ে বলল, 'ব্যাগ নিয়ে তোমরা নীচে যাও। আমি আর ফাতেমা আসছি।'

মুরাদ আমাকে ব্যাগ তুলতেই দেবে না। তবু জোর করে একটি নিলাম। ও নিল বাকি দুটি। নীচে মাইক্রোবাসে উঠলাম। পাঁচ মিনিট পর ফাতেমা ও তার পিছু-পিছু ওয়ানাইজা নেমে এল। আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম ওয়ানাইজার দিকে। গতরাতে এই শাড়িটাই আমি দেখেছি। সঙ্গে সবুজ ব্লাউজ। ওরা দু'জন মাইক্রোবাসে উঠল। আমি কিছু বলার আগে ওয়ানাইজা বলল, 'শাড়িটা ফাতেমা গিফট করেছে। আমি নিতে চাচ্ছিলাম না। শাড়িটা সুন্দর না?'

আমি অস্ফুট স্বরে বললাম, 'ব্লাউজটা নীল হলে বেশি মানাত।'

ওয়ানাইজা বলল, 'কেন? খ্যাত খ্যাত লাগছে?'

আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিল। সারাটা পথ আমি কোনও কথা বললাম না।

উত্তরা গণভবন ঘুরলাম। ওখান থেকে গেলাম রানীভবন। সারাদিন ঘুরেই কাটালাম। ফিরলাম সন্ধ্যার পর। আজ ইলেকট্রিসিটি নেই। শুনলাম কোথায় যেন বিকেলে ট্রান্সফরমার বার্স্ট হয়েছে। না ঠিক করা পর্যন্ত ইলেকট্রিসিটি আসবে না। অবশ্য গরম তেমন নেই। মুরাদের বাবা বিশাল চিতল মাছ এনেছেন। রাতে এটাই রান্না হবে। আমরা ঘরে বসে গল্প করতে লাগলাম।

মুরাদের বাবা বললেন, 'তোমার জন্য সুখবর আছে, কল্লোল। চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে আমার কথা হয়েছে। উনি সকালে আসবেন। ওই বাড়িটা তুমি দেখতে পারবে।'

'থ্যাঙ্কস, চাচা,' আমি বললাম। 'আপনি কখনও ওই বাড়িতে ঢুকেছেন?'

'অনেক আগে একবার ঢুকেছি। কিন্তু দেখার মত কিছু নেই। সম্ভবত বাড়ির বাসিন্দারা চলে যাবার সময় সবকিছু ঝেড়ে-পুছে নিয়ে চলে গিয়েছিল। শুধু কিছু পুরান পেইন্টিং আছে। তবে সাবধানে ঢুকো। সাপ-খোপের আড্ডা থাকা বিচিত্র নয়। সব পোড়োবাড়িই সাপের আস্তানা।'

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে করতে রাত এগারোটা বেজে গেল। ইলেকট্রিসিটি আসেনি। মুরাদের বাবা বললেন, 'এটা তো আর ঢাকা না যে ট্রান্সফরমার বার্স্ট হবার সাথে-সাথে কাজ শুরু হবে। কালকের আগে কাজ শুরু করবে বলে মনে হচ্ছে না।'

মোমবাতির আলোয় এক অদ্ভুত আলো-আঁধারি পরিবেশ তৈরি হয়েছে ঘরে। জানালা দিয়ে ঢুকছে ঠাণ্ডা হাওয়া। আগস্টের গরম ভাব নেই। তবে মাঝে-মাঝে মেঘ জমলেও বৃষ্টির দেখা মিলল না।

আমরা গল্প করতে লাগলাম। মুরাদের বাবা জানতে চাইলেন, আমরা পতিসর ঘুরতে যাব কি না। রবীন্দ্রনাথের অনেক স্মৃতি রয়েছে ওখানে। নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত স্কুল রয়েছে। রয়েছে তার জমিদারি। যদি যাই তা হলে পরশু সকালে তিনি ব্যবস্থা করবেন। দু-ভাবে যাওয়া যায়। বাসে রাস্তা দিয়ে এবং ট্রলারে নদীপথে। নদীপথে বেশি সময় লাগলেও জার্নিটা খুব চমকপ্রদ ও উপভোগ্য হবে। আমাদের যেতে হবে আত্রাই নদী দিয়ে। এই নদী নিয়েই রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা রয়েছে, 'আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।' আমি নদীপথে যাবার পক্ষে মত দিলাম। অন্যরাও সমর্থন করল। রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আমাদের গল্প চলল। তারপর চলে গেল সবাই। আমি আর ওয়ানাইজা দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম।

মোমবাতি ক্রমশ ক্ষয় হচ্ছে। জানালার পর্দা সরানো। নরম জ্যোৎস্না ঢুকছে ঘরে। চারদিকে সুনশান নিঃস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে কোনও রাতজাগা পাখি। ওয়ানাইজা শুয়ে-শুয়ে গল্পের বই পড়ছে। আমি ঘুমানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু ঘুম আসছে না। এক সময় মোমবাতি শেষ হয়ে নিভে গেল। পাশ ফিরল ওয়ানাইজা। আমিও কেমন উসখুস করছি। খুব টানছে ওই বাড়িটা আমাকে। খুব ইচ্ছে করছে বারান্দায় গিয়ে দেখতে...

আমি মৃদু স্বরে ওয়ানাইজাকে ডাক দিলাম। কোনও উত্তর এল না।

বুঝলাম ঘুমিয়ে পড়েছে সে। আমি জানালার দিকে তাকালাম। পরিষ্কার আকাশ দেখা যাচ্ছে। দূরে মিটমিট জ্বলছে হাজার নক্ষত্র। আমি খুব ধীরে বিছানা থেকে নামলাম। কোনও শব্দ না করে দরজা খুলে বারান্দায় এলাম। তাকালাম পুকুরের ওপারের ওই বাড়িটার দিকে এবং ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। না, আমি স্বপ্ন দেখছি না, কিংবা এটা কোনও কল্পনা নয়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বাড়ির ছাদটা। সেই লম্বা টেবিল, অনেকগুলো চেয়ার। তবে কোনও চেয়ার খালি নেই। প্রত্যেকটা চেয়ারে একজন করে মানুষ বসা। আর কোনার চেয়ারটায় বসা একজন রমণী। মনে হলো ওরা সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘাড় ঘুরিয়ে সবাই দেখছে আমাকে। আমি সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছি। লোকগুলো ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল। সারি বেঁধে এগিয়ে এল সামনে। ফকফকা চাঁদের আলোয় ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি। যেন এক একজন উঠে এসেছে নরক থেকে। ভাবলেশহীন চেহারা। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। সবাই একই রকম লম্বা। স্বাস্থ্যও একই রকম। শুধু মেয়েটার চেহারা অন্যরকম। অদ্ভুত সুন্দরী সে। কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে চুল। লাল টুকটুকে ঠোঁট। মনে হলো আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

পুরো ব্যাপারটাই কি আমার কল্পনা? একবার দ্বিধা জাগল মনে। চোখ দুটো ডলে নিয়ে আবার তাকালাম। লোকগুলো তখনও দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দিলাম। মনের মধ্যে ঝড় বয়ে চলেছে। সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না আমি কি সত্যি সত্যি এসব দেখছি, নাকি পুরোটাই কল্পনা! কিছু কিছু মানসিক রোগী কল্পনাকে সত্য বলে ধরে নেয়। আমার জানা মতে এক লোক নিজের ছায়াকে শত্রু ভেবে ছুরি দিয়ে কোপাত। আমারও কি মানসিক বিচ্যুতি ঘটছে? ওয়ানাইজাকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেলাম। পুরো ব্যাপারটাই আমি নিজে সামলাব, ভাবলাম।

শুয়ে পড়লাম ওয়ানাইজার পাশে। আজ রাতে বোধহয় আর ইলেকট্রিসিটির দেখা পাওয়া যাবে না। মোমবাতিও শেষ। শুধু জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় যা দেখা যাচ্ছে। চোখ বুজে ব্যাপারটা ভাবতে লাগলাম আমি। আমি কি সত্যি ওগুলো দেখছি, নাকি নিতান্তই মনের ভুল? আর আমি একাই কেন দৃশ্যগুলো দেখছি? ওয়ানাইজা তো দেখেনি, হয়তো আগে আগে ঘুমিয়ে পড়ার কারণে হতে পারে। কিন্তু এ বাড়ির বাসিন্দারা?

তারা তো কখনও এরকম দৃশ্য দেখেনি? আমি কি তবে পুরানো একটি বাড়ি দেখে মনের মধ্যে রচনা করেছি কল্পনার ফানুস?

অনেকক্ষণ কেটে গেল। ঘুমের চিহ্নমাত্র নেই চোখে। মনে-মনে যুক্তিও খাড়া করছি। কিন্তু সব আমার চোখের ভুল এমনটি পুরোপুরি ভাবতেও পারছি না। আবার নামলাম বিছানা থেকে। সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে দরজা খুলে বারান্দায় এলাম। তাকালাম সামনে।

লোকগুলো চেয়ারে বসে আছে। সবার সামনে প্লেট রাখা। খাচ্ছে তারা। মহিলার সামনে বড় একটি ডিশ। সে ডিশ থেকে তুলে তুলে খাচ্ছে। একাগ্রচিত্তে তারা খেয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে ভীষণ ক্ষুধার্ত। তিনজন লোক দেখভাল করছে। পরনে সাদা এপ্রোন। দৌড়ে দৌড়ে খাবার তুলে দিচ্ছে একেকজনের প্লেটে। আমি সিগারেট না ধরিয়েই ঘরে ফিরে এলাম।

সকাল দশটার দিকে চেয়ারম্যান সাহেব এলেন। একসাথে নাশতা করলাম আমরা। তারপর চা খেয়ে আমি ও মুরাদ চেয়ারম্যান সাহেবকে নিয়ে পুকুরের ওপারের বাড়িটির দিকে গেলাম। ওয়ানাইজা আর ফাতেমা আমাদের সাথে যেতে রাজি হলো না। বলল, ওই বাড়ি নিয়ে তাদের কোনও আগ্রহ নেই। তবে এটাও বলল যে, আমরা যেন তাড়াতাড়ি ফিরে আসি। কারণ, আমরা ফিরলেই নাটোর সিভিল সার্জনের অফিসে বেড়াতে যাব।

চেয়ারম্যান সাহেব সদর দরজার তালা খুললেন। ভেতরে ঢুকতেই ভাপসা গন্ধ নাকে বাড়ি মারল। বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু ভেতরে দেখলাম অনেকগুলো ঘর। লোহার সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। সব ঘর প্রায় অন্ধকার। আমার হাতে একটি টর্চ ধরিয়ে দিল মুরাদ। বলল, 'ভাইয়া, এটা জ্বালিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখুন। আমরা বৈঠকখানায় বসছি।'

সমস্ত ঘরে পুরানো আসবাবপত্র ছাড়া আর তেমন কিছু নেই। তবে আমার কৌতূহল ছাদটাকে ঘিরে। রাতের বেলা চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজানো থাকে, আর দিনে থাকে শূন্য—ব্যাপারটি কেমন যেন।

দোতলায় উঠেই আমি কিছুটা বিস্মিত হলাম। বিশাল হলঘর। কিন্তু কোথাও ধুলোবালির চিহ্নমাত্র নেই। ঝকঝকে তকতকে। মনে হলো নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। হলঘরের দেয়ালে বাঁধাই করা সব ছবি। বোঝা যাচ্ছে, এক সময় এ বাড়ির বাসিন্দা ছিল তারা। গুণলাম, মোট পনেরোটা।

সব কটা পুরুষের ছবি। হলঘর ছেড়ে পাশের একটি ঘরে ঢুকলাম। কেমন অস্বস্তি লাগল আমার। পুরো অন্ধকার ঘর। টর্চের আলো ফেলতেই মুখ থেকে আমার গোঙানির শব্দ বের হলো। দেয়ালে বিশাল এক ছবি টানানো। দারুণ সুন্দরী এক মহিলার ছবি। যেন জীবন্ত। সরাসরি তাকিয়ে আছে আমার দিকে। লাল টুকটুকে ঠোঁট। খাড়া নাক। চোখ দুটো আশ্চর্য সুন্দর। ছবির নীচে ইংরেজিতে লেখা-*রমা সেন। ১০ অক্টোবর ১৮২১।*

এত পুরানো বাড়ি এটা? আমার শরীরের লোম খাড়া হয়ে গেল। চকিতে মনে হলো এই রুমে আমি একা নই, আরও কেউ রয়েছে। আমার পেছনে নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলাম। ঝট করে আলো ফেললাম সেদিকে। একটা ইঁদুর দৌড়ে গেল। রুম থেকে বের হয়ে এলাম।

কেন জানি স্নায়ুর ওপর খুব চাপ অনুভব করছি। একবার ভাবলাম চেয়ারম্যান সাহেব ও মুরাদকে ডেকে আনি। তিনজনে মিলে ঘুরে দেখলে ভাল হত। কিন্তু আবার ভাবনাটা দূর করলাম মন থেকে। আমার তো ভয় পাবার কোনও কারণ নেই, তা হলে ওদের ডাকব কেন? আমি ছাদে ওঠার সিঁড়ি খুঁজতে লাগলাম। পেয়েও গেলাম একটু পরে। না, ছাদে কোনও টেবিল চেয়ার নেই। পুরা ফাঁকা ছাদ। তবে কি রাতে যা দেখেছি সব মিথ্যে ছিল? আমি ছাদটা ভাল করে ঘুরলাম। অনেক রোদ এখানে। হঠাৎ মেঝেতে কালচে কী যেন চোখে পড়ল। ঝুঁকে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখলাম একটু ভেজা। পিচ্ছিল। নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকলাম। বমি এল আমার। কটু, বীভৎস, পচা গন্ধ। আমি প্যান্টে আঙুল মুছে উঠে দাঁড়ালাম, আর তখুনি চোখে পড়ল ছাদের কোনায় ময়লা একটা কালো চাদর দিয়ে কী যেন ঢাকা। আমি সামনে এগোলাম। চাদরটা টান দিয়ে সরালাম। বিশাল এক ডেকচি। ঢাকনা দেয়া। হাত দিয়ে টেনে ঢাকনা সরিয়েই চিৎকার দিয়ে উঠলাম। ডেকচির মধ্যে মানুষের হাত ও পায়ের কাটা অংশ। দেখেই মনে হলো খুব বেশি আগের নয়। তবে হাত ও পায়ের কাটা অংশ থেকে কিছু কিছু জায়গায় খাবলে মাংস তুলে নেয়া হয়েছে। মুহূর্তে আমি বুঝে ফেললাম রাতে এখানে কীসের ভোজ হয়েছিল এবং মানুষগুলোই বা কারা ছিল। আমি দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে দৌড় দিলাম। লোহার সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পা পিছলে গেল। ধপ করে পড়লাম নরম কিছুর ওপর। হাত থেকে টর্চটা কোথায় যেন ছিটকে পড়ল। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে বসতে গেলাম। পচা

গন্ধে বমি এল। মনে হলো কাদার মধ্যে আটকা পড়েছি। হাত দিয়ে জায়গাটা অনুভব করতে গিয়ে স্থির হয়ে গেলাম। বুঝলাম এগুলো কী।

মুরাদকে হাঁক ছেড়ে ডাকলাম। কোথাও কারও সাড়া নেই।

একটি মৃত্যুকূপে আটকা পড়েছি আমি!

কাদের যেন ফিসফিস শব্দ শুনছি।

শব্দের উৎস লক্ষ্য করে এগোতে লাগলাম। দেয়াল হাতে ঠেকল। দরজাও পেয়ে গেলাম। টান দিলাম জোরে। বাইরে থেকে বন্ধ। এক চুলও নড়ল না।

'মুরাদ! চেয়ারম্যান সাহেব!' আমি জোরে চিৎকার দিলাম।

কারও কোনও উত্তর পেলাম না। ওরা কি আমাকে রেখেই চলে গেছে? নাকি আমি বাড়িটার অন্যপাশে চলে এসেছি?

দরজার ওপাশে ফিসফিস শব্দ বেড়েই চলল। ভারি কিছু সরানোর শব্দ পেলাম। কান পাতলাম দরজায়। অনেকগুলো পায়ের শব্দ। থালা-বাসনের টুংটাং। মনে হলো কেউ একজন দৌড়ে গেল।

ওপাশে কি বড় কোনও টেবিলে চেয়ারগুলো সাজানো হচ্ছে? আর, টেবিলে রাখা হচ্ছে প্লেটগুলো? আমাকে কখন নেয়া হবে ওখানে? আমি কি খুব-খুব বেশি ব্যথা পাব!!

মিজানুর রহমান কল্লোল

রিকদানুস বাদশা

জালাল কবিরাজ চোখ ছোট করে তাকাল জাফরের দিকে। তার জালালী মেজাজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। কিন্তু নিজেকে সংযত করে নিল সে। জাফর তার বহু দিনের বিশ্বস্ত সাগরেদ। ভীষণ ক্লান্ত-অবসন্ন মনে হচ্ছে তাকে।

'খবর কী?'

'খবর খুব খারাপ, হুজুর!' ক্লান্ত স্বরে জবাব দিল জাফর।

'খারাপ মানে?'

'হাজারে হাজারে জিন ঘিরা রাখছে বাড়িডারে। আমি কিছুই করবার পারি নাই। গিয়াই অবস্থা দেইখা আপনার কথা কইয়া কুনু রকমে ফির‍্যা আইছি।'

'হাজারে হাজারে জিন!'

'হ হুজুর! লক্ষণ শুভ না।'

'আরও নাকি কেউ কেউ গেছিলো? হ্যাগোর খবর কী?'

'জি, উস্তাদ, উত্তরার মন্টু কবিরাজ, ডাশমারির জগন্নাথ ওঝা, কালীগঞ্জের আলাল হেকিম, কেউ বাদ নাই। কিন্তু সবাই ফির‍্যা গ্যাছে। জগন্নাথ ওঝা নাকি তুকতাক শুরু কইরা মরতে বইছিল। হের নাক দিয়া রক্ত দেখা দিছিলো। শেষে তুকতাক বন্ধ কইরা ফির‍্যা গ্যাছে। অন্য দুইজন নাকি বেভুলা হইয়া গ্যাছে। কিছু মনে রাখতে পারে না। বাড়ির পথ ছাইড়া উল্ডা দিকে রওনা দিছিলো। লোকজন রাস্তা দেখাইয়া বাড়ি পৌঁছাইয়া দিছে। আমি যাইয়াই দেখি পুরা বাড়ি ঘেরাউয়ের মইদ্যে। তেমন কিছু করনের সাহস হইলো না। কইলাম, 'উস্তাদরে নিয়া পরে আমু।' ক্লান্ত স্বরে ঘটনা বর্ণনা করল জাফর।

'ডর পাইছস?'

'জি, হুজুর!' অকপটে স্বীকার করল জাফর।

'তাবিজ-তুমার ঠিকমত নিছিলি তো? শরীল বান্ধনে ভুল করস নাই তো?'

'না, হুজুর, সবই ঠিকমত করছি। কোন ভুল করি নাই।'

'ঠিক আছে, অখন বাড়িতে যাইয়া বিশ্রাম ল। পরে সংবাদ দিমু।'

'আপনে ওইহানে যাইবেননি?' শঙ্কা প্রকাশ পায় জাফরের কণ্ঠে।

বিরক্ত হয় জালাল কবিরাজ।

'হ, যামু। হগলে যা পারে নাই হেডাই তো আমার পারন লাগবো। যা অখন কথা বাড়াইছ না।'

জাফর চলে গেল। জালাল কবিরাজ তার গমন পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। জাফরের কথায় তার অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। গত বারোটা বছর জাফর লেগে রয়েছে তার সাথে। তার কথায় অতিরঞ্জিত কিছু থাকতে পারে, তবে সে তার কাছে মিথ্যে বলবে না। নিজ হাতে জাফরকে গড়ে তুলেছে কবিরাজ। সুখ-দুখের ভাগি হয়ে রয়েছে দু'জন।

জাফরকে তদন্ত করতে পাঠিয়েছিল সে। অনেক দিন থেকেই কানে আসছে তার, শ্যামপুরের মেয়েটাকে জিনেরা খুবই উৎপাত করছে। বিয়ে দিতে পারছে না তার বাবা। ভয়ঙ্কর জিন। কেউই নাকি জিন তাড়াতে গিয়ে সফল হতে পারছে না। উল্টো বিভিন্ন বিপদে পড়ছে। আজ জাফরের কথায় ঘটনার সত্যতা মিলল।

জীবনে বহু জিন তাড়িয়েছে কবিরাজ। কখনও সামান্য ঝাড়-ফুঁকেই কাজ হয়েছে। আবার অনেক সময় লাঠি ঝাঁটাও ব্যবহার করতে হয়েছে। লোকে বলে তাকে দেখলেই নাকি জিন অর্ধেক পালিয়ে যায়। বাকি অর্ধেক পালায় তার কাজ শুরু করার পর। তবে সব ক্ষেত্রেই যে পুরোপুরি সফল হয়েছে, তাও নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তেমন কিছু করতে পারেনি। সেক্ষেত্রে কৌশলে অন্য কিছুর ওপর দোষ চাপিয়ে দিতে হয়েছে। মানসিক রোগ, ফিট ব্যামো, মাথা খারাপ ইত্যাদি বলে এটা যে জিন বিষয়ক চিকিৎসা নয়, তা জানিয়ে দিয়েছে সে। তবে এধরনের ঘটনা তার কবিরাজ জীবনের প্রথম দিকে ঘটেছে বেশি। পরবর্তীতে সে রোগী নির্ণয়ে সতর্ক হয়ে যায়। নিশ্চিত না হয়ে জিন তাড়ানোয় হাত বাড়ায় না সে। এ ব্যাপারে সহযোগিতা করে জাফর।

বর্তমান পরিস্থিতিটা জালাল কবিরাজের কিছুটা নীতি বিরুদ্ধ। জাফরের বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে না যাওয়াই তার জন্য ভাল। কিন্তু যেখানে অন্যান্য বড় বড় ওঝা আর কবিরাজ ব্যর্থ, সেখানে তার জন্য রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। সে যদি সফল হতে পারে তা হলে সেটাই হবে তার পরবর্তী জীবনের সঞ্চয়।

এমন সুযোগ একটা মানুষের জীবনে কমই আসে।

ধীর পায়ে নিজের খাস কামরায় প্রবেশ করল জালাল কবিরাজ। খাটের নীচ থেকে টেনে বের করল বিশাল সাইজের টিনের বাক্সটা। বহু ব্যবহৃত তেল চকচকে তালাটা খুলে ভেতরে উঁকি দিল সে। পরিপাটি করে সাজানো বাক্সটিতে বহু পূর্বে সুতো খুলে যাওয়া তুকতাকের কিতাব, মাটির ছোট্ট হাঁড়ি, সাত কুয়ার পানি ভরা বোতল, ধূপ-ধুনা, আগরবাতি, পবিত্র মাটি, হাড়গোড়, একটি জং ধরা চাকু, লাল-সাদা কাপড়, তাবিজ, আংটি, পাথর এসব আছে। গাছের শিকড়, শুকনো পাতা ইত্যাদি সযত্নে সাজানো।

প্রস্তুতি নিতে শুরু করল জালাল কবিরাজ।

রাতে বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি করছিল জাফর। ঘুমে চোখের পাতা ভারী হয়ে আছে। কিন্তু ঘুমাতে পারছে না সে। প্রায় সাত মাইল দূরে শ্যামপুরে পায়ে হেঁটে যাওয়া-আসা করেছে জাফর। শরীর ক্লান্ত। এতক্ষণে ঘুমে ঢলে পড়া স্বাভাবিক ছিল তার জন্য। কিন্তু ঘুম আসছে না। মাথা দপ দপ করছে, শরীর যন্ত্রণা করছে, অযথা ক্রোধ সৃষ্টি হচ্ছে মনে। রাত বাড়ার সাথে সাথে অস্থিরতাও বাড়তে থাকল তার। পাশেই স্ত্রী রাবেয়া গভীর ঘুমে অচেতন।

শ্যামপুর থেকে ফিরে আসার পর থেকেই চিন্তায় ভারী হয়ে আছে জাফরের মাথা। শ্যামপুরের মেয়েটাকে ভয়ঙ্কর জিন আছর করে আছে। সেখানে পা দেয়ার সাথে সাথে তার শরীর ভারী হয়ে গিয়েছিল। যখন মেয়েটার সামনে গেল তখন তো তার মাথাটা পুরোপুরি শূন্য হয়ে গিয়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ সে সেখানে ছিল। কিন্তু কার্যকরী কোন কিছুই করেনি সে। ওস্তাদকে নিয়ে পরে আসার কথা বলে ফিরে এসেছে।

মেয়েটার চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে জাফরের মাথায়। চিন্তাটা যেন একটা কঠিন বোঝা হয়ে চেপে বসে আছে তার ওপর। সারা দিন সে অনেক বার চেষ্টা করেছে চিন্তাটা দূর করতে। কিন্তু কিছুতেই পারছে না। বরং আরও বেশি চেপে ধরেছে তাকে। মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে মোচড় অনুভব করছে সে। মোচড়টা বিস্মিত করছে জাফরকে। মোচড়টা তার সারা শরীরে একটা ভাল লাগা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

রাবেয়া নড়ে উঠল। হঠাৎ তিরিক্ষি হয়ে উঠল জাফরের মেজাজ। 'বেকুব মাইয়ালোক,' মনে মনে ভাবে সে। 'আমার চোখে ঘুম নাই, আর তিনি

নিশ্চিন্ত আরামের ঘুম মারতেছেন। মরলেও টের পাইবো না মাইয়ালোক!'

হঠাৎ তীব্র বিতৃষ্ণা অনুভব করল সে। ঝটকা মেরে সরিয়ে দিল এই মাত্র বুকের ওপর এসে পড়া রাবেয়ার হাতটি। রাবেয়ার ঘুম খুব গভীর ছিল না। সে টের পেল জাফরের আচরণ। নিঃশব্দে পাশ ফিরল সে। তারপর আবার ঘুমিয়ে গেল।

জাফরকে নিয়ে জালাল কবিরাজ ভর দুপুরে শ্যামপুরে এসে পৌঁছুল। দু'জনই ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। মাস্টারপাড়া পর্যন্ত ভ্যানে চড়ে এসেছে তারা। বাকি তিন মাইল রাস্তার বেহাল দশার কারণে হাঁটা ছাড়া উপায় ছিল না। হাঁটার অভ্যেস আছে দু'জনেরই। তবু বাতাসহীন গুমোট গরমে ঘামে ভিজে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তারা।

গাঁয়ের অনেকের কাছেই জালাল কবিরাজ পরিচিত। তাদের দু'একজনের সাথে দেখা হয়ে গেল পথে। সালাম বিনিময় আর কুশল জিজ্ঞাসা করে চলে গেল যে-যার পথে। গাঁয়ের অর্ধ ন্যাংটো ক্ষুদে ছেলে-পিলের দল থেকে দু'জনকে ডেকে নিল জাফর।

বাড়িটির পথ ইতিমধ্যে জাফরের কাছে পরিচিত। সে ওস্তাদকে পথ দেখিয়ে গাঁয়ের শেষ মাথায় এসে উপস্থিত হলো। বাঁশের চাটাই দিয়ে দেয়াল তৈরি করা বাড়িটির সামনে বিশাল দু'টো তালগাছ নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিঝুম বাড়িটির সামনে দাঁড়িয়ে জালাল কবিরাজের ভ্রু কুঁচকে উঠল। জিন-ভূতের আদর্শ জায়গা—মনে মনে ভাবল সে।

সঙ্গে আসা ছোট ছেলেদের একজনকে জাফর বাড়ির ভেতরে পাঠিয়ে দিল। অল্পক্ষণের মধ্যে মাঝ বয়সী সরল চেহারার এক লোক এসে হাজির হলো তাদের সামনে।

'আসসালামুআলাইকুম।' সালাম জানাল লোকটি। তারপর হঠাৎ জাফরকে চিনতে পারল সে, 'আপনে না কাল একবার আইছিলেন?'

'জে-জে চাচা, আইজ আমার ওস্তাদরে আনছি।' জানাল জাফর।

'আসেন-আসেন, ভিতরে আসেন।'

পথ দেখিয়ে দু'জনকে ভেতর বাড়িতে নিয়ে চলল লোকটি।

'উনি মাইয়ার আব্বা,' জালাল কবিরাজকে লোকটির পরিচয় জানাল জাফর।

'আচ্ছা,' জবাব দিল জালাল কবিরাজ।

বড় উঠোন পেরিয়ে বাঁশের চাটাইয়ের বেশ বড় বাড়ি। ওপরে দোচালা টিনের ছাদ। ভেতরে চাটাইয়ের দেয়াল দিয়ে কয়েকটি ঘর তৈরি করা হয়েছে। দু'জনকে নিয়ে সামনের ঘরে ঢুকল লোকটি। একটি খাটে ফুলতোলা চাদর বিছানো। খাটের সাথে বহু পুরোনো টেবিল আর দু'টি চেয়ার। এভাবেই ঘরটিকে বৈঠকখানা বানানো হয়েছে। ঘরে ঢুকেই ব্যস্ত হয়ে গামছা দিয়ে চেয়ারগুলো ঝেড়ে-পুঁছে জালাল কবিরাজকে বসতে দিল সে। জাফর বসল খাটে।

'আপনেরা বসেন। আমি আসতেছি।'

ভেতর ঘরের দিকে রওনা দিল লোকটি। কিন্তু বাধা দিল জালাল কবিরাজ, 'আপনে ব্যস্ত হইবেন না মিয়া সাব। আগে কাজ, পরে অন্য কিছু।'

জালাল কবিরাজের কথায় কান দিল না লোকটি, 'হুজুর! গরিবের বাড়িতে আইছেন। সামান্য এক গ্লাস পানিও কি মুখে দিবেন না?'

'হ, পানি খাওয়াইতে পারেন। আর কিছু না।' সম্মতি জানাল কবিরাজ।

ভেতর ঘরে চলে গেল লোকটি। জাফর শুকনো মুখে চুপচাপ বসেছিল। তার সারা শরীরে নিদ্রাহীনতা আর পথশ্রমের ক্লান্তি। কিছুটা বিপর্যস্ত সে।

জালাল কবিরাজ ভাবছে সে পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে। তার সারা শরীর বন্ধ করা আছে। সম্ভব হলে এখনি কাজে নেমে যেতে প্রস্তুত সে।

তার ভ্রু কুঁচকে আছে। কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে। জাফর তাকে যে তথ্য দিয়েছিল এখন পর্যন্ত তার কোন আলামতই সে দেখতে পায়নি। ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে। জাফরের বর্ণনা অনুযায়ী পরিস্থিতি ভয়াবহ। অথচ ভয়াবহ তো দূরের কথা, তার মনে হচ্ছে পরিস্থিতি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং তার জন্য মামুলি।

জাফরের দিকে তাকাচ্ছে না কবিরাজ। যেন জাফর এ মুহূর্তে অস্তিত্বহীন। জালাল কবিরাজের জালালী মেজাজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। কিন্তু ধৈর্য ধরে চুপচাপ বসে রইল সে।

পরিচ্ছন্ন ট্রের মধ্যে সুন্দর করে দু'গ্লাস চিনির শরবত আর কয়েকটি বিস্কিট নিয়ে এল মেয়ের বাবা। সযত্নে নিজেই গ্লাস দু'টো ধরিয়ে দিল ওদের হাতে। বিস্কিট খাওয়ার জন্য জোর তাগাদা দিতে লাগল সে। শেষ পর্যন্ত শরবত শেষ করে দু'তিনটি বিস্কিট খেয়ে ফেলল কবিরাজ। তারপর এল

কাজের কথায়, 'মিয়া সাব! আপনের মাইয়ার এই অবস্থা কত দিনের?'

'হুজুর! আমার নাম মতি মিয়া। সবাই এই নামেই ডাকে।' বিনয়ের সাথে জানাল লোকটি।

'আচ্ছা, ঠিক আছে। মতি মিয়া, আপনের মাইয়ার এই অবস্থা কত দিন থেইকা?' পুরনো প্রশ্নে ফিরে গেল কবিরাজ।

'এই ধরেন, হুজুর, হ্যার যখন দশ-বারো বছর, তখন থেইকা।'

'হুঁ, এখন হ্যার বয়স কত?'

'কত আর হইবো, উনিশ-বিশ আর কী।'

'উনিশ-বিশ বছর! বিয়া শাদী দিয়া ফালান না কেন?' কিছুটা আশ্চর্য বোধ করে কবিরাজ। গ্রাম দেশে উনিশ-বিশ বছরের মেয়ে মানে পিতা-মাতার জন্য অনেক বড় বোঝা। গ্রামের মেয়েদের বিয়ে-শাদী হয় তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মতি মিয়া, 'বিয়া দেওনের তো কম চেষ্টা করি নাই, হুজুর। কিন্তু...'

কথা শেষ করল না মতি মিয়া। 'বুঝছি।' সবজান্তার মত মাথা নাড়ল কবিরাজ। 'আচ্ছা, মিয়া সাব আরেকটা কথা জিগাই, আপনের মাইয়ারে কি এমনি এমনি জিনে ধরছে, নাকি এর পিছে কোন ঘটনা আছে? মানে, আমি কইতে চাইতাছি যে, অনেক সময় দেখা যায় কুনু ঘুমন্ত মাইনষের মাথায় আচমকা বাড়ি মারছেন তো হ্যারে জিনে ধইরা বইছে। আসলে আপনের মাইয়ার সুচিকিৎসার লাইগা এই সকল বিষয় জানা থাকন দরকার। এ্যাতে চিকিৎসার সুবিধা হইবো আর কী।'

কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইল মতি মিয়া। জালাল কবিরাজ অপেক্ষায় রইল। সে ভাবনার সুযোগ দিয়েছে মতি মিয়াকে। এই সুযোগে নিজেও ভেবে নিচ্ছে। তার ভাবনাটা জাফরকে নিয়ে। জাফর কি তাকে মিথ্যে বলেছে? কিন্তু তাতে তার লাভ কী? এই মামুলি বিষয়টা জাফর নিজেই সামলাতে পারত। তাতেই বরং তার লাভ ছিল। তার এত দিনের বিশ্বস্ত সাগরেদের এই আচরণটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না সে।

'হুজুর!' মুখ খুলল মতি মিয়া, 'আপনে বহুত বড় কবিরাজ। বহুত হুনছি আপনের নাম-ডাক। আপনের কাছে আমি কিছুই লুকাইতাম না। আমার মাইয়ারে হঠাৎ জিনে ধরছে, নাকি আগে থেইকাই ছিল তা কইতে পারি না।

তয় হ্যার বয়স যখন দশ-বারো বছর হেই সময় উত্তর পাড়ার এক পুলা হ্যারে একলা পাইয়া টাইনা পাট খ্যাতে নিয়া গেছিল। তারপর হ্যার জামা-কাপড় খুলার চেষ্টা করছিল। হেই পুলা আর বাঁচে নাই।'

'বাঁচে নাই মানে! কী হইছিল?'

'আমরা যাইয়া দেখি পুলার গলা দুই ফাঁক করা, আর মাইয়া পাশে বইয়া রইছে।'

'কন কী!'

'হ, এরপর কয় দিন মাইয়া কাউরে চিনত না। শুধু আমারে চিনত। পরে চিকিৎসা করছি। ভালা হইয়া যায়। আবার কয় দিন পর পর কেমুন হইয়া যায়। কাউরে চিনে না। বিয়া-শাদীর কথা কইলে চেহারা বদলাইয়া যায়। যার লগে সম্বন্ধ হয় হ্যার নাম কইয়া দা-বটি শান দেয়। এইডা জিন ছাড়া আর কিছু না, হুজুর।'

শোনার কাজ মোটামুটি শেষ হয়েছে জালাল কবিরাজের।

'আপনে একটু হ্যারে ডাক দেন। আমি নিজে তারে একটু পরখ কইরা দেখি।'

'জে-জে, হ্যারে আনতাছি।'

চলে গেল মতি মিয়া। আবার জাফরকে নিয়ে চিন্তায় পড়ল কবিরাজ। জাফরকে বদলানোর সময় এসেছে। ভাবল সে।

মতি মিয়া এসে ঢুকল ঘরে। সাথে তার মেয়ে।

'এই আমার মাইয়া, আলেয়া।' পরিচয় দিল মতি মিয়া। কিন্তু জালাল কবিরাজের কানে সেই কথা ঢুকল কি না বোঝা গেল না। সে তাকিয়ে রয়েছে আলেয়ার দিকে। হঠাৎ যেন সময় থমকে দাঁড়িয়েছে তার কাছে। তার মনে হলো ঘরের মধ্যে কয়েক হাজার বাতির স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ। সেই আলোর দ্যুতিতে ম্লান হয়ে পড়েছে দিনের আলো। আলেয়ার ভরাট গালের রক্তিমাভা উষার লালিমা ছড়িয়ে আলোটিকে রাঙময় করে তুলেছে। তার গভীর কালো চোখের তারায় জালাল কবিরাজ নিজের সত্তা হারিয়ে বসে রইল। ভুলে গেল স্থান-কাল-পাত্র। বজ্রাহতের মত নিঃশব্দে চেয়ে রইল সে।

'হুজুর! আমার মাইয়ারে কিছু জিগাইবেন কইছিলেন,' মতি মিয়া কণ্ঠের বিরক্তি গোপন করল না।

সম্বিৎ ফিরল জালাল কবিরাজের। কিন্তু কী জিজ্ঞেস করবে কিছুক্ষণ

পেল না সে। আঁতিপাতি করে কিছুক্ষণ স্মৃতিকোঠায় হাতড়িয়ে সেখান থেকে জমিয়ে রাখা প্রশ্নগুলো উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে কোন রকমে বলতে পারল, '... বড় জিন! হাজারে হাজারে জিন!'

'জিন!' মতি মিয়ার কণ্ঠ বেসুরো মনে হলো।

'...ড়া জিনের বাদশার কাম।'

'জিনের বাদশা!'

'... জিনের বাদশা ছাড়া আর কিছু না।'

... পথে নীরবে কেটে গেল অনেকটা সময়। জাফরের প্রতি এখন আর ... ক্ষোভ নেই জালাল কবিরাজের। একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে রয়েছে যেন ...। মাস্টার পাড়ায় এসে ভ্যানে চড়ার পর কিছুটা ঘোর কাটল তার।

'জাফর!'

'জি, হুজুর!' মৃদু স্বরে উত্তর দিল জাফর।

'মাইয়াডারে জিনের দল এক্কেরে ঘিরা রাখছে।'

'জি, হুজুর!'

'এই মাইয়া দিয়া বহুত বড় কাম হইব।'

'জি, হুজুর!' জালাল কবিরাজের কথার মর্ম ধরতে না পেরে আশ্চর্য হলো ...।

... আবার নীরব হয়ে গেল কবিরাজ। বাকি পথ আর কোন কথা হলো না দু'জনের মধ্যে। জাফরের মনটা খচ খচ করছিল। তবে বেশি কথা বলে ...দের বিরাগভাজন হতে চায় না সে। ওস্তাদ এত কাল ধরে তাকে বহু ... ভেদ শিক্ষা দিয়েছে। ওস্তাদের কোপানলে পড়ে সেই ভেদগুলো নষ্ট ... চায় না সে। এগুলো তার জীবনের সঞ্চয়। নিজের অস্থিরতা ওস্তাদের ... চালান করে দেয়ার চেষ্টা করে সে, কিন্তু পুরোপুরি ব্যর্থ হয় এবং শেষ ... গুমরানো একটা ব্যথা অনুভব করতে থাকে বুকের ভিতরে।

... মিয়ার চিন্তার শেষ নেই। মেয়েটার মধ্যে আবার অস্থিরতা লক্ষ করছে ...। বেশ ভালই ছিল কয়টা দিন। কোন সমস্যা ছিল না। ওঝা-কবিরাজেরা ...সছে গেছে। যা হবার তাদেরই হয়েছে। তার মেয়েটা ভালই ছিল। তেমন কোন অস্থিরতাও দেখা যায়নি। কিন্তু গতকাল থেকে আবার অস্থির দে[illegible]

মেয়েটাকে। চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়ছে মতি মিয়ার।

মা-মরা মেয়েটাকে নিয়ে এমনিতে খুব একটা ভাবনা-চিন্তা নেই তার মধ্যে। নিজে থেকেও বিয়ে দিয়ে পরের সংসারে পাঠানোর খুব একটা প্রচেষ্টা চালায়নি সে। বাপ-মেয়ে দু'জনের সংসার কেটে গেছে নির্ঝঞ্ঝাট। জিনে ধরা মেয়ের প্রচার হতে বেশি সময় লাগে না গ্রামে-গঞ্জে। সেই হাওয়া উড়ে যায় অনেক দূর পর্যন্ত। উপযুক্ত পাত্ররা চায় না সেধে পড়ে জিনের সঙ্গে বাস করতে। মতি মিয়ারও তেমন গরজ বোধ হয়নি এতকাল। যে সব পাত্র এসেছে তারা ছিল ঘাটের মরা। কারও বয়স পার, কারও আবার আগের ঘরে ছেলে-পিলে রয়েছে। মতি মিয়ার নিজেরই পছন্দ হয়নি। কিন্তু কুল গাছ থাকলে বাড়িতে ইট-পাটকেল তো পড়বেই। মতি মিয়াও চুপচাপ মেনে নিয়েছে সব। শেষ পর্যন্ত পাত্ররা ভেগে যেতে ভুল করেনি। উগ্র-রণ-রঙ্গিনী নারী মূর্তির হাতের চকচকে দা-বটি যে জিন-ভূতের সরবরাহ তা বুঝতে ভুল করেনি তারা। কিন্তু এখন মতি মিয়ার বয়স হয়েছে।

আলেয়া খুঁটিনাটি কাজ করছিল। কেরোসিন তেলের বোতলটা পড়ে গেল হাত থেকে। দ্রুত তুলতে গিয়ে আঙুলের ধাক্কায় গড়িয়ে এসে পড়ল মতি মিয়ার পায়ের কাছে। মতি মিয়া সযত্নে তুলে নিল বোতলটা।

'মা-রে, তোর কী হইছে?' কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করল সে। জীবনে কখনও সে মেয়ের সাথে উঁচু গলায় কথা বলেনি।

'কিছু হয় নাই বাবা, একটু অস্থির লাগতাছে।' মৃদু স্বরে বলে আলেয়া।

মতি মিয়া কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, 'আমারে কি বলতে অসুবিধা আছে?'

চোখ তুলে তাকাল আলেয়া। বাপ-মেয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আলেয়া চোখ সরিয়ে নিল।

'বাবা! কবিরাজ আমারে বিয়া করবার চায়। হের মতলব ভালা না।'

মতি মিয়া অস্থির হলো না। এ রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন সে আগেও হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি সামালও দিয়েছে। কিন্তু অন্য একটা চিন্তা আচ্ছন্ন করল তাকে।

'হ্যায় বিয়া করবার চাইলেই তো হইবো না। আমি বিয়া না দিলে হ্যায় কী করব?' মেয়েকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে সে।

'বাবা! এই কবিরাজ খুব সাংঘাতিক। সহজে ছাড়ব না।' আলেয়ার

অস্থিরতা মতি মিয়াকে নাড়া দিল।

'হ্যায় যাই চেষ্টা করুক কোন লাভ হইবো না। তুই কুনু চিন্তা করিছ না।'

আলেয়া চুপ রইল। কিন্তু মতি মিয়া তার মেয়ের অস্থিরতা টের পেল ঠিকই।

'মা, আমার তো বয়স হইছে। আর কত দিন বাঁচি ঠিক নাই।'

থেমে গেল মতি মিয়া। আলেয়ার নীরবতা ভাঙল না। সে নীচের দিকে তাকিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝের মাটি খুঁটতে লাগল। অগত্যা মতি মিয়াই শুরু করল আবার, 'আমি মইরা গেলে তোর কী হইবো, মা? কে দেখব তোরে?'

মাথা তুলল আলেয়া। বলল, 'আল্লাহ্ দেখব।'

'আল্লাহ্ তো দেখবই। অহনও তো দেখতাছে। তয় দুনিয়ার হিসাব-নিকাশ আলাদা। এইহানে চলতে ওসিলা লাগে, মা।'

'সবার জন্য ওসিলা লাগে না, বাবা। তুমি কুনু চিন্তা কইরো না।' বাবাকে আশ্বস্ত করল আলেয়া।

ধীর পায়ে আলেয়া সরে গেল মতি মিয়ার সামনে থেকে। মতি মিয়ার চিন্তা মোটেও কমল না। বরং আরও বেড়ে গেল। অনেক দিন পর আবার আলেয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকতা লক্ষ করছে সে।

'জাফর!'

'জি, হুজুর!'

'ব্যবস্থা একটা করন লাগে।'

'কী ব্যবস্থা, হুজুর?'

'মাইয়াডারে ধরতে পারলে বহুত লাভ।'

মনের কথা খোলাসা করল না জালাল কবিরাজ। জাফর চুপ রইল।

'এই মাইয়ার লগে বহুত বড় বড় দেও-দানো জড়াইয়া রইছে। হ্যারে কাবু করতে পারলে দেও-দানো আপোষে আইয়া পড়ব। ভবিষ্যতে আর কুনু চিন্তা করন লাগব না।'

'ক্যামনে কাবু করবেন, হুজুর? দেও-দানো কি ছাইড়া কথা কইবো?' আশংকা প্রকাশ করে জাফর।

'হেইডা আমার চিন্তা। হেইডা লইয়া তোরে ভাবতে হইবো না। তুই শুধু

আমার হুকুম মানবি। পারবি না?'

'পারমু না কেন, হুজুর? এত দিন আপনের নুন খাইছি। আপনে আমার উস্তাদ।'

'কাইল বিয়ানে শ্যামপুরে যাইবি। মাইয়্যার বাপরে কইবি, আগামী শনিবার আমি হ্যার মাইয়ার জিন ছাড়ামু। যোগাড়-যন্ত্র সব কইরা রাখতে কইবি।'

'কী যোগাড়-যন্ত্র?'

'চাইরখান মাটির ঘড়া কিন্যা রাখবো আর বাড়ির চাইর কুণায় চাইরখান গর্ত খুইড়া রাখব। বাকি কাম আমি যাইয়া করমু। জিন কীভাবে ওই মাইয়ার মইদ্যে থাকে দেখুমনে তারপর।'

শ্বাপদের মত জ্বলজ্বল করতে থাকে কবিরাজের দু'চোখ। ভয় পায় জাফর। কবিরাজের এই পদ্ধতিটা নতুন মনে হচ্ছে জাফরের কাছে। অবশ্য এ কারণেই কবিরাজকে ওস্তাদ মানে সে। গত বারোটি বছর প্রতিটি কর্মক্ষেত্রেই নতুন কিছু না কিছু শিখেছে সে। ওস্তাদের কারিগরী আর তার শেখা কোনটাই যেন শেষ হয় না কখনও।

জাফর চলে গেল। কবিরাজ কাজ শুরু করে দিল। এখন তার অনেক কাজ। শনিবারের মধ্যে সব কাজ শেষ করতে হবে। হাতে আছে মাত্র চার দিন। এসব কাজে মোটেও অবহেলা করা যায় না। সামান্য ভুল-ভ্রান্তিতে সীমাহীন ক্ষতির সম্ভাবনা। একটা ব্যর্থতা একজন কবিরাজকে পিছিয়ে দেয় বিশ বছর। অনেক সাধনার ফল নষ্ট হয়ে যায় মুহূর্তের অসতর্কতায়। এ যেন এক জীবন্ত জুয়া খেলা। জিতলে রাজ্য জয়। হারলে ধুলির বুকে আশ্রয়।

জালাল কবিরাজ তার টিনের বাক্স নিয়ে বসল। প্রাচীন কিতাবখানা খুলে সযত্নে উল্টাতে থাকল একের পর এক পৃষ্ঠা। তারপর এক স্থানে এসে স্থির হলো সে। মনের মধ্যে গাঁথতে শুরু করল প্রাচীন লেখাগুলো। কেটে গেল দীর্ঘ দুই ঘণ্টা। কিতাব বন্ধ করে মেশক আর জাফরানের কালি দিয়ে লেখা শুরু করল সে। চিনা মাটির ছোট প্লেটটি বিচিত্র আঁকি-বুকিতে ভরে যেতে লাগল ধীরে ধীরে।

দীর্ঘক্ষণ পর কাজ শেষ হলো কবিরাজের। এখন সে প্রস্তুত। আসন্ন যুদ্ধের সকল হাতিয়ার এখন তার হাতে মওজুদ। প্রয়োজন মত বের করবে আর ব্যবহার করবে।

জাফরের কথা নীরবে শুনল মতি মিয়া। ব্যাপারটা তার কাছেও নতুন মনে হচ্ছে।

'মাটির ঘড়া দিয়া কী হইবো?' জাফরকে প্রশ্ন করল সে।

'মাটির ঘড়ার মইদ্যে সবগুলো জিন ভইরা মাটি চাপা দিব উস্তাদে। জীবনে আর কখনও জিনের উৎপাত হইব না আপনের বংশে।'

'ঠিক আছে দেখুম নে।' গুরুত্বহীন ভাসা ভাসা ভাবে বলে মতি মিয়া।

'দেইখেন সব ঠিক-ঠাক মত কইরেন কিন্তু। ভুল হয় না যেন। উস্তাদে আইয়াই কাম শুরু কইরা দিব।'

'এইগুলা না হইলে অয় না?'

'মাইয়ারে সোন্দর মত বাঁচতে দিবেন না মিয়া সাব? বাপ হইয়া আপনে এই সামান্য কাম করবার পারবেন না?'

জাফর খোঁচা দিল মতি মিয়াকে। নড়েচড়ে বসল মতি মিয়া।

'ভাইসাব, কথা হেইডা না। কথা হইল গিয়া এই সব করতে যাইয়া আমার উপর আবার কুন বিপদ আইয়া পড়ে। আমি ছাড়া তো মাইয়ার আর কেউ নাই।'

'হ, কথা মিছা না। ঠিক আছে উস্তাদরে আমি খুইলা কমুনে সব। যেইডা ভালা হইব তাই করবো উস্তাদে। আপনে কুনু চিন্তা কইরেন না। আপনে আপনের কাম কইরা রাখেন। বাকিটুকু তো উস্তাদ দেখবই।'

'চিন্তা কইরা আর কী করুম? জীবনে চিন্তা তো কম করি নাই। শ্যাষ পর্যন্ত তো কিছুই হইল না।'

'মিয়া সাব! উস্তাদ বড় কামেল লোক। আপনের চিন্তা সব শ্যাষ হইব কয়দিনের মইদ্যে, দেইখেন।'

'তাইলে ভালাই হয়। বাপ হইয়া মাইয়ার এই যন্ত্রণা আর সহ্য করবার পারি না। একটা ভালা পুলাও আহে না মাইয়ার জন্য। এইভাবে মইরা গেলে কবরেও শান্তি পামু না।'

হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টাল জাফর, 'মিয়া সাব, চিন্তা কইরেন না। খুব ভাল সম্বন্ধ হইব আপনের মাইয়ার। উস্তাদে সব ঠিক কইরা দিব।'

দরজার ওপরে মৃদু শব্দ হলো। সচকিত হয়ে উঠল মতি মিয়া এবং জাফর দু'জনেই। চকিত দৃষ্টি হানল জাফর দরজার দিকে। চাতকের মত এক

রাশ প্রত্যাশা তার চোখে। মতি মিয়া উঠে পড়ল। এই প্রসঙ্গে আর কোন কথা বলতে চায় না সে। প্রত্যাশা পূরণ হলো না জাফরের।

জালাল কবিরাজ জাফরকে নিয়ে মতি মিয়ার বাড়ি এসে পৌঁছুল বেশ বেলা থাকতে। পুরা পথটা তার কর্ম পদ্ধতি নিয়ে ভেবেছে সে। কীভাবে কীভাবে কোন জায়গা থেকে শুরু করবে এবং সব কিছু ঠিকঠাক মত চললে কোথায় গিয়ে শেষ করবে সব কিছু আলোচনা করেছে মনে মনে। এই কাজটা সে প্রতিটি কার্যক্ষেত্রেই করে থাকে। এতে বিশেষ ফল পায় সে। তার কর্ম পদ্ধতিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। শুরুতে তার বিশ্বস্ত সাগরেদ জাফরও এই পদ্ধতিটা ধরতে পারে না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সবই পরিষ্কার হয়ে যায় তার কাছে। কাউকে না কাউকে জানাতেই হয় সব কিছু। জাফরকেও এক সময় জানায় সে। জাফরই জানে তার গুপ্তভেদ।

কিন্তু মতি মিয়ার বাড়ি পৌঁছে কিছুই ঠিক পেল না জালাল কবিরাজ। মতি মিয়া গর্ত খুঁড়ে রাখেনি। মাটির ঘড়াও যোগাড় করেনি। জালাল কবিরাজের জালালী মেজাজটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছিল। অতি কষ্টে সে নিজেকে সংযত করল। প্রথমত রাগটা তার জাফরের ওপরই হয়েছিল। ভেবেছিল জাফর ঠিক ঠিক মত বলেনি মতি মিয়াকে। কিন্তু মতি মিয়া জানাল অন্য কথা। বলল, ঘড়া আর গর্তের কথা শুনে নাকি আলেয়া পুরোপুরি বিগড়ে গেছে। এখন সে পুরোপুরি জিনের কবজায়। কাউকেই চিনতে পারছে না। কিছুটা উন্মাদের মত আচরণ করছে সে।

নীরবে সব শুনল জালাল কবিরাজ। তারপর বলল, 'আপনে চিন্তা কইরেন না। আমি দেখতাছি। আলেয়ারে ডাক দেন।'

মতি মিয়া চলে গেল ভেতর ঘরে। কবিরাজ তার ঝোলা থেকে জিনিসপত্র বের করে সাজাতে লাগল টেবিলের ওপর। জাফর সাহায্য করতে লাগল কবিরাজকে। মতি মিয়া ফিরে এল কিছুক্ষণ পর। হাতে শরবত আর বিস্কিটসহ ট্রে। আলেয়া আসেনি।

'নেন, হুজুর, গরিবের বাড়িতে আগে কিছু পানি খাইয়া লন,' বলল মতি মিয়া।

'দেরি করন যাইব না, মিয়া সাব। সূর্য লগন পার হইলে আইজ আর

কাম হইব না। লগনের পরে এই কাম করতে গেলে জীবনের উপর খাতরা আইবো।' ট্রের দিকে ফিরেও তাকাল না কবিরাজ।

'হুজুর! পানিডা খাইয়া লন, বহুত দূর থেইকা আইছেন আপনেরা,' নাছোড়বান্দা মতি মিয়া।

'এই কামের শুরু হইতে শ্যাষ পর্যন্ত কুনু কিছু মুখে দেওয়া আমার জইন্য নিষিদ্ধ,' জানিয়ে দিল কবিরাজ।

জাফর আড়চোখে তাকাল শরবতের গ্লাসের দিকে। বহু দূর হেঁটে সে অনেকটা ক্লান্ত। কিন্তু ওস্তাদ যা খাবে না সাগরেদ হয়ে সেটা সে মুখে নিতে পারে না। কাজেই সেও হাত গুটিয়ে বসে রইল।

'একটু তাড়াতাড়ি আপনের মাইয়ারে নিয়া আসেন, মিয়া সাব। কাজ শুরু করি।' তাগাদা দিল কবিরাজ।

'কিন্তু গর্ত খোঁড়া আর মাটির ঘড়া তো আনা হইল না।'

'অগুলান পরে দেখুম নে। অখন জিন হাজির কইরা দেখমু অবস্থা কতখানি গুরুতর। এই জন্য মাইয়ারে সামনা-সামনি লাগব।' জানাল কবিরাজ।

আবার ভেতর ঘরে চলে গেল মতি মিয়া। তার শরবত আর বিস্কিট খায়নি বলে কিছুটা মনঃক্ষুণ্ন মনে হলো মতি মিয়াকে। কবিরাজ বসে রইল চুপচাপ। মাঝে মাঝে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা তাবিজের কৌটাটিতে হাত বুলাচ্ছে সে।

কেটে গেল বেশ কিছু সময়। মতি মিয়ার দেখা নেই। অধৈর্য হয়ে উঠল কবিরাজ। শেষে জাফরকে বলল, 'ওই, ডাক দে মতি মিয়ারে।'

'মিয়া সাব!' গলা খাঁকারি দিয়ে ডাক দিল জাফর।

কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার ডাক দিল জাফর। এবার বেশ জোরে, 'মিয়া সাব! দেরি হইয়া যাইতাছে। আমগো অনেক দূর যাওন লাগব।'

বেরিয়ে এল মতি মিয়া। একা। কিছুটা বিপর্যস্ত মনে হলো তাকে। তার শুকনো চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা আঁচ করে নিল কবিরাজ।

'মাইয়া পালাইছে নি?'

'হ, হুজুর! বহুত খুঁজছি, পাই নাই কুনুহানে।'

'ঠিক আছে, আইজ আর কাম হইব না। লগন শুরু হইয়া যাইবো

কিছুক্ষণ বাদে। আরেক দিন আওন লাগব। এই জিন তাড়ানোই লাগব।' সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কবিরাজ।

'হুজুর! আরেক দিন আওনই লাগব। আমাগো জন্য আপনের বহুত কষ্ট হইতাছে। মাইয়া ভালা হইয়া গ্যালে আপনেগোরে খুশি কইরা দিমু আমি।' লজ্জিত, কুণ্ঠিত মতি মিয়া বলে।

'হ, মিয়া সাব, আপনের মাইয়া ভালা হইয়া যাক এডাই আমাদের লাভ। আর কিছু দেওন লাগব না।' কবিরাজ বলল।

'হুজুর! আইজ তো আর কাম হইব না। সামান্য পানিডা যদি খাইয়া লইতেন। গরিব মানুষ আর কিছু দিবার পারি নাই।'

'যে দিন আমার কাম থাকে হেই দিন আমি উপাস থাকি। কাম হউক না হউক উপাস ভাঙ্গা চলে না। এইডাই কামের নিয়ম।' কবিরাজ প্রত্যাখ্যান করল মতি মিয়াকে।

জাফরের দিকে ফিরল মতি মিয়া, 'ভাই সাব, আপনে তো উপাস নাই। এক্কেরে খালি মুখে যাইয়েন না আমার বাড়ি থেইকা। গরিবের অমঙ্গল হইবো।'

জাফরের মন অনেক আগেই শরবত খেতে চাইছিল। ওস্তাদের দিকে চাইল সে। কিন্তু ওস্তাদ তখন অন্য চিন্তায় ব্যস্ত। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মতি মিয়ার অনুরোধ রক্ষা করছে এমন ভাবে শরবতের গ্লাসটা তুলে নিল জাফর। তারপর খেয়ে ফেলল ঢক ঢক করে।

ফিরতি পথে মাইল খানেক হাঁটার পর থেকেই জাফরের শরীর ভারী হয়ে আসতে লাগল। মাস্টার পাড়ায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ল তার। প্রচণ্ড জ্বরে গা পুড়ে যেতে লাগল জাফরের। তারপর শুরু হলো রক্তবমি। কাতর স্বরে বলল, 'উস্তাদ, আমারে বাঁচান। জিনে আমারে শ্যাষ কইরা ফালাইলো।'

বিরক্তির সীমা রইল না জালাল কবিরাজের।

পুরো সাতটা দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে ভাল হলো জাফর। তবে তার মধ্যে আতঙ্ক ঢুকে গেল। কবিরাজ খবর পাঠিয়েছিল তাকে। দুর্বল শরীর নিয়ে কবিরাজের বাড়ি এসে পৌঁছুল সে।

'কী খবর, জাফর?' কুশল জিজ্ঞেস করল কবিরাজ।

'অখন তো ভালাই। তয় শইল কিছু দুর্বল দুর্বল ঠ্যাকে।' জবাব দিল

জাফর।

'ভালা কইরা খাওন দাওন কর। ঠিক হইয়া যাইবো।'

'হ, উস্তাদ। আপনের দোয়া আর কেরামতি না থাকলে এবার গেছিলাম এক্কেরে।'

জাফরের কথায় কান দিল না কবিরাজ।

'জাফর!'

'জি, উস্তাদ!'

'আগামী কাইল থেইকা কৃষ্ণপক্ষ শুরু অইব।'

'জি, উস্তাদ।' ওস্তাদের কথায় সায় জানালেও মনে মনে কিছুটা শঙ্কিত হয়ে পড়ল জাফর।

'কাইল আমরা রাইত কাটামু শ্যামপুরে।' সহজভাবে জানাল কবিরাজ।

'উস্তাদ! রাইতে শ্যামপুরে থাকন লাগব?' ঢোক গিলল জাফর।

'হ, আর কিছু হইবো না তোর। যা হওনের হইয়া গ্যাছে। কুনু চিন্তা করিছ না।'

'উস্তাদ! আমার শইলডা খুব ভালা না।'

জাফরের দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাল কবিরাজ। তার চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেল জাফর।

'উস্তাদরে মানবি না তুই?'

'মানমু না কেন? আপনে যা কইবেন হেইডাই হইবো।' জবাব দিল জাফর।

'তাইলে কাইল দুপুরে খাইয়া-দাইয়া আইয়া পড়বি। বেল গড়ানের আগে শ্যামপুরে পৌঁছামু আমরা।' সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল কবিরাজ।

'কিন্তু মতি মিয়ারে তো কুনু সংবাদ দেয়া হইল না।' ফাঁক খুঁজতে থাকে জাফর।

'সংবাদ দেওন লাগব না। সংবাদ পাইলে পাখি উড়াল দিব।'

'হ, বুঝছি।' বিমর্ষ মুখে মাথা নাড়ল জাফর।

তার বিমর্ষ মুখের দিকে অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে রইল কবিরাজ। জাফর চলে গেল।

'আনাড়ি! এখনও কিছু শিখবার পারল না,' মনে মনে বলে কবিরাজ। বারোটা বছর এই ছেলেকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছে সে। ছায়ার মত

তাকে এতকাল অনুসরণ করেছে জাফর। সেও বটবৃক্ষের মত ছায়া দিয়েছে নির্দ্বিধায়। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আরও চালাক-চতুর সাহসী একজন সহকারী থাকলে তার জন্য ভাল হয়।

চিন্তাটা মনের গলি-ঘুপচিতে ঘুরপাক খেল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ আলেয়াকে মনে পড়ল তার। একটা শিহরণ বয়ে গেল কবিরাজের সারা শরীর জুড়ে। হ্যাঁ, এরকম একজন সঙ্গী। জিনে ধরা। হাজারে হাজারে জিন। 'মাইনষে এক নজর দেইখাই বেহুঁশ হইয়া পড়ব।' ভাবল সে। 'এই মাইয়ারে দিয়া জিনের বাদশারে কাবু করাও কোন ব্যাপার না। শুধু উপায় জানলেই হয়।'

উপায় জানা আছে জালাল কবিরাজের। তার বহু দিনের আশা জিনের বাদশাকে বশীভূত করবে। টুকটাক জিন ছাড়ানো, ভূত ছাড়ানো, যাদু-টোনা করানো-ফেরানো, প্রেম লাগানো-ভাঙানো, সংসার ভাঙা-জোড়া, শত্রুর ওপর জয় বহু কাজ করে সে। এসব কোন ব্যাপার নয় তার কাছে। কিন্তু সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না তার দ্বারা। অনেক সময় ব্যর্থও হতে হয়। ব্যর্থতার গ্লানি ছোট করে তাকে। সব সমস্যার সমাধান আছে জিনের বাদশার হাতে। তাকে বশ করতে পারলে তার মত গোপন ভেদের মালিক আর আশপাশে কেউ থাকবে না। মানুষ টের পাওয়া মাত্র ছুটে আসবে দলে দলে। মানুষের সমস্যার শেষ নেই। কারণ-অকারণে সমস্যা। সমাধান চায় তারা। কিন্তু কোন মানুষের পক্ষেই সব সমস্যার সমাধান দেয়া সম্ভব নয়। কথার ছল-চাতুরীতে কিছু সময়ের জন্য ফাঁদে ফেলা যায়। কিন্তু মানুষের ধৈর্য অত্যন্ত কম। বেশি দিন এক জায়গায় পড়ে থাকতে চায় না।

সেবার কবির মেম্বার এল তার কাছে। আরেকবার মেম্বার হতে চায়। ভোটের আগ পর্যন্ত কত কদর জালাল কবিরাজের! কত তেল-নুন মাখল জালাল কবিরাজকে। কবিরাজও তাকে ভোটে জেতানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। তার যত রকম বিদ্যে ছিল সবই প্রয়োগ করেছিল সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভোটে হেরে গেল মেম্বার। এরপর আর কবিরাজের কোন খোঁজ-খবরও করতে আসেনি মেম্বার। এখন নাকি আড়ালে-আবডালে কবিরাজকে গালি-গালাজ করে সে। বলে, ভণ্ডটা আমার সর্বনাশ করছে। অথচ জালাল কবিরাজ তার হেরে যাওয়ার কারণ সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল তাকে। ভোটারের সংখ্যার হিসাবে ভুল করার কারণেই ভোটের ফলাফলে এমন বিপর্যয়

ঘটেছে। মেম্বার বলেছিল, 'ভোটারের সংখ্যা তেরো হাজার। প্রকৃতপক্ষে ভোটার ছিল পনেরো হাজার। কবিরাজ তেরো হাজার ভোটারের ওপর তার বশীকরণ বিদ্যা প্রয়োগ করেছিল। কথা ছিল বেশির ভাগ ভোটার পক্ষে ভোট দেবে। কিন্তু ভোটের ফলাফলে দেখা গেল মেম্বার দুই হাজার ভোটে পরাজিত হয়েছে। কবিরাজ জানিয়েছিল আপনের ভুল তথ্যের কারণে এবার জিততে পারলেন না। মেম্বার তখনকার মত তার কথার কোন প্রতিবাদ করেনি ঠিকই, তবে পরে লোকজনকে বলে বেড়িয়েছে, কবিরাজের জন্য নাকি শিক্ষিত লোকের ভোট পায়নি সে।'

ব্যর্থতার কারণে এত বড় অপবাদ গায়ে মাখতে হয়েছে তাকে। আর ব্যর্থ হতে চায় না সে। যেমন করে হোক জিনের বাদশাকে বশ করতেই হবে। আলেয়াকে দরকার তার। এমন সুযোগ জীবনে কদাচিৎ মেলে।

বেশ বেলা থাকতেই শ্যামপুরে গিয়ে পৌছুল জালাল কবিরাজ আর জাফর। মতি মিয়া ওদেরকে দেখে কিছুটা হকচকিয়ে গেল।

'এমুন সময় আপনেরা আইলেন হুজুর, কী ব্যাপার?'

'ব্যাপার কিছু না। আইজ কৃষ্ণপক্ষের রাইত। জিন তাড়ানোর আইজই উপযুক্ত সময়।' জানাল কবিরাজ।

'কিন্তু আইজতো আমি যোগাড়-যন্ত্র কিছুই করি নাই।'

'যোগাড়-যন্ত্র আপনেরে করতে হইবো না। হেইডা আমি কইরাই আইছি।'

'ঠিক আছে। বহেন আপনেরা। আমি আলেয়ারে যাইয়া সংবাদ দেই।'

ভেতর ঘরে রওনা হলো মতি মিয়া। জালাল কবিরাজের কণ্ঠস্বর থামাল তাকে, 'মিয়া সাব!'

'জি!'

'আপনের মাইয়া আইজ যেন না পালায়। তাইলে কিন্তু হের লগে লগে আপনেও বিপদে পড়বেন।'

জালাল কবিরাজের শীতল কণ্ঠস্বরে কী ছিল জানে না মতি মিয়া। তবে তার শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল যেন। কবিরাজের শীতল চোখের দিকে সম্মোহিতের মত তাকিয়ে রইল সে।

'আপনেগোর হগলের ভালার জন্যই কইতাছি আমি। আপনেরা যদি ঠিক

ঠিক আমার কথামত কাম করেন্ন তাইলে জিনেরা আর জীবনে কখনও ধারে কাছে আইতে পারবো না। আপনের মাইয়া চির দিনের জইন্য ভালা হইয়া যাইব। বাপ হইয়া মাইয়ার ভালা চান তো, নাকি?'

জালাল কবিরাজের কণ্ঠস্বর গম্ভীর, শীতল। মতি মিয়ার অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে তা যেন ঝংকার তুলল। শিউরে উঠল সে।

'জি, হুজুর।' মতি মিয়া সম্মোহিতের মত বলল।

'তাইলে আপনের মাইয়ারে পাক ছাফ হইয়া পাক কাপড় পইরা থাইতে বলেন। চিন্তা কইরেন না। হ্যায় ভালা হইয়া যাইব।'

মতি মিয়া চলে গেল ভেতর ঘরে। নিশ্চুপ বসে রইল কবিরাজ আর জাফর। ধীরে ধীরে কেটে যেতে লাগল সময়। কবিরাজ আজ ধৈর্যের প্রতীক। সারা রাত সময় আছে তার হাতে। কিন্তু জাফরের অবস্থা সঙ্গীন। তার মনে হলো অনন্তকাল পড়ে রয়েছে এখানে। মাথাটা ঠিকমত কাজ করছিল না তার। প্রকৃতিতে আঁধার ঘনিয়ে আসছিল ধীরে ধীরে। জাফরের আতঙ্কও বাড়তে লাগল সেই সাথে। ওস্তাদের সাথে অনেক জায়গায় গিয়েছে সে। তার বহু কেরামতের সাক্ষী জাফর। কখনও এমন অবস্থা হয়েছে বলে তার মনে পড়ল না। শীতল অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল সে। একটা মোটা কাঁথা শরীরে চাপানোর জন্য তার মনটা আকুলি-বিকুলি করতে লাগল। কিন্তু নিস্তব্ধ কবিরাজের দিকে তাকিয়ে সে-কথা বলার সাহস হলো না তার। জাফরের দিকে কোন নজর নেই কবিরাজের।

আঁধার নামারও কিছুক্ষণ পরে হাতে হ্যারিকেন নিয়ে ফিরে এল মতি মিয়া।

'হুজুর! মাইয়া কয় রাইতের বেলা হ্যার ডর করে।' জানাল সে মৃদু স্বরে।

'আপনে হ্যারে কন ডরের কিছু নাই। আইজ কৃষ্ণপক্ষের রাইত। কুনু জিনের সাধ্য নাই আইজকার দিনে হ্যার গায়ে আঁচড় কাডে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবার ধীর পায়ে চলে গেল মতি মিয়া। আবার প্রতিক্ষা। জাফরের মনে হতে লাগল আজ না এলেই ভাল করত সে। হ্যারিকেনের আলোর বাইরে অন্ধকার কোণগুলোতে যেন জিনেরা ঘাপটি মেরে তার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রয়েছে। ওস্তাদের অসতর্কতায় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ফালা ফালা করে ফেলবে তাকে। তার শরীর বন্ধ করা আছে। ওস্তাদ

নিজ হাতে তার শরীর বন্ধ করেছে। কিন্তু খুব একটা ভরসা পাচ্ছে না সে। কিছুক্ষণ পর অন্ধকারের দিকে তাকানোর সাহস হারিয়ে ফেলল সে। এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল হ্যারিকেনের আলোর দিকে। দীর্ঘ সময় আলোর দিকে তাকানোর ফলে চোখ দু'টো জ্বালা করতে লাগল তার। ফুঁপিয়ে উঠল সে। এমন সময় মতি মিয়া এল। সাথে আলেয়া।

খুব ধীরে জালাল কবিরাজ চোখ তুলে চাইল আলেয়ার দিকে। আলেয়া এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে তার দিকে। কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল তারা। এই সময়ের মধ্যে কবিরাজ কয়েকবার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েও আবার আপ্রাণ চেষ্টায় ঠিক রাখল নিজেকে। অবশেষে জয় হলো তার। শিথিল হয়ে এল আলেয়ার শরীর। স্পষ্টতই সে শরীরের ভার ছেড়ে দিল। কবিরাজের সম্মোহনী শক্তি পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করল তার ওপর।

'আলেয়া!' কবিরাজের জলদ গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল।

'জি!' মৃদু স্বরে জবাব দিল আলেয়া।

'তুমি জাফরকে বিষ খাওয়াইছিলা কেন?' আচমকা প্রশ্ন করল কবিরাজ।

'বিষ খাওয়াই নাই।' অস্বীকার করল আলেয়া।

'কী খাওয়াইছিলা?'

'ধুতরার কষ।'

'এইডা খাইয়া হ্যায় মারা পড়তে পারত।'

'না, মরত না। পরিমাণ মত দেয়া হইছিল।'

'জগন্নাথ ওঝা আর দুই কবিরাজরেও কি ধুতরা খাওয়াইছিলা?'

'হ।'

'ক্যান?'

'হ্যাগোর নজর খারাপ। হ্যাগোর মতলব ভালা আছিল না।'

কিছুক্ষণ চুপ রইল কবিরাজ। এই লাইনে আর বেশি কিছু জানতে চায় না সে।

'তুমি ছুডু কালে এক পুলারে গলা কাইটা মারছো?'

'না, আমি মারি নাই।'

'কে মারছে?'

'জিনের বাদশা মারছে।'

'জিনের বাদশা!'

'হ, জিনের বাদশা রিকদানুস।'

'তোমার লগে হ্যার সম্মন্ধ কী?'

'জানি না।'

'কত দিন ধইরা হ্যায় তুমার লগে আছে?'

'ছুডু কাল থেইকাই আছে।'

'হ্যায় কি তুমারে পছন্দ করে?'

'জানি না।'

'আমি তার লগে দেখা করুম। তুমি তারে আইতে কও।'

'হ্যায় আইবো না।'

'ক্যান? আইবো না ক্যান?'

'স্বার্থপর, ধান্দাবাজ মাইনষেরে হ্যায় পছন্দ করে না।'

মনে মনে কিছুটা দমে গেল কবিরাজ। নিজের কথা আলেয়ার মুখে এভাবে শুনতে এবং উপস্থিত অন্য দু'জনকে শোনাতে চায়নি সে। সম্মোহন শক্তি ধীরে ধীরে শিথিল করল কবিরাজ। আলেয়া যেন এতক্ষণ অদৃশ্য কোন একটা কিছুর সাথে লড়াই চালিয়ে সকল শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। টলে উঠল সে। দ্রুত মতি মিয়া ধরল তাকে। ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলে গেল ভেতরের ঘরে। তার মনটা খারাপ।

নিজ বাড়িতে বসে বসে ভাবছিল কবিরাজ। আজ কয়দিন থেকে তার অন্যান্য সব কাজ বন্ধ। তার সমস্ত চিন্তা-পরিকল্পনা-সাধনা বর্তমানে আলেয়াকে ঘিরে। জাফর আগের চেয়ে এখন অনেক সুস্থ। তবুও সে কবিরাজের কাছে ইদানীং কম যাওয়া-আসা করছে। ব্যাপারটা নজর এড়ায়নি কবিরাজের। সকাল বেলায় খবর পাঠিয়েছিল সে জাফরকে। এখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে আসছে। অথচ খোঁজ নেই জাফরের। এ ধরনের ব্যাপার ক'দিন আগে কল্পনা করা যেত না।

পরিকল্পনাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করছিল কবিরাজ। এমন সময় জাফর এল।

'হুজুর! প্যাটের ব্যথায় কাহিল হইয়া পড়ছিলাম। বিছানা ছাইড়া উডনের পথ আছিল না।' কৈফিয়ত দিল সে।

জালাল কবিরাজের মধ্যে আজ আর কোন জালালী মেজাজ নেই।

মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে জাফরের ব্যাপারে।

'অসুবিধা নাই। অখন কী অবস্থা?' জিজ্ঞেস করে সে।

'অখন ভালা।'

'শ্যামপুরে কি তুই আমার লগে যাইবি? নাকি যাইতে চাছ না?' সরাসরি জিজ্ঞেস করল সে।

'হুজুর! আপনে হুকুম দিলে আমি যামু।' উত্তর দিল জাফর।

'তোর মনে কী চায়?'

'হুজুর, আমার ডর করে। এমন ঘটনা আগে কখনও হয় নাই। ওই বাড়ির সীমানায় গেলেই আমার কেমন জানি হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া আহে।' সরল স্বীকারোক্তি তার।

'আমি থাকতে তুই ডর করছ?'

উত্তর দিল না জাফর। মাথা নিচু করে চুপ রইল।

'ঠিক আছে, যাওন লাগব না তোর।' জানিয়ে দিল কবিরাজ।

'হুজুর! বেয়াদবি নিয়েন না। আমি যামু আপনের লগে। আসল কথা হইলো ডর খাইয়া মাথাডা একটু উল্টাপাল্টা হইয়া গ্যাছে।'

'সব ঠিক হইয়া যাইব, জাফর। আমার কামডা শুধু শ্যাষ করি। তারপর দেখবি আমিই হমু এই এলাকার রাজা।'

চকচক করে ওঠে কবিরাজের চোখ। জাফর জড়সড় হয়ে যায়।

'হুজুর! হেই দিন কাম শ্যাষ না কইরাই চইলা আইলেন যে?' কাজের কথায় এল জাফর।

'হ, এইডা কামেরই নিয়ম। একবারে সব কাম করন যাইব না।'

'আরও কি কয়েকবার যাওন লাগব?'

'নারে, জাফর, কাম শ্যাষ হইয়া আইছে। আসল জাগায় হাত দিছি। অখন শুধু খাঁচায় ভরন বাকি।'

'ওই মাইয়া কইছিল হ্যার লগে জিনের বাদশা রইছে।' ভয়ে ভয়ে বলল জাফর।

'হ, হ্যার লাইগাই তো হ্যারে আমার দরকার। আজীবনের লাইগা দরকার।' ফিসফিস করে বলে কবিরাজ।

অকারণে শিউরে উঠল জাফর।

'হুজুর! হ্যারে কি আপনে বিয়া করবার চান?' ফস করে জাফরের মুখ

দিয়ে বেরিয়ে এল কথাটা।

জালাল কবিরাজের আবার জালালী মেজাজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তার জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেল জাফর। কিন্তু জালাল কবিরাজের কণ্ঠ শীতল।

'সোমত্ত মাইয়ারে এমনি এমনি নিজের কাছে রাখমু ক্যামনে?'

'কিন্তু, হুজুর, আপনের ঘরে আরও দুই বিবি রইছে। হ্যারা কি সহজে মাইনা লইব?' কবিরাজের ঠাণ্ডা স্বরে সাহস ফিরে এল জাফরের।

'না মানলে মানাইয়া লমু। কত মাইনষের এই সগল ব্যাপার মিটাইলাম। আর নিজেরডা মানাইতে পারমু না? হেইডা তো তোর ভাবনা না।'

'জি, জি হুজুর।'

'আগামী কাইল রাইতে শ্যামপুরে যাওন লাগবো। সব খেলা শ্যাষ হইব কাইল রাইতে।' স্বাভাবিক ভাবে বলা শুরু করলেও শেষের দিকে বুজে এল কবিরাজের গলা।

'আবার কি মতি মিয়ারে না জানাইয়া হেইখানে যাইবেন?'

'হ, না জানানোই ভালা। বেশি জানলে সমস্যা হয়।'

'যোগাড়-যন্ত্র করন লাগবো না?'

'লাগব, হেইডা আমি নিজেই করমু।'

'হ্যার মাইয়া যদি বাধা দেয়?'

'দিবার পারব না। হেই রাস্তা বন্ধ কইরা দিমু।'

'কাইলই কি আপনে পয়গাম দিবেননি, হুজুর?'

দু'জনের কথাবার্তা স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। ফলে জাফর বলে ফেলল কথাটা।

'ঠিক নাই। হইতেও পারে নাও হইতে পারে।' স্বাভাবিকভাবেই জাফরের কথার উত্তর দিল কবিরাজ।

'মাইয়ার বাপ কি রাজি হইবো?' জাফর চালিয়ে গেল কথা।

'মাইয়া রাজি হইলে মাইয়ার বাপ ক্যান হ্যার চোদ্দ গুষ্টি রাজি হইবো।' আবার কঠিন শীতল হয়ে গেল কবিরাজের কণ্ঠস্বর।

'হ্যায় রাজি হইবো?'

'হইবো। হইতেই হইবো।'

আবার হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে এল জাফরের শরীর। ভয় ফিরে এল তার অন্তরে। কিন্তু সে আশ্চর্যের সাথে লক্ষ করল ভয়টা তার নিজের জন্য নয়। ভয়টা আলেয়ার জন্য!

শেষ পর্যন্ত জালাল কবিরাজ একাই পৌঁছুল শ্যামপুরে। জাফর আসেনি তার সাথে। শেষ মুহূর্তে জাফর এসে জানাল ঝিল পাড়ার এক মহিলাকে জিনে আছর করেছে। লোকজন এসে খবর দিয়েছে, ওস্তাদকে নিয়ে সেখানে গিয়ে একটু দেখে আসতে। এসব ব্যাপার বরাবর জাফরের মাধ্যমেই হয়ে আসছে। কাজেই কবিরাজের সন্দেহের কিছু ছিল না। সে শুধু জাফরের কাছে জানতে চেয়েছিল সে ঝিলপাড়ায় যেতে চায় কি না? জাফর আগপাছ চিন্তা না করেই উত্তর দিয়েছিল সে যেতে চায়। কবিরাজ আর তাকে কিছু বলেনি। মৃদু সম্মতি জানিয়ে বলেছিল, 'তুই যা, জাফর। আমি এখন অন্য তদ্বিরের জন্য শরীল বাইন্ধা ফালাইছি। অখন অন্য কুনুহানে যাওন যাইবো না।'

জাফর কবিরাজের কথা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু না বোঝার ভান করল সে। সম্ভবত এই প্রথম সে ওস্তাদকে অবজ্ঞা করে নিজের কাজে চলে গেল। কবিরাজ বাধা দেয়নি তাকে।

মতি মিয়া যেন তারই অপেক্ষায় ছিল। জালাল কবিরাজকে দেখে আশ্চর্য হলো না সে।

'আসালামুআলাইকুম, হুজুর!'

'ওয়ালাইকুম। মাইয়ার খবর কী?' সরাসরি কাজের কথায় চলে এল কবিরাজ।

'মাইয়া হেই দিনের পর কেমুন কেমুন করে। ঠিক বুঝবার পারতাছি না।' দুশ্চিন্তা মতি মিয়ার কণ্ঠে।

'ঠিক হইয়া যাইবো। চিন্তা কইরেন না।' আশ্বাসবাণী শোনাল কবিরাজ।

'আপনে, লগে পুলাডারে দেখতেছি না?'

'হ্যায় আরেক জায়গায় গ্যাছে জিন ছাড়াইতে।'

'অ, আচ্ছা। চা-পানি কিছু আনমু?' সঙ্গত কারণে জিজ্ঞেস করল মতি মিয়া।

'না, আমার অখন খাওন নিষেধ।' স্বাভাবিকভাবেই বলল কবিরাজ। 'মাইয়া ঠিক আছে তো, মিয়া সাব?'

'হ, ঠিক আছে। ঘরেই আছে। হেই দিনের পর একবারের জন্যও ঘরের বাইরে যায় নাই। সারা দিন ঘরেই থাকে।'

'চিন্তা কইরেন না। সব ঠিক হইয়া যাইবো। আল্লাহ্ সমস্যা দিছে আবার তার সমাধানও দিছে। খামাখা চিন্তা কইরা পেরেশানি বাড়াইয়া লাভ নাই।'

'চিন্তা তো এমনি এমনি করি না, হুজুর। মা-মরা মাইয়া আমার। ছুডু কাল থেইকা আমিই হ্যার মা-বাপ। আর তো কেউ নাই।'

'মিয়া সাব, আপনের মাইয়ার মইদ্যে বিরাট শক্তি লুকাইয়া রইছে। আপনি হেই শক্তি দিয়া রাজা হইয়া যাইবার পারেন। লোকে আপনের পায়ে চুমু খাইবো।'

'কন কী!' আশ্চর্য হয়ে বলল মতি মিয়া।

'হ, হের লাইগা হ্যারে বানতে হইবো। শক্ত কইরা বানতে হইবো যেন কখনও ছুটবার না পারে।' কবিরাজের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত স্বাভাবিক।

'আমার মাইয়ারে বানতে হইবো?' স্বগোতক্তি বেরিয়ে আসে মতি মিয়ার কণ্ঠ থেকে।

'হ, তবে এই বান্ধন দড়ির বান্ধন না। এই বান্ধন চির জীবনের বান্ধন।'

'আপনের কথা আমি বুঝবার পারতাছি না, হুজুর।'

'আপনের মাইয়ারে এমুন লোকের লগে বাইন্ধা দিতে হইবো যে হ্যার শক্তিরে কাজে লাগাইবার পারে। নাইলে হগলেই জ্বলতে থাকবো। কেউ শান্তি পাইবো না।'

'হেই রকম পুলা পামু কই?' নিরাশা ফুটে উঠলো মতি মিয়ার কণ্ঠে।

'আছে, মিয়া সাব।' জালাল কবিরাজের কণ্ঠে মৃদু প্রশান্তি।

মতি মিয়ার ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে এলো।

'আপনে কি আপনার লগের হেই পুলাডার কথা কইতাছেন?' ঠাণ্ডা স্বরে প্রশ্ন করল সে।

'আরে না, মিয়া সাব, কী যে কন?'

মতি মিয়ার বুক ধুকপুক করে উঠল।

'তাইলে কে?'

'আছে, হেইডা সময় হইলেই জানতে পারবেন। আপনে রাজি থাকলে আপনের জন্যই ভালা হইবো। ভবিষ্যতের জন্য আর কুনু চিন্তা করন লাগবো না। লোকে পথে-ঘাটে আপনের পায়ে চুমু খাইবো।'

'পুলাডা কে?' কিছুটা অধৈর্য হয়ে উঠল মতি মিয়া।

'হেইডা সময় হইলে আপনের মাইয়াই জানাইবো আপনেরে।'

'মাইয়া জানাইবো!' বিস্মিত মতি মিয়া।

'হ, অখন থাক এসব কথা। আপনের মাইয়ারে পাক-ছাপ হইয়া আইতে বলেন। আমি আমার কাম শ্যাষ করি।'

মতি মিয়া চলে গেল। আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ উঁকি দিয়েছে। ধীরে ধীরে জোছনা ছড়িয়ে পড়ছে প্রকৃতিতে। তার কিছু অংশ জানালা গলে ঘরে প্রবেশ করে সব কিছু মায়াবী করে তুলেছে। কবিরাজের মনেও যেন সেই ছোঁয়া লাগছিল কিছুটা। কবিরাজ নীরবে প্রতিক্ষা করতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পর মতি মিয়া এল। হাতে হ্যারিকেন। হ্যারিকেনের সলতে উসকে দিয়ে আঁধার তাড়ানোর চেষ্টা করল সে।

'হুজুর! মাইয়া বড় অস্থির হইয়া পড়ছে। আইতে চায় না।' জানাল সে।

'অস্থিরতা কাইটা যাইবো। একটু ধৈর্য ধরতে বলেন। আইজই শ্যাষ।'

'আইজ না হইলে অয় না?'

'এসব ব্যাপারে দেরি করন ঠিক না, মিয়া সাব। একবার যখন কামে নাইমা পড়ছি তখন এর শ্যাষ না কইরা বইয়া থাকন মঙ্গলজনক হইবো না। ক্ষতি হইবো।' মতি মিয়ার প্রস্তাব খণ্ডন করে দিল কবিরাজ।

'হুজুর! মাইয়া বড় অস্থির।' শেষ চেষ্টা করে মতি মিয়া।

'মিয়া সাব! আপনে নিজেই অনেক কিছু দেখলেন, বুঝলেন। এখন যদি খামখা এই ব্যাপারটা ফালাইয়া রাখেন তাইলে কিন্তু আপনেই ভোগান্তির মইদ্যে পইড়া যাইবেন। বহু মাইনসের লগে জিন থাকে। কেউ বুজে কেউ বুজে না। যারা বুজে তারা চিকিৎসা কইরা ভালা হয়। নতুন কইরা জীবন শুরু করে। যারা বুজে না তারা এই জিন শইলে পুষতে থাকে। এক সময় জিন হ্যার সারা শইলের লগে মিশ্যা মাইনষেরেই জিন বানাইয়া ছাড়ে। হেই মাইনষের চেহারা-ছুরত মাইনষের মতই। কিন্তু ভিতরে সে আসলে জিন। এ্যারা কখন কী কইরা বইবো আগে থেইকা কিছুই কওন যায় না। আবার এগোর শইল মাইনষের হওনের কারণে শইলের মইদ্যে জ্বালা-যন্ত্রণা হয়। হেই জ্বালা-যন্ত্রণা তার আশ-পাশের হগলের উপর যাইয়া পড়ে। শ্যাষ পর্যন্ত হগলেই যন্ত্রণায় ভুগতে থাকে।'

কবিরাজ ধীরে ধীরে বোঝাতে থাকে মতি মিয়াকে। মতি মিয়া কোন

কিছুই অস্বীকার করে না। নীরবে শুনতে থাকে কবিরাজের কথা।

'তো মিয়া সাব! আপনের মাইয়ার মইদ্যে যে জিন বাসা বানছে হ্যায় বহুত নামী-দামী শক্ত জিন। এ্যারে যদি ঠিকমত কাবু করন না যায়, তাইলে আপনের মাইয়া জীবনে কখনও শান্তি পাইবো না। স্বাভাবিক মাইনষের মত দুনিয়ায় জীবন কাটাতে পারবো না। বাপ হইয়া আপনে মইরাও শান্তি পাইবেন না।'

নড়েচড়ে উঠলো মতি মিয়া।

'হুজুর! এখন কী করতাম? মাইয়ারে লইয়া তো আমিও জ্বলতাছি এতগুলা বছর।'

'আপনে আমারে একটু সহযোগিতা করেন। এইডাই আমার কাম। জীবনে নতুন-পুরানো বহু জিন ছাড়াইছি আমি। আপনার মাইয়ারে দেইখাই আমি বুজছিলাম হ্যার লগের জিন বড় শক্ত। এখন দেখতাছি হ্যায় শুধু শক্তই না, হ্যায় বহুত বড় নামি-দামী বাদশা জিন। জিনের বাদশা রিকদানুস। আপনেরে আমি এইটুকু আশ্বাস দিবার পারি যে শ্যাষ পর্যন্ত না দেইখা ছাড়ুম না আমি। এখন বাকিটুকু আপনেরই হাতে।' সুযোগ বুঝে টোপ ফেলল কবিরাজ।

'আমি কী করতাম? আমি তো এইগুলার কিছুই জানি না, বুজিও না।' নিরুপায় কণ্ঠে বলল মতি মিয়া।

'আপনের অত বুজনের কাম নাই। আপনে শুধু আমার কথামত চলবেন। আমার সহযোগিতা করবেন। তাইলে আপনের মাইয়ার সুস্থ হইতে বেশি সময় লাগবো না। হ্যায় আর দশটা মাইয়ার মত সোন্দর জীবন ফিরা্যা পাইবো। হ্যার মইদ্যে যে জিন বাসা বানছে হ্যারে আমরা মুঠার মইদ্যে পুইরা রাজা বইনা যাইতে পারমু। বাকি জীবন দুনিয়ায় রাজা হইয়া বাস করতে পারমু।'

বুজে আসতে থাকে কবিরাজের কণ্ঠ। মতি মিয়াও যেন ঘোরের মধ্যে পড়ে যায়।

'অখন কী করতে হইবো, হুজুর?' ফিসফিস করে বলে সে।

'আপনের মাইয়ারে নিয়া আসেন।'

স্থাণুর মত কিছুক্ষণ বসে থাকে মতি মিয়া। তারপর ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল ভেতর ঘরে। আজ আর বেশি দেরি করল না সে। অল্প সময়ের মধ্যে

ফিরে এল। সাথে আলেয়া। সরাসরি এসে দাঁড়াল কবিরাজের সামনে।

'আলেয়া!' মাথা নিচু করে থাকা আলেয়াকে ডাক দিল কবিরাজ। আলেয়া নিশ্চুপ।

'আলেয়া! মাথা তুলো।'

কবিরাজ কাজ শুরু করে দিয়েছে। তার সম্মোহনী শক্তি গ্রাস করতে শুরু করেছে আলেয়াকে। ধীরে ধীরে মাথা তুলল সে। তাকাল কবিরাজের দিকে।

'আলেয়া! তোমার আব্বারে বাইরে যাইয়া খাড়াইতে কও।'

'আব্বা! আপনে বাইরে যাইয়া খাড়ান।' কবিরাজের কথার উত্তরে যান্ত্রিক স্বরে বলল আলেয়া।

কথাটা যেন মতি মিয়ার পা দু'টো শক্ত করে গেঁথে দিল মেঝের মাটির সাথে। অনড় দাঁড়িয়ে রইল সে।

'আলেয়া!' কবিরাজের শীতল জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'আব্বা!' আলেয়ার কঠিন হিসহিসে কণ্ঠ ভেসে এল।

'মতি মিয়া!' আবার কবিরাজের শীতল কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

মতি মিয়া ধীরে ধীরে চলে যায় ঘর ছেড়ে। কাজের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হলো কবিরাজের। প্রথম পর্যায়ে সফল হয়েছে সে।

'আলেয়া! তুমি হইবা এই অঞ্চলের রাণী। বাকি জিন্দেগী তুমি রাণী হইয়া থাকবা। কুনু দুঃখ-কষ্ট থাকবো না তোমার।'

'আমি রাণী হইবার চাই না।' স্পষ্ট উত্তর দিল আলেয়া।

'আলেয়া! মাইনষে সারা জীবন সাধনা কইরা যা পায় না তা তুমি এমনি এমনি পাইবা।'

'আপনে ভুল করতাছেন,' জবাব দিল আলেয়া।

'আমি না তুমি ভুল করতাছো, আলেয়া।'

আলেয়া নিশ্চুপ।

কবিরাজ শুরু করল আবার, 'আলেয়া, বুঝবার চেষ্টা করো। সোন্দরভাবে বাঁচতে চাও না তুমি? সবাই তুমারে সম্মান করুক, তুমার কথায় ওঠা-বসা করুক তা চাও না তুমি?'

'না,' স্পষ্ট জবাব আলেয়ার।

কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়ল কবিরাজ। তবুও হাল ছাড়ল না সে।

'আলেয়া, তুমার বাপে তুমারে পাইলা এত বড় করল। তুমারে কখনও

দুঃখ-কষ্ট কারে কয় বুঝবার দিল না। তার কথা মনে হয় না তুমার?’

‘কী কথা?’

‘হ্যারে লোকে মানবো। হগলে তারে মাথায় তুইলা রাখবো। হ্যার কথায় উঠ-বস করবো।’

‘ক্যামনে?’

‘তুমি যদি একটু রাজি হও তাইলেই সব হইবো। তুমার বাপে হইবো এই এলাকার রাজা। হ্যায় যা কইবো হগলে তার কথা মত উঠ-বস করবো।’ আলোর দেখা পায় যেন কবিরাজ।

‘আমি কী করবার পারি?’

‘আমি যা যা বলি হেই মত চলবা।’

‘আপনে আমারে কী করতে বলেন?’

‘আলেয়া, তুমার মইদ্যে জিনের বাদশা রইছে। হ্যারে কাবু করতে অইলে তুমারে আমার দরকার। হ্যায় যদি ধরা দেয় তাইলে আর কুনু চিন্তা থাকব না আমাগো।’

‘হ্যারে আপনে ধরতে পারবেন না,’ হঠাৎ ধমকে উঠল আলেয়া।

চমকে উঠল কবিরাজ। সেই সাথে তার জালালী মেজাজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। দীর্ঘক্ষণ সম্মোহনী শক্তি প্রয়োগ করায় কিছুটা দুর্বলতা আর অবসাদ গ্রাস করেছিল তাকে।

‘আলেয়া, তুমি রাজি হইলেই হ্যায় আইয়া পড়ব আমগো দলে।’

‘সম্ভব না,’ পরিষ্কার করে বলল আলেয়া।

‘সম্ভব। তুমি চাইলেই সম্ভব।’

‘না।’

‘তুমি আমার কথা মানবা না?’ কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কবিরাজ।

‘না।’

‘তাইলে আমারে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হইব। তুমার শরীলে বাসা বান্ধনের মজা আমি তারে বুজাইয়া ছাড়মু।’

‘আপনে কী করবেন?’

‘আমি হ্যারে আগুনে জ্বালামু।’

‘কবিরাজ!’ আলেয়ার কণ্ঠটা ঠিক আর্তস্বর ছিল না। কিন্তু কবিরাজের কাছে তাই মনে হলো।

‘ভয় পাইলা নাকি?’ ব্যঙ্গ করল কবিরাজ।

‘হ্যায় আমার বন্ধু। ছুডু কাল থেইকা হ্যায় আগলাইয়া রাখছে আমারে।’

‘ভালা কথা, বন্ধুরে আগুনে জ্বলতে দেখলে কেমুন লাগব তুমার?’

কথার খোঁচায় আলেয়াকে বিদ্ধ করতে লাগল কবিরাজ। কিছুটা দিশেহারা বোধ করতে লাগল আলেয়া।

‘আমারে দিয়া আপনে কী করবার চান?’ দম বন্ধ করে বলল আলেয়া।

‘তোমারে আমি বিয়া করবার চাই। তুমার বন্ধু, আমারও বন্ধু হইব।’

‘আপনে বাপ বয়সী হইয়া আমারে বিয়া করবার চান?’ কম্পিত কণ্ঠস্বর আলেয়ার।

‘বয়স কুনু ব্যাপার না, আলেয়া। বিশেষ কারণ আছে বইলাই বিয়ার প্রয়োজন হইছে।’ বলল কবিরাজ।

‘এইডা সম্ভব না।’ আলেয়ার কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

ধৈর্য হারিয়ে ফেলল কবিরাজ। বহু কষ্ট করে সে এই পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। কিন্তু এতদূর এসে ফলাফল শূন্য দেখে জালালী মেজাজ ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ল জালাল কবিরাজের। খামচে ধরল সে আলেয়ার হাত।

‘আমি তুমার পেয়ারের বন্ধুরে আগুনে জ্বালামু। তুমারেও ছাড়ুম না।’ তীব্র হিসহিসে কণ্ঠে বলল সে।

আলেয়ার শরীর এখন ব্যথা শূন্য। অত্যন্ত ধীর মায়াবী কণ্ঠে সে জবাব দিল, ‘আপনে ভুল করতাছেন।’

আলেয়ার কণ্ঠস্বর যেন আগুন ধরিয়ে দিল কবিরাজের গোটা শরীরে। হঠাৎ সে জাপটে ধরল আলেয়াকে। তার সম্মোহনী শক্তি মুহূর্তে শিথিল হয়ে পড়ল আলেয়ার ওপর থেকে। কবিরাজ টের পেল না তার পেছনে এক দীর্ঘ ছায়ামূর্তি আবির্ভূত হয়েছে। তার নরম তুলতুলে কোমল হাত দু'টো যখন কবিরাজের গলাটা পেঁচিয়ে মেঝে থেকে পাঁচ ফুট শূন্যে তুলে ফেলল তখন কবিরাজের অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।

প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল পুরো বাড়িটা। ছুটে এল মতি মিয়া। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল কবিরাজের মুণ্ডুহীন দেহটার দিকে। পাশে বসে রয়েছে আলেয়া। ঠিক আট বছর আগে মতি মিয়া পাট খেতে যেভাবে আবিষ্কার করেছিল তাকে।

হাসানুজ্জামান মেহেদী

নারকীয়

দেবরাজ জিয়ুসের ভাই সমুদ্রদেবতা পসাইডনের হাতে সবসময় একটা ত্রিশূল থাকত। ত্রিশূলটা স্বাভাবিক ত্রিশূল থেকে একটু ভিন্ন ধরনের ছিল। যে রথটিতে তিনি আরোহণ করতেন সে রথটি বহন করত জলপরী আর সমুদ্র দানবেরা। তাঁর রানীর নাম ছিল অ্যাম্ফিট্রেইট। কিন্তু পসাইডন ভালবাসতেন স্কাইলা নামে এক জলদেবীকে। রানী অ্যাম্ফিট্রেইট সেটা জানতে পেরে ঈর্ষান্বিত হয়ে স্কাইলাকে জলদেবী থেকে ছয়মাথাওয়ালা অদ্ভুত এক জলজন্তুতে পরিণত করেন ওই ত্রিশূলটার সাহায্যে।

শহরের কোলাহল আর হইহুল্লা থেকে অনেক অনেক দূরে পাহাড়ঘেরা এই অরণ্যের মধ্যে ছোট একটা টিলার নীচে একটা গাছের ছায়ায় বসে চারদিকের চোখ জুড়ানো সৌন্দর্য দেখতে দেখতে হঠাৎ করেই গ্রীক পুরাণের ছোট্ট এই কাহিনিটা মনে পড়ে গেল রেজওয়ানের। মনটা খুব বিষণ্ন আজ তার। শুধু আজ নয়। বেশ কিছুদিন ধরেই। পাহাড়ের কোলে বেড়াতে আসাটা এজন্যই। গত আট মাস অমানুষিক পরিশ্রম শেষে ভার্সিটি এখন বন্ধ। একেবারে তিন মাসের জন্য। সময় কাটানোর মত কিছুই নেই। পি.সি., সিনেমা, কার্টুন, গল্পের বই এগুলোতে আর কতক্ষণই বা সময় কাটে। এরকম সময়গুলোতে তার অবস্থাটা একটা অসহনীয় পর্যায়ে চলে যায়। সময় কাটতে চায় না। বারবার ঘুরে ফিরে চোখের সামনে অতীতটা ভেসে ওঠে। যেটাকে সে কখনওই মনে করতে চায় না। ভুলে যেতে চায় সারাজীবনের জন্য। কিন্তু চাইলেই কি ভুলে যাওয়া যায়? মনে পড়ে বাবা-মা আর আপুর কথা। বছর কয়েক আগে একটা ফ্যামিলি ট্রিপে কক্সবাজার যেতে গিয়ে রোড অ্যাকিসিডেন্টে মারা যায় বাবা-মা আর একমাত্র বড় বোন। সেই থেকে একদম একা হয়ে গেছে ও। নিঃসন্তান মামা-মামীর কাছেই বড় হওয়া তখন থেকে। মামীও মারা গেছেন বছরখানেক আগে। দিনে দিনে আরও অনেক বেশি একা হয়ে যাচ্ছে রেজওয়ান। স্কুলকে মনে পড়ে। মনে পড়ে স্কুলের ফ্রেণ্ডদের। অনিক, শান্ত, রাজিব, নেলি, মানস, বীথি এদের কারও সাথেই

এখন যোগাযোগ হয় না তার। অথচ ম্যাপললীফ ইন্টারন্যাশনালে পড়ার সময় ওদের ছাড়া একটা দিনও কল্পনা করতে পারত না সে। পৃথিবীতে কেউই সারাজীবন থাকে না। তাই বলে সম্পর্কের স্থায়ীত্ব কি এতই কম? এতই ঠুনকো মানুষের জীবন? ওর সব সময়ের ভাল বন্ধু ছিল এ্যানি। শুধুই কি বন্ধু? না, শুধু বন্ধু না। আরও অনেক বেশি কিছু। বাবা-মা, বড়বোন সবাইকে হারানোর পর বলতে গেলে তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল এই এ্যানি। ওকে নিয়ে কম স্বপ্ন দেখেনি রেজওয়ান। মাসখানেক আগে এ্যানিকেও হারিয়েছে সে। ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে বাসায় আগুন ধরে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ওর শরীর। পুড়ে যাওয়া এ্যানির লাশ দেখার সাহস হয়নি রেজওয়ানের। এখনও এ্যানির মুখটা মনে পড়ে। শান্ত স্বভাবের এ্যানি কথা বলত খুব কম। বলতে গেলে একদমই বলত না। সারাটা সময় রেজওয়ান বকবক করত আর এ্যানি চুপ করে শুনত। কিছু বলছে না কেন একবার জিজ্ঞেস করায় বলেছিল, 'বলো বলো। তোমার যা যা বলার আছে বিয়ের আগে সব বলে নাও। বিয়ের পর তো আর তোমাকে কিছু বলতে দেব না। তখন যা বলার সব আমিই বলব।'

ভাবতে ভাবতে চোখ ভিজে যায় রেজওয়ানের। এ জীবনে আপন বলতে একজনও কি তার থাকবে না? ভার্সিটি ফ্রেণ্ডদেরও মনে পড়ছে। তার সাথে আই.ইউ.টি.তে পড়া তার রুমমেট নাহিদ, জীবন আর রোহান, ক্লাসমেট আদনান, রবিন, আনাস, মিশুক, শাওন, নিয়াম সবাই মিলে এই ছুটিতে কক্সবাজার বেড়াতে গেছে। তাকেও অনেক জোরাজুরি করেছিল যাওয়ার জন্য। কিন্তু রাজি হয়নি সে। গ্যাদারিং তার পছন্দ না। সে লোনলি থাকতে পছন্দ করে। আর এজন্যই হয়তো প্রকৃতি তাকে ধীরে ধীরে আলটিমেট লোনলিনেসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ভার্সিটি ফ্রেণ্ডদের কথা ক'দিন থেকে বেশি করে মনে পড়ছে। রোহান আর জীবন, যাদের কাছ থেকে কখনও খবরের কাগজের বিল আদায় করা যায় না। নাহিদ আর রেজওয়ানকে সবসময় ওদেরটা দিতে হয়। রবিন, যাকে দল বেঁধে সবাই খেপায়। আনাস, পরীক্ষার আগে সবাই হামলে গিয়ে পড়ে ওর কাছে পড়া বুঝিয়ে দেয়ার জন্য। মিশুক যাকে একদমই পছন্দ করে না। কারণ সব সময় এমন একটা ভাব নিয়ে থাকে যেন ভিনগ্রহের বুদ্ধিজীবী। সারাদিন কী সব চিন্তা করে আর ডায়েরি খুলে কী কী লেখে। কিন্তু আজ মিশুককেই বেশি করে মনে পড়ছে কেন?

ওকে এত মনে পড়ার কারণ কী? কারণটা অবশেষে ধরতে পারল রেজওয়ান। আর ধরতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ফিক করে হেসে ফেলল।

ঢাকা থেকে এই পাহাড়ি এলাকায় বেড়াতে এসে একাকী নিরিবিলি থাকার জন্য একটা জায়গা খুঁজছিল সে। হোটেল বা মোটেলের কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ তার পছন্দ নয়। তাই পাহাড়ের কাছাকাছি কোথাও থাকার জন্য জায়গা খুঁজছিল। কিন্তু বাংলাদেশের ট্যুরিজম এখনও ওই লেভেলে যায়নি যে চাইলেই পছন্দ মত কোন কটেজ বা বাংলো পাওয়া যাবে। অনেক খুঁজেও তাই পাচ্ছিল না। কিন্তু সে যখন আশপাশের এলাকায় থাকার জন্য বাংলো খুঁজছিল, তখন এলাকার কিছু কিছু মানুষ তাকে এই এলাকার পাহাড় বা জঙ্গলে রাতে থাকতে নিষেধ করে। কারণ জিজ্ঞেস করলে জানায় এখানকার পাহাড়ে নাকি রাতের বেলা অদ্ভুত কী একটা জীব ঘুরে বেড়ায়। কথাটা শুনে কৌতূহল হয় রেজওয়ানের। বিস্তারিত জানতে চায়। কিন্তু এ ব্যাপারে খুব বেশি কিছু বলতে কেউই রাজি হয়নি। তারপরও উপর্যুপরি জেরা করে সে যেটুকু জানতে পেরেছে সেটুকু হলো–এখানে পাহাড়ের পেছনে বিরাট এক অট্টালিকা আছে। সেটার মালিক ছিলেন বিখ্যাত লেখক রায়হান চৌধুরী। কোন এক অদ্ভুত কারণে একে একে তাঁর স্ত্রী, তিনি এবং তাঁর মেয়ে মারা যায়। তখন থেকেই বাড়িটা পরিত্যক্ত। কেউ ওই বাড়িতে যায় না। আশপাশে যারা থাকত তারাও আস্তে আস্তে সরে আসে ওখান থেকে। শুধু মাত্র রায়হান চৌধুরীর চাকরটিই এখনও ওই বাড়িতে রয়ে গেছে। যে অদ্ভুত জীবটা পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায় সবার ধারণা সেটা ওই বাড়িতেই থাকে। ওই জীবটাই নাকি রায়হান সাহেব আর তার পরিবারকে হত্যা করেছে।

আজ সকালে শোনা এ কথাগুলোর জন্যই রেজওয়ানের এত বেশি করে মিশুককে মনে পড়ছে। গর্দভটা আর কিছু করতে না পারলেও একটা কাজ খুব ভাল করতে পারে। সেটা হলো থ্রিলার লেখা। বানিয়ে বানিয়ে বাস্তব কিছু চরিত্র নিয়ে এমন এক একটা কাহিনি বানায়। বেশ কিছুক্ষণ আপনমনে হাসল রেজওয়ান। তারপর হাতের মুঠোয় ধরা জিনিসটার দিকে তাকাল। পাথরের তৈরি ছোট্ট একটা ত্রিশূল। এই ত্রিশূলটা দেখেই গ্রীক দেবতা পসাইডনের কথা মনে হয়েছিল। ভাল করে তাকাল রেজওয়ান ত্রিশূলটার দিকে। মাঝখানের ফলাটা ছোট। অন্যান্য ত্রিশূলের সাথে এখানেই এটার পার্থক্য।

লোকজনের নিষেধ সত্ত্বেও রেজওয়ান পাহাড়ে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত

নেয়। শুধু তাই নয় তার চেয়ে এক কাঠি উপরে উঠে ঠিক করে ওই পরিত্যক্ত বাড়িটা খুঁজে বের করে ওখানেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত খুঁজে বের করে সে বাড়িটা। খুব যে প্রাচীন আমলের বাড়ি তা নয়। বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় যে এখন এখানে কেউ থাকে না। দোতলা বাড়ি। জায়গায় জায়গায় আগাছা জন্মেছে, রং উঠে গেছে। ময়লা আবর্জনায় ভর্তি। এখানে থাকার মত ঘর পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছিল না। ঠিক এমন সময়ই পেছন থেকে কার যেন গলার আওয়াজ পায় রেজওয়ান, 'কে? কে ওখানে?'

পেছন ফিরে দেখে সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধ বললে কম বলা হবে। ঠিক যত বয়সে একজন মানুষকে বৃদ্ধ বলা যায় তিনি তার চেয়েও অনেক বেশি বয়সী। চেহারা ভাঙা, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, হাতে লাঠি। এবাড়ির একমাত্র বাসিন্দা রায়হান সাহেবের চাকর। অনুমান করে রেজওয়ান। 'আমি...মানে...আসলে বেড়াতে এসেছি। একটু নিরিবিলি থাকতে চাই। শুনলাম এ বাড়িটা ফাঁকা পড়ে থাকে। একটু থাকতে দিলে ভাল হত।'

'তা এত জায়গা থাকতে এ বাড়িতে কেন?'

'না...মানে...।' অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাতে পারে না রেজওয়ান।

'দিনের বেলাতেও এ বাড়ির ছায়া কেউ মাড়ায় না। আর তুমি রাতে থাকতে চাও। এখানে আসার পথে কেউ তোমাকে কিছু বলেনি?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান বৃদ্ধ।

'হ্যাঁ, বলেছে।'

'তা হলে ? কেন এসেছ এখানে? কী চাও তুমি?'

'কিছু না। শুধু কদিন থাকতে চাই।'

'পাগল হয়েছ? এখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। এই সময়ে অন্য কোথাও যেতে চাইলে রাতের আগে এ এলাকা ছাড়তে পারবে না। বিপদে পড়বে। তাই শুধু আজ রাতটা। কাল সকালেই চলে যাবে। তোমার ভালর জন্যই বলছি, বাবা। এখানে থাকা মোটেও নিরাপদ নয়।'

'তা হলে আপনি আছেন কেন?' আচমকা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল রেজওয়ান।

'আমার, বাবা, জীবন আছেই বা ক'দিন?' কণ্ঠস্বর কান্নায় জড়িয়ে এল বৃদ্ধের, 'খেতে পাচ্ছিলাম না, দাদা রাস্তা থেকে তুলে এনে বাসায় একটা কাজ দিলেন। দাদার ঋণ শোধ করতে পারব না কখনও। তাই তো তার ভিটে

কামড়ে এখনও পড়ে আছি। ডাক আসা মাত্রই চলে যাব। তারপরও এ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারব না, বাবা।' কান্না চাপা দেয়ার চেষ্টা করলেন বৃদ্ধ।

একতলার এককোণে একটা ঘর পরিষ্কার করে মাটিতে চাদর বিছিয়ে দিলেন বৃদ্ধ। রাতের খাবার এনে দেয়ার কথাও বললেন। যাবার আগে বলে গেলেন, 'শোনো, বাবা, তোমার ভাল চাই বলেই কথাগুলো বলছি। বাড়িটা অভিশপ্ত। সবকিছু ভালই চলছিল আমাদের। দাদা একটার পর একটা বই লিখছিলেন আর নাম কামাচ্ছিলেন। হঠাৎ যে কী থেকে কী হয়ে গেল! বৌদি আর দিদিমণি মারা গেলেন। ক'বছর পর দাদাও। কেন কীভাবে এসব ঘটল কিছুই বুঝলাম না। যাই হোক এ বাড়িতে আছ এক রাতের জন্য, ভুলেও সন্ধ্যা নামার পর ঘর থেকে বের হবে না। আর যত কিছুই হোক, যত ভূমিকম্প, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো আর যত দুর্যোগই হোক খবরদার দোতলায় উঠতে যেও না। এ বাড়িতে প্রায়ই নানা রকম শব্দ শোনা যায়। সেগুলোতে কান দেয়ার দরকার নেই। রাতের খাবার দিয়ে যাব ঘরে। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়বে। আজকের রাতটা ভালয় ভালয় পার করে কাল ফিরে যেয়ো এখান থেকে।'

'জ্বি, আচ্ছা।' বাধ্য ছেলের মত মাথা দোলায় রেজওয়ান।

ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধ। কী মনে করে ঘুরে দাঁড়ালেন। 'ও ভাল কথা। এটা সাথে রাখো।' বলে পকেট থেকে একটা ত্রিশূল বের করে রেজওয়ানের হাতে দিলেন বৃদ্ধ।

হাতে নিয়ে ত্রিশূলটা দেখল রেজওয়ান। পাথরের তৈরি। 'কী করব এটা দিয়ে?'

'সময়ই বলে দেবে এটা দিয়ে কী করতে হবে।' বলতে বলতে বের হয়ে গেলেন বৃদ্ধ।

কিছুটা বিস্ময় আর কৌতুক নিয়ে ত্রিশূলটা পকেটে রেখে দিল রেজওয়ান। তারপর জিনিসপত্র রেখে চারপাশ ঘুরে দেখতে বের হয়ে এখানে এসে বসেছিল। এখন নানা কথা চিন্তা করতে গিয়ে হাতে ধরা ত্রিশূলটার দিকে চোখ পড়ল। আরেক দফা মজা লাগল কথাগুলো মনে করে।

দিনের আলো কমে আসছে আস্তে আস্তে। পাহাড়ি এলাকায় এমনিতেই তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা নামে। তার ওপর এখন শীতকাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিক অন্ধকার হয়ে যাবে। বসে আরও কিছুক্ষণ চারপাশের প্রকৃতি দেখতে

ইচ্ছা করছিল। কিন্তু অন্ধকার নেমে গেলে বাড়িটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে ভেবে উঠে পড়ল। হাঁটতে শুরু করল বাড়িটার দিকে। কিন্তু পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। পৌঁছতেই বৃদ্ধের কাছে এসময় ঘরের বাইরে থাকার জন্য আরও কিছু বকবকানি শুনতে হলো রেজওয়ানকে।

রাত তখন এগারোটার কিছু বেশি। মাটিতে পাতা চাদরের উপর শুয়ে এইচ.জি.ওয়েলসের 'দ্য ম্যাজিক শপ' পড়ছিল রেজওয়ান। বাইরে খুব সুন্দর জ্যোৎস্না নেমেছে। ঘরে বসেই অনুভব করতে পারল রেজওয়ান এই সময় জ্যোৎস্নাস্নাত পাহাড়ি অরণ্য দেখতে কতটা সুন্দর হতে পারে। দু'বার অবশ্য বাইরে যাবার চেষ্টা করেওছিল সে। জ্যোৎস্না দেখার জন্য। কিন্তু দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে বৃদ্ধ এমন ধমকে উঠেছিলেন যে জ্যোৎস্না দেখার আশা বাদ দিয়ে আবার ঘরে ঢুকে যেতে হয়েছিল। ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রেজওয়ান। 'ম্যাজিস্টিক। ট্রুলি ম্যাজিস্টিক।' নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

ঘুম আসছে। সারাদিনের জার্নির ধকল। বড় করে হাই তুলল। ঘরে ইলেকট্রিসিটি নেই। এতক্ষণ মোমবাতির আলোতে বই পড়ছিল। বইটা মাথার কাছে রেখে মোমবাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

রাত তখন কটা বাজে বলতে পারবে না। ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ করে। কী ব্যাপার? ঘুম ভাঙল কেন? তার ঘুম বেশ গাঢ়ই বলতে হবে। সাধারণত এক ঘুমেই সে রাত পার করে দেয়। তা হলে? আজ ভেঙে গেল কেন ঘুম? বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরল। আবার ঘুমাতে যাবে এমন সময় শব্দটা কানে এল। খুব আস্তে আস্তে হচ্ছে। সতর্কভাবে কান না পাতলে শোনা যায় না। মাটিতে ঘষটানোর শব্দ। কিছু একটা মাটিতে ঘষটে ঘষটে ঘরের এক দিক থেকে অন্য দিকে যাচ্ছে। শব্দের উৎস লক্ষ্য করে কান পাতল রেজওয়ান। প্রথমে মনে হচ্ছিল শব্দটা এ ঘরেই হচ্ছে। কিন্তু কিছুক্ষণ কান পেতে শুনে বুঝতে পারল শব্দটা এ ঘরে নয়, হচ্ছে উপরতলায়। ঠিক এ ঘরটির উপরেই। শব্দের তীব্রতা কিছুটা বেড়েছে আগের চাইতে। এখন আগের চাইতে জোরে হচ্ছে। আর শুধু ঘষটানোর শব্দই নয়। শুনে এখন মনে হচ্ছে কেউ দাপাদাপি করছে উপরতলায়। কিন্তু এত রাতে এ বাড়িতে দাপাদাপি করতে আসবে কে? বুড়ো চাকরটা ছাড়া তো এ বাড়িতে আর কেউ থাকে না। ওই বুড়ো নিশ্চয়ই এত রাতে দোতলায় গিয়ে হাইজাম্প প্র্যাকটিস করছে না। আর

ইঁদুর-আরশোলার পক্ষে তো এত জোরে আওয়াজ করা সম্ভব না। চরম বিরক্তি নিয়ে উঠে পড়ল রেজওয়ান। ব্যাগ থেকে টর্চটা বের করে বের হয়ে এল বাইরে। শব্দটা কোত্থেকে আসছে দেখা দরকার। শব্দ না থামলে বাকি রাত আর ঘুমাতে পারবে না সে।

এখনও জ্যোৎস্নায় ভাসছে সামনের পাহাড় আর অরণ্য। দেখে বিরক্তি কিছুটা কমে এল তার। শব্দটা এখনও থামেনি। হয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। আগের চেয়ে আরও বেড়েছে এখন। বাড়ি কেঁপে উঠছে শব্দের তীব্রতায়। করিডর ধরে দোতলায় যাবার সিঁড়িতে এল রেজওয়ান। তারপর অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকল দোতলায়। করিডোর আর সিঁড়ির এখানে ওখানে ভাঙা ইট, আবর্জনা আর আগাছায় ভর্তি। কত কাল পর আজ মানুষের পা পড়ল কে জানে। সাবধানে দেখে উঠতে হচ্ছে রেজওয়ানকে যাতে হোঁচট খেয়ে না পড়ে। সিঁড়ি জায়গায় জায়গায় ভেঙে অনেক গর্ত তৈরি হয়েছে। একবার তার একটাতে হোঁচট খেতে খেতে বেঁচেও গেল সে কোনওরকমে। অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত উঠে এল দোতলায়। ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাইরে এত সুন্দর জ্যোৎস্না কিন্তু তার একটু আলোও আসছে না দোতলায়। টর্চ জ্বেলে সামনে ধরল রেজওয়ান। লম্বা একটা করিডর। তার দু'পাশে বেশ কিছু রুম। করিডরটা শেষ হয়েছে একটা রুমে গিয়ে। এই করিডরে শেষ কবে মানুষের পা পড়েছিল কে জানে?

শব্দের উৎস লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে শুরু করল রেজওয়ান। করিডরের শেষ মাথায় যে রুমটা, যেখানে করিডরটা শেষ হয়েছে শব্দটা সেখান থেকেই আসছে। করিডরের অবস্থাও সিঁড়ির মতই। সতর্কভাবে হাঁটতে হচ্ছে। শব্দটা আগের মতই সারা বাড়ি কাঁপিয়ে হচ্ছে। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে অসহ্য যন্ত্রণায় কিছু একটা কাতরাচ্ছে। আস্তে আস্তে করিডরের শেষ মাথায় পৌঁছে গেল রেজওয়ান। এতক্ষণ কোন অনুভূতি হচ্ছিল না। কিন্তু করিডরের শেষ মাথায় দাঁড়ানো রুমটার সামনে আসতেই কেমন একটা ভয় এসে জেঁকে ধরল ওকে। ঠাণ্ডা কনকনে একটা অনুভূতি হতে লাগল। দাপাদাপি তখনও চলছে। রুমের দরজাটার উপর টর্চ ফেলল সে। মরচে ধরা লোহার দরজা। কাঁপা হাতে ধাক্কা দিল দরজায়। শব্দ করে পেছনে সরে গেল সেটা। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দটাও বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরে ঢুকল রেজওয়ান। বহু দিনের অব্যবহৃত ঘর। ধুলো-ময়লা, আবর্জনা আর মাকড়সার জালে ঢেকে আছে

রুমের সব আসবাবপত্র। বিশাল রুম। রুমের ভেতর সারি সারি করে রাখা শেলফ ভর্তি বই। রুমটার ঠিক মাঝখানে একটা টেবিল। তার উলটো পাশে রাখা একটা চেয়ার। চেয়ারের ঠিক পেছনে একটা বিরাট জানালা। জানালাটায় একটা গর্ত। বেশ বড়। দেখে মনে হয় ওই গর্তটা ব্যবহার করে এ ঘর থেকে প্রায়ই কেউ বের হয়। টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এসব দেখছিল রেজওয়ান। কিন্তু সেই শব্দটা কোথায়? যার জন্য এই মাঝরাতে ঘুম ফেলে উপরে উঠে আসা। সেই শব্দটা কোত্থেকে আসছিল চারদিকে তাকিয়ে খুঁজে বের করতে পারল না সে। এটা নিশ্চিত যে শব্দটা এরুম থেকেই হচ্ছিল। সে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল কেন? নাকি সে-ই ভুল শুনেছে? ভাল করে লক্ষ করল চারদিক। শব্দ করতে পারে এমন কিছু চোখে পড়ল না। ভাঙা জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে ঢুকছে ঘরে। সেই আলোয় হঠাৎ তার মনে হলো কে যেন বসে আছে চেয়ারে। ভাল করে চোখ কচলে তাকাল আবার। কোথায়? চেয়ার তো খালি। হেসে ফেলল। ভুতুড়ে বাড়িতে থাকলে যা হয়। দৃষ্টি, শ্রুতি, চিন্তা, কল্পনা সবই ভুতুড়ে হয়ে যায়। সামনে কিছু না থাকলেও চোখ কিছু একটা দেখে, কোন শব্দ না হলেও কান কিছু একটা শোনে। মাথা যা না তাই কল্পনা করে বসে। মাথা নেড়ে বের হয়ে এল রেজওয়ান রুম থেকে। করিডর ধরে আবার হাঁটা শুরু করল। করিডরের মাঝখানে আসতে শব্দটা আবার শুনতে পেল। মনে হলো কেউ পিছন পিছন আসছে। একথা মনে হতেই চকিতে ঘুরে দাঁড়াল সে। সোজা টর্চ মারল করিডরের অন্য প্রান্তে। অন্ধকার চিরে ফেলল টর্চের তীব্র আলো। ফাঁকা করিডর। কেউ নেই। বিরক্তির চরম সীমায় পৌঁছল রেজওয়ান। প্রচণ্ড রাগ হলো নিজের উপর। এসব কী ছেলেমানুষি করছে সে? কোথাও কিচ্ছু নেই অথচ সে নিজে নিজেই একটা হরর সিনেমা বানিয়ে ফেলছে। নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে।

'উপরে গিয়েছিলে কেন?' একতলায় পা দিতেই হুঙ্কার শুনল বৃদ্ধের।

'উপরতলা থেকে একটা শব্দ আসছিল। ঘুমাতে পারছিলাম না শব্দটার জন্য।'

'তোমাকে না বলেছি এ বাড়িতে প্রায়ই নানা রকম শব্দ শোনা যায়। এসব শব্দে কান দেবার দরকার নেই। তা উপরে গিয়ে কী দেখলে?'

'কোথায়? কিছুই তো দেখলাম না। শব্দটা লাইব্রেরি রুম থেকে আসছিল। সেখানে ঢুকতেই শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল।'

'তুমি লাইব্রেরিতে ঢুকেছিলে?' আতঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ।

'হ্যাঁ। কেন? লাইব্রেরিতে ঢুকলে কী হয়?'

'বাবা। দোহাই তোমার। এখনই চলে যাও এখান থেকে।'

'কী পাগলের মত কথা বলছেন?' বিস্ময় ঝরে পড়ল রেজওয়ানের কণ্ঠে। 'এত রাতে কোথায় যাব আমি?'

'জানি না কোথায় যাবে। তবে বাঁচতে চাইলে পালাও। সে তোমাকে বাঁচতে দেবে না।' কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধ।

'কে বাঁচতে দেবে না?'

'জানি না, কিচ্ছু জানি না। সে যে কে তা আজও বুঝতে পারিনি। কিন্তু একজন আছে। দাদাদের পরিবারের সবাইকে...'

কথা শেষ করতে পারলেন না বৃদ্ধ। প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল বাড়ি। মাটিতে ঘষটানোর শব্দ কানে এল আবার। শব্দ শুনে মনে হলো দোতলার করিডর ধরে সিঁড়ি পার হয়ে ভারি কিছু একটা নেমে আসছে নীচে।

'যাও, চলে যাও এখান থেকে। ছুটে পালাও। সে আসছে তোমকে ধরতে।'

'কিন্তু আপনি?' ইতস্তত করল রেজওয়ান। 'আপনাকে ফেলে কীভাবে যাই?'

'আমাকে নিয়ে ভেবো না। বুড়ো মানুষ, আছিই বা ক' দিন? আমাকে এই বাড়িতেই মরতে দাও।'

বৃদ্ধের কথা শেষ হতে না হতেই সামনে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল রেজওয়ান। এ কী দেখছে সে! এরকম কুৎসিত, কদাকার কোন জানোয়ার কি পৃথিবীর কোন জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়ায় দ্বিতীয়টা দেখা গেছে আজ পর্যন্ত? সে আর বৃদ্ধ সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে। আর দোতলার সিঁড়ির প্রথম ধাপে বসে তাদের দিকে চরম আক্রোশে তাকিয়ে আছে জীবটা। বিদঘুটে একটা অবয়ব। চোখদুটো মাথার দু'পাশে। ঘাড়টা বাঁকানো। চারটা হাত। দুটো হাত মানুষের মত কাঁধের দু'পাশ থেকে আর বাকি দুটো কোমর থেকে বের হয়েছে। মানুষের গড়নের সাথে একটা প্রাথমিক মিল আছে জন্তুটার। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে কোন সার্জেন তার নিপুণ হাতে একটা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষকে কেটে ছিঁড়ে এই রূপ দিয়েছে। শরীরের

দু'পাশ থেকে অনেকগুলো চিকন লম্বা শুঁড় বেরিয়ে পাক খাচ্ছে আশপাশে।

'এখনও দাঁড়িয়ে আছ? দৌড়াও।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছিল রেজওয়ানের। সম্বিৎ ফিরল বৃদ্ধের চিৎকারে। আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বের হয়ে এল সেই বাড়ি থেকে। দৌড়াতে শুরু করল জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। ওর পিছু পিছু জন্তুটাও তীব্র এক চিৎকার করে বাড়িটা থেকে বের হয়ে এসেছে। ওকে ধাওয়া করেছে এটা বুঝতে পারল রেজওয়ান। প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে সে। জ্যোৎস্নার আলোয় পথ খুঁজে নিতে অসুবিধা হচ্ছে না, কিন্তু এখন কোথায় তার গন্তব্য তাই তো সে জানে না। দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়াচ্ছে। পেছনে ধাওয়া করা জানোয়ারটার আওয়াজ আসছে কানে। দূরত্ব কমে আসছে আস্তে আস্তে। হাঁপাচ্ছে রেজওয়ান। আর বেশিক্ষণ ছুটতে পারবে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাকে ধরে ফেলবে জানোয়ারটা। নিজের শরীরের উপর গরম নিঃশ্বাস অনুভব করল রেজওয়ান। আর পারছে না। ভারি হয়ে আসছে হাত পা। পাথরে ঠোকর খেয়ে সামনে আছড়ে পড়ল হঠাৎ। পরমুহূর্তেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জন্তুটা। হাত চারটি দিয়ে জাপটে ধরল তাকে। ধস্তাধস্তি শুরু হলো। আপ্রাণ চেষ্টা করছে রেজওয়ান ওটার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার। জানোয়ারটা তার কালো লম্বা লম্বা শুঁড়গুলো দিয়ে গলা পেঁচিয়ে ধরল রেজওয়ানের। দম বন্ধ হয়ে আসছে। জানোয়ারটার মুখ থেকে গরম লালা ঝরে পড়ছে রেজওয়ানের মুখে। শরীর আস্তে আস্তে অবশ হয়ে আসছে। গলায় পেঁচিয়ে থাকা শুঁড়গুলোর চাপ বাড়ছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে বুঝতে পারল রজওয়ান। চকিতে একটা কথা মনে পড়ে গেল। শেষ একটা চেষ্টা। যেভাবেই হোক চেষ্টাটা করতেই হবে। হাতদুটো দিয়ে এতক্ষণ গলা থেকে শুঁড়গুলো আলগা করার চেষ্টা করছিল। এখন একটা হাত সেখান থেকে সরিয়ে প্যান্টের পকেটে ঢোকানোর চেষ্টা করল। তাতে আরও চেপে বসল গলায় শুঁড়গুলো। জিভ বের হয়ে এল তার গলার ভেতর থেকে। সময় নেই। তাড়াতাড়ি পকেটে হাত ঢুকিয়ে ত্রিশূলটা বের করল। সজোরে বসিয়ে দিল সেটা জন্তুটার শরীরে। মাংস ভেদ করে ঢুকে গেল সেটা। রেজওয়ানের শরীরের উপর থেকে ছিটকে দূরে সরে গেল জন্তুটা। জান্তব একটা চিৎকার বের হয়ে এল গলা দিয়ে। উঠে বসল রেজওয়ান। এখনও নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। চাঁদের আলোয় দেখতে পেল

মাটির উপর পড়ে থাকা জানোয়ারটা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। খুব অবসন্ন লাগছে তার। বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারল না। জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল মাটিতে।

রেজওয়ানের জ্ঞান যখন ফিরল তখন ভোর হয়ে গেছে। চারদিক ঝলমল করছে আলোতে। সূর্যের আলোয় মাটিতে পড়ে থাকা ত্রিশূলটা দেখতে পেল। হাতে তুলে নিল সেটা। জিনিসটা বৃদ্ধের হাতে পৌঁছে দিতে হবে। ভবিষ্যতে আরও কেউ হয়তো এটার জন্যই জন্তুটার হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে।

উঠে হাঁটা শুরু করল সে। গতকাল রাতটা স্বপ্ন না বাস্তব এখনও বুঝতে পারছে না। আর যদি বাস্তব হয়ে থাকে তা হলে এই জানোয়ারটা কোত্থেকে, কীভাবে এল? সবকিছুই কেমন যেন ঝাপসা ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে। নাঃ। এসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো ঠিক হবে না। কালরাতের স্মৃতি যত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া যায় ততই ভাল।

দিনের ঝলমলে আলোয় পাহাড়ি রাস্তা ধরে হেঁটে চলল রেজওয়ান। পেছনে অদৃশ্য একজন যে আড়াল থেকে তাকে অনুসরণ করে চলেছে সেটা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারল না।

জুলাই ১৭, ২০০২

দোতলার লম্বা করিডরটা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বৃদ্ধ রায়হান সাহেবের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল। কেন তা তিনি নিজেও জানেন না। আগে কখনও এমন হয়নি। একদম নতুন অনুভূতি। দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। হাতে ধরা লাঠিটা ঠকঠক করে কাঁপছিল। হঠাৎ খুব অবসন্ন লাগছে। আস্তে আস্তে আবার হাঁটা শুরু করলেন। করিডরের শেষ মাথায় লাইব্রেরি। ওখানে যাবার জন্যই ঘর থেকে বের হয়েছেন। কিন্তু কেন যেন তাঁর মনে হলো আজ তিনি আর লাইব্রেরি পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন না।

ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে তাঁর। এই জুলাই মাসে এমন ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস কোত্থেকে আসছে বুঝতে পারছেন না। কিন্তু এই ভীষণ ঠাণ্ডার মধ্যেও তিনি দরদর করে ঘামছেন। হাতে ধরা লাঠিটা তখনও কাঁপছে। যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাবে। মনে মনে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন সাহস সঞ্চয় করার। আজ কেন যেন কোন কিছুতেই কাজ হচ্ছে না। আর মাত্র কয়েকটা পা। তা হলেই তিনি পৌঁছে যাবেন লাইব্রেরিতে। কাঁপতে কাঁপতে লাইব্রেরির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন তিনি। বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা তখনও বাড়ি খেয়ে চলছে।

মরচে ধরা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সমস্ত ভয়, আশঙ্কা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। যে ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসটা তাঁর সারা শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছিল, যে অজানা আশঙ্কা আর আতঙ্কে হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে উঠে আসছিল বারবার, কোথায় সেই ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস, কোথায় সেই অজানা আতঙ্ক। মনে হলো যেন এক দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছেন। পেছন ফিরে করিডরের দিকে তাকালেন। কোথায়? এখন তো আর কোন ভয় লাগছে না।

লাইব্রেরির সারি করে রাখা বইয়ের শেলফগুলোর ভেতর দিয়ে তাঁর কাজের টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলেন। একসময় এই টেবিলটাই ছিল তাঁর সর্বক্ষণের সাথী। কত গল্প আর উপন্যাস যে তিনি লিখেছেন এই টেবিলে বসে! আজ এত সম্পত্তির মালিক তিনি। এসব কিছুই তিনি করেছেন শুধু তাঁর বই ছাপিয়ে। আজও মনে পড়ে যায় যৌবনের কথা। লেখাপড়া শেষ করে হন্যে হয়ে ঘুরছিলেন চাকরির জন্য। কিন্তু কোথাও সুবিধা করতে পারছিলেন না। হঠাৎ করেই একদিন কী মনে হলো কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। এক সপ্তাহ টানা পরিশ্রম করে লিখলেন একটা থ্রিলার। কিন্তু বেশ কয়েকটা পাবলিশার্সে ধর্না দিয়েও লাভ হলো না। প্রায় এক বছর পড়ে রইল তাঁর পাণ্ডুলিপি। হতাশার একদম শেষ সীমায় যখন পৌঁছে গেছেন ঠিক তখনই একদিন লেখাটা মনোনীত হলো। ব্যস সেই যে শুরু এরপর আর তাঁকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। একের পর এক রহস্যোপন্যাস লিখেছেন আর তাঁর ব্যাংক ব্যালান্স ফুলে ফেঁপে উঠেছে। অবশ্য তাঁর এখনকার যে করুণ পরিণতি তাও এই লেখালেখির জন্যই। আজ যে অভিশপ্ত জীবন তিনি যাপন করছেন তার জন্য দায়ী এই লেখালেখি। টেবিলের কাছে গিয়ে ড্রয়ার খুলে হাতে একটা জিনিস তুলে নিলেন।

কাঁপা হাতের মুঠোয় ধরা জিনিসটার দিকে পরম শ্রদ্ধা আর ভয় মেশানো দৃষ্টিতে তাকালেন। ছোট্ট একটা ত্রিশূল। পাথরের। ঈষৎ ছাইরঙা ত্রিশূলটার মাঝখানের ফলাটা ছোট। ভেঙে ছোট হয়নি। এভাবেই বানানো। সাধারণ ত্রিশূলের আকৃতির সাথে এখানেই এটার পার্থক্য। শক্ত করে ত্রিশূলটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরলেন তিনি। আজ নয় বছর ধরে আজকের দিনটাতে এই ত্রিশূলটাই তাঁকে বাঁচিয়ে যাচ্ছে। আজও কি পারবে?

বাজারে অনেক কাটতি তখন রায়হান চৌধুরীর বইয়ের। যে বই লেখেন

সেটাই জনপ্রিয় হয়। প্রকাশকদের হুড়োহুড়ি পড়ে যায় তার বই ছাপানোর জন্য। যাঁরা একসময় তাঁর দিকে ফিরেও তাকাননি, যাঁদের অফিসে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেও দেখা পাননি তাঁরাই এসে তাঁর হাতে পায়ে ধরেন একটা উপন্যাস ছাপতে দেয়ার জন্য। এরকম রমরমা অবস্থায়ই একদিন তাঁর নতুন একটা লেখা শুরু করেন। কাহিনিটা ছিল একজন থ্রিলার রাইটারকে নিয়ে। একবার একটা থ্রিলার লিখতে গিয়ে সে খেয়াল করে তার গল্পে সে যা লিখছে বাস্তবেও তাই হচ্ছে। একটার পর একটা অনুচ্ছেদ সে লিখে যাচ্ছে আর সত্যি সত্যিই আশপাশে তাই ঘটছে। সে সেটা যখন বুঝতে পারে তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ততদিনে লেখার কাজ শেষ। গল্পে শেষ পর্যন্ত লেখক মারা যায়। তার মনের সব পঙ্কিলতা ঢেলে যে অশুভ আত্মাকে সে বানিয়েছিল বাস্তবে সেটাই তাকে হত্যা করে। উপন্যাসটার নাম দেন তিনি 'নারকীয়'। লেখার কাজ শেষ হওয়ার পর তিনি নিজে যখন উপন্যাসটা পড়লেন, পড়ে তাঁর মনে হলো তাঁর জীবনের সবচেয়ে নাটকীয় উপন্যাসটা তিনি লিখে ফেলেছেন। এর আগের সবগুলো থ্রিলারকেই ছাড়িয়ে গেছে 'নারকীয়'। পাঠক সমাজে দারুণ জনপ্রিয় হবে এটি। পাবলিশারদের মধ্যেও হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে এটা নিয়ে।

পার্সেল করে পাণ্ডুলিপিটা তিনি পাঠিয়ে দিলেন সেই প্রকাশকের কাছে যিনি প্রথম তাঁর লেখা পছন্দ করেছিলেন। বই ছাপানোর কাজ শুরু হলো। দিন দু'য়েক পর হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার দিকে টেবিলে বসে নতুন কিছু একটা লেখার প্ল্যান করছিলেন। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও ভাল কোন প্লট মাথায় আসছিল না। উঠে যাবেন ভেবে খাতা বন্ধ করতেই কেন যেন মনে হলো লাইব্রেরি রুমে কেউ একজন এসে ঢুকেছে। লাইব্রেরিতে তিনি কখনও কাউকে ঢুকতে দেন না। কারণ নিরিবিলি পরিবেশ ছাড়া তিনি লেখালেখি করতে পারেন না। চারপাশে চোখ বুলালেন। কোথায় অন্য কেউ? কোথাও তো কেউ নেই। সারি সারি করে সাজানো শেলফ। ইচ্ছে করলেই শেলফগুলোর যে কোনটার আড়ালে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তাঁর লাইব্রেরিতে ঢুকে তাঁর সাথে এমন লুকোচুরি খেলবে কে?

মনের ভুল ভেবে উঠে পড়তে যাবেন আবার, এমন সময় পাশ থেকে মাটিতে কিছু একটা ঘষটানোর আওয়াজ শুনলেন। চকিতে ফিরে তাকালেন সেদিকে। এক মুহূর্তের জন্য অদ্ভুত একটা কদাকার জীবকে দেখলেন। তিনি

তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে সেটা আরেকটা শেলফের আড়ালে চলে গেল। ভীষণ একটা আতঙ্ক এসে ভর করল রায়হান সাহেবের মনে। এ কী দেখলেন তিনি? কী হচ্ছে এসব? যা দেখলেন তা কি কল্পনা না বাস্তব? আতঙ্কে সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে তাঁর। আবার শুনতে পেলেন সেই মাটিতে ঘষটানোর শব্দ। এবার আরও জোরে হচ্ছে শব্দটা। শব্দ শুনে বুঝতে পারলেন শেলফের আড়াল থেকে বের হয়ে জীবটা তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। শরীরের সব শক্তি সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ছুটে বের হয়ে গেলেন লাইব্রেরি থেকে। পেছনে শুনলেন জান্তব এক চিৎকার।

শীর্ণ লম্বা দুটি হাত। জায়গায় জায়গায় চামড়া উঠে মাংস বের হয়ে গেছে। হাতের আঙুলগুলো একটু অস্বাভাবিক। শরীরের নীচের অর্ধাংশ নেই। কোমর পর্যন্তই শরীর। ঘাড়টা বাঁকানো। চোখদুটো মাথার দু'পাশে। শরীরের দু'পাশ থেকে অনেকগুলো কালো লম্বা লম্বা শুঁড় বের হয়ে এসেছে। সব মিলিয়ে কদাকার কুৎসিত একটা অবয়ব।

কিন্তু এই অবয়বটা বাস্তবে সৃষ্টি হলো কীভাবে? এটা তো সেই পিশাচ যেটা রায়হান সাহেব তাঁর আগের উপন্যাসটায় সৃষ্টি করেছিলেন। তা হলে কি তাঁরও পরিণতি তাঁর গল্পের লেখকের মত হতে যাচ্ছে? একটা বুকচাপা আতঙ্ক তাঁকে আস্তে আস্তে গ্রাস করতে শুরু করল। নিজেকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। ওসব কিছু না। তাঁর মনের ভুল, সিম্পলি হ্যালুসিনেশন। কিন্তু মন কিছুতেই প্রবোধ মানতে চাইছে না। কল্পনার চোখে সেই অদ্ভুত জীবটাকে কতবার যে দেখেছেন উপন্যাসটা লেখার সময়! কিন্তু একে বাস্তবে কখনও দেখতে হবে তা কি কখনও ভেবেছিলেন? বিছানায় শুয়ে শুয়ে এসব ভাবছিলেন তিনি। এসময় আবার কানে এল সেই মাটিতে ঘষটানোর শব্দ। দু'হাত দিয়ে কান চেপে ধরলেন। শুনতে চান না তিনি এ শব্দ।

এর পরদিন তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন। একদিন পর তাঁর একমাত্র মেয়ে। দুজনই একই ভাবে। তাদের শরীর আর গলায় চিকন লম্বা কিছু দাগ পাওয়া গেল। ঠিক এরকমভাবে রায়হান সাহেবের উপন্যাসের চরিত্রগুলোও মারা গিয়েছিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন রায়হান সাহেব। এরকম হচ্ছে কেন? কী এমন পাপ তিনি জীবনে করেছেন যে এভাবে শাস্তি পেতে হবে। বুঝলেন এবার তাঁর পালা। একইভাবে তাঁকেও জীবন দিতে হবে ওই

পিশাচটার হাতে। তাঁর গত উপন্যাস 'নারকীয়'-এর নায়ক সেই থ্রিলার রাইটার-এর জীবনেও এমন হয়েছিল। পিশাচটা একে একে লেখকের সব প্রিয়জনকে হত্যা করে শেষে লেখককেও হত্যা করে। এখন রায়হান সাহেবের পরিণতিও তাই হতে যাচ্ছে। আরও মজার ব্যাপার হলো রায়হান সাহেবের উপন্যাসের থ্রিলার রাইটারও ঠিক একইভাবে একজন লেখককে নিয়ে থ্রিলার লিখেছিল। ওই থ্রিলারের লেখকটিও শেষ পর্যন্ত মারা যায়।

'এ তো দেখি বিশাল সিকুয়েন্স। এভাবে সিকুয়েলি সব থ্রিলার রাইটাররা মরতে শুরু করলে তো বিপদ। তখন ভূতদের নিয়ে লিখবে কে?' রসিকতার সুরে বললেন রায়হান সাহেবের ছেলেবেলার বন্ধু কামরুল হাসান। পেশায় তিনি ডাক্তার। তবে তাঁর সখ হলো পরলোকচর্চা। আর ব্ল্যাক ম্যাজিক। কী যে মজা পান তিনি এসব করে তা আজও বুঝতে পারেননি রায়হান সাহেব। কিন্তু আজ বাধ্য হয়ে তাঁকে তাঁর ছেলেবেলার বন্ধুর শরণাপন্নই হতে হয়েছে।

'তুমি আমার এ অবস্থায় রসিকতা করছ, কামরুল?' আহত সুরে বললেন রায়হান সাহেব।

'রাগ কোরো না, রায়হান। তোমার স্টোরিটা শুনে বেশ মজা লাগল তো তাই বললাম। তবে তোমার সমস্যার সমাধান অবশ্য একটা আছে।'

'সত্যি বলছ?' চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠলেন রায়হান সাহেব।

'হ্যাঁ, সত্যি বলছি।'

'কী সেটা? কী করতে হবে আমাকে বলো।'

'শোনো, রায়হান, আমরা আমাদের চারপাশে দৃশ্যমান যে জগৎটা দেখি এটাই কিন্তু সব নয়। অদৃশ্য একটা জগৎও সবসময় আমাদের চারপাশে বিরাজ করে। অন্ধকার অশুভ সেই জগৎটাকে আমরা দেখতে পাই না। অবশ্য সেই জগৎটাকে দেখার চেষ্টা না করাই ভাল। সেই অন্ধকার অদৃশ্য জগৎ আর আমাদের দৃশ্যমান এই জগৎটার মধ্যে কিছু করিডর বা চ্যানেল আছে। এই করিডর বা চ্যানেলগুলোও থাকে আমাদের দৃষ্টি বা আয়ত্তের বাইরে। তবে কিছু বিশেষ আচার বা সাধনার মাধ্যমে সেই চ্যানেলগুলো খুঁজে বের করা সম্ভব। শুধু খুঁজে বের করাই নয়, সেই চ্যানেলগুলো ব্যবহার করে আমাদের এই জগৎ আর অন্ধকার জগতের মধ্যে চলাচল করাও সম্ভব। তবে

কাজটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিপজ্জনক। সামান্যতম ভুলের জন্য কিংবা ক্ষণিকের অসাবধানতায় পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে।'

'তুমি আমাকে এসব ইতিহাস কেন শোনাচ্ছ, কামরুল?' অধৈর্য সুরে বললেন রায়হান সাহেব।

'ধৈর্য ধরো, রায়হান। আমাকে শেষ করতে দাও। যা বলছি তা মনোযোগ দিয়ে শুনে যাও। প্রয়োজন আছে বলেই তোমাকে এসব কথা বলছি। অপ্রয়োজনীয় কথা বলার মানুষ আমি নই তা তুমি জানো। হুঁ, যা বলছিলাম, সেই অন্ধকার জগতের কিছু জীব সবসময় সেই করিডর বা চ্যানেলের দরজাগুলোয় দাঁড়িয়ে থেকে সুযোগ খোঁজে কখন আমাদের এই জগতে ঢুকে পড়া যায়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো আমাদের এই জগৎ থেকে কেউ যদি তাদেরকে আহ্বান বা আমন্ত্রণ না করে তা হলে তাদের একার পক্ষে আমাদের এই জগতে ঢোকা সম্ভব নয়। তবে মানুষ ইচ্ছা করলে একা একাই অন্ধকার জগতে প্রবেশ করতে পারে। অন্ধকার জগতের কারও সহাযোগিতা প্রয়োজন পড়ে না।'

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ ওই শয়তানটাকে আমি দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসেছি আমার ঘরে।'

'বিলকুল।'

'কিন্তু কীভাবে?'

'দেখো, রায়হান। ব্যাপারটা হয়তো কাকতালীয়, কিন্তু বাস্তব। তুমি হয়তো গল্পচ্ছলেই তোমার কল্পনার সব রং মিশিয়ে একটা দানব বা পিশাচ বানিয়েছিলে। কিন্তু এখন তোমার সব কথা শুনে মনে হচ্ছে ঠিক তোমার উপন্যাসে সৃষ্টি করা দানবের মত কিছু একটা সত্যি সত্যি সেই অন্ধকার জগতে আছে। আর শুধু যে আছে তাই না সে অলরেডি তোমার দাওয়াতে আমাদের পৃথিবীতে এসেও পড়েছে। আমার ধারণা তোমার এ বাড়িতে কোথাও না কোথাও ওই রকম করিডর বা চ্যানেল রয়েছে। এবং সেটা থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তোমার লাইব্রেরিতে।'

'কিন্তু আমি কখন তাকে আমন্ত্রণ করলাম?'

'আরে, বেকুব, এই আমন্ত্রণ কি মানুষ কার্ড ছাপিয়ে করে? আমি মোটামুটি ধারণা করতে পারছি ঘটনাটা কী হয়েছিল। তুমি তোমার কল্পনার জগতে গিয়ে আপনমনে কল্পনা করছ পিশাচটাকে, আর তোমার হাত

কাগজের উপর ছুটে চলছে তাকে নির্মাণ করতে। এরকম একটা সময়ই তোমার কল্পনার সুতো ধরে কোন একটা করিডর দিয়ে পিশাচটা এসে পড়ে আমাদের জগতে।'

'তা এখন আমাকে কী করতে হবে?'

'রায়হান, পিশাচটাকে আমাদের জগতে নিয়ে এসেছ তুমি। ফেরানোর কাজটাও তোমাকেই করতে হবে। তুমি ফেইল করলে অন্য কারও পক্ষে পিশাচটাকে ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে কি না আমার সন্দেহ আছে। আর আমার ধারণা পিশাচটাও এটা খুব ভাল করে জানে। আর তাই সেও চাইবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাকে শেষ করে ফেলতে।'

'কিন্তু আমার স্ত্রী আর মেয়ের কী অপরাধ ছিল? ওদেরকে কেন প্রাণ দিতে হলো?'

'এ ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। তবে খুব সম্ভবত এটা হতে পারে যে তুমি ছাড়া তোমার ফ্যামিলি মেম্বারদের পক্ষেও হয়তো ওকে ফেরানো সম্ভব ছিল। অথবা তুমি যে সিকুয়েন্স মেইনটেইন করে গল্পটা লিখেছ সেই সিকুয়েন্স মেইনটেইন করে কাজ করলে হয়তো আমাদের জগতে স্থায়ী হওয়াটা তার জন্য সহজ হবে। অন্য যে কোন কারণও থাকতে পারে। এটা ওর সাথে কথা বলতে পারলে সঠিক জানা যেত।'

'আবার রসিকতা করছ?'

'সময় খুব কম, রায়হান। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।' গম্ভীর স্বরে বললেন কামরুল সাহেব।

'কিন্তু কী সেটা?'

'পাণ্ডুলিপিটা খুঁজে বের করো। সাথে যে কলমটা দিয়ে উপন্যাসটা লিখেছিলে সেটাও। যেখানে বসে লিখেছিলে সেখানে গিয়ে বসো। তারপর উপন্যাসটার যেটুকু বাস্তবে ঘটেছে সেটুকু রেখে বাকিটা পুড়িয়ে ফেলো। তারপর এমনভাবে উপন্যাসটা শেষ করো যাতে করে পিশাচটাকে আবার সেই অন্ধকার জগতে ফেরত পাঠানো যায়। একটা ব্যাপার মনে রেখো, তোমার উপন্যাসে তুমি যেভাবে পিশাচটাকে শেষ করবে বাস্তবে তোমাকেও তাই করতে হবে। সুতরাং এমন নাটকীয় বা অসম্ভব কিছু লিখে বোসো না যেটা বাস্তবে করতে পারবে না। তোমাকে তো আজ পর্যন্ত নাটকীয়তা ছাড়া সোজা সরল ভাবে কোন কিছু লিখতে দেখলাম না।' ঠাণ্ডা গলায় একনাগাড়ে

কথাগুলো বলে গেলেন কামরুল সাহেব।

কিন্তু নাটকীয় কিছু করার লোভ সামলাতে পারেননি রায়হান সাহেব। যেইমাত্র তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন পিশাচটার বাঁচা-মরা কিংবা ফিরে যাওয়া নির্ভর করছে তাঁর কলমের উপর সঙ্গে সঙ্গে কোথায় উবে গেল আতঙ্ক আর ভয়। সেখানে এসে ভর করল একটা প্রচণ্ড ক্রোধ। পিশাচটার জন্যই স্ত্রী-কন্যাকে হারিয়েছেন তিনি। এত সহজে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন তাকে তার জগতে? কখনোই না। তিল তিল করে কষ্ট দিয়ে তাঁর সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার শোধ তুলবেন তিনি। তাই উপন্যাসটা এমনভাবে শেষ করলেন, যেন প্রত্যেক বছর একটা নির্দিষ্ট দিনে পিশাচটা ফিরে আসতে পারে আর তিনি তাঁর মনের সাধ মিটিয়ে অমানুষিক কষ্ট দিয়ে আবার তাকে ফেরত পাঠাতে পারেন।

গত নয় বছর ধরে এমনটিই চলে আসছে। কামরুল সাহেব মারা গেছেন দু'বছর আগে। মৃত্যুর আগে রায়হান সাহেবকে বারবার বলে গিয়েছেন কাজটা মোটেও ভাল করছেন না তিনি। যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের বিপদ ঘটে যেতে পারে। কান দেননি রায়হান সাহেব। বলেছিলেন বিনা অপরাধে তাঁর স্ত্রী-কন্যাকে যে হত্যা করেছে তাকে তিনি কখনোই ছেড়ে দিতে পারেন না।

পাথরের ছোট্ট ত্রিশূলটা হাতে নিয়ে এইসব দৃশ্যগুলো এতক্ষণ ভেসে উঠছিল তাঁর চোখের সামনে। হঠাৎ কল্পনা থেকে বাস্তবে ফিরে এলেন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। হাতে সময় খুবই কম। তাড়াতাড়ি আয়োজন করতে হবে।

আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে জড়িয়ে সাদা চকের মন্ত্রপূত বৃত্ত এঁকে তার ভিতর বসে আছেন রায়হান সাহেব। হাতের মুঠোয় ধরা ছোট্ট সেই ত্রিশূলটা। সন্ধ্যা শেষ হয়ে রাত নেমেছে অনেকক্ষণ। চারদিকে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। কোন এক ভয়ঙ্করের আবির্ভাবের আতঙ্কে সব যেন নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ হয় গেছে। রায়হান সাহেব জানেন মাঝরাতের আগে কিছুই ঘটবে না। তারপরেও সাবধানতা অবলম্বনে বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি। সন্ধ্যা থেকে বসে থাকলে যে একাগ্রতা অর্জন করা যায় সেটার সুফল তিনি আগেও অনেকবার পেয়েছেন। ক্রমশ রাত বাড়ছে। সময় ঘনিয়ে আসছে পিশাচটার আসার। মনে মনে প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন রায়হান সাহেব।

ঠাণ্ডা কনকনে একটা বাতাস তাঁর হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। নাকে এসে

ধাক্কা মারল বিশ্রী একটা গন্ধ, গন্ধটা সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। মৃদু একটা হিসহিস শব্দ শুনতে পেলেন। লাইব্রেরি রুমটা নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবে আছে। কিন্তু এই ঘুটঘুটে অন্ধকারেও তিনি ঘরে অন্য একটি প্রাণীর উপস্থিতি টের পেলেন। এ সবই তাঁর পরিচিত। গত নয়টি বছর ধরে এই একই ঘটনা ঘটে চলেছে আজকের দিনটিতে। কিন্তু এতসব কিছুর মধ্যেও কোন একটি ব্যাপার যেন তাঁর কাছে অস্বাভাবিক লাগছে। কিন্তু কী সেটা? কিছুতেই ধরতে পারছেন না তিনি। প্রাণপণে চেষ্টা চালাচ্ছেন অস্বাভাবিকতাটা খুঁজে বের করার। অবশেষে ধরতে পারলেন রায়হান সাহেব। ঘরময় ছুটে বেড়াচ্ছে প্রাণীটা। কিন্তু মাটিতে ঘষটানোর কোন শব্দ নেই কেন? প্রতিবার তো এই শব্দেই তাঁর কান ঝালাপালা হয়ে যায়। তবে আজ নেই কেন শব্দটা? প্রাণীটার যে গড়ন তাতে তো ওই শব্দ ছাড়া তার পক্ষে নড়াচড়া করা সম্ভব নয়। তা হলে কোথায় গেল সেই শব্দ? হিসহিস শব্দটা বাড়ছে। তার মানে পূর্ণ অবয়বে আস্তে আস্তে রূপ নিচ্ছে প্রাণীটা। অস্বাভাবিকতাটা ধরতে পারার পর থেকে যে আতঙ্কটা বুকের মধ্যে জমা হচ্ছিল তা আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করেছে। কিছুতেই সেই আতঙ্কটা চাপা দিতে পারছেন না তিনি। আরও কিছুটা সময় এভাবেই কাটল। প্রাণীটার দাপাদাপি আরও বেড়েছে। রায়হান সাহেবের মনে হলো এভাবে বেশিক্ষণ চললে ভয়েই তিনি হার্টফেল করবেন। দেরি করে লাভ নেই। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।

মনে মনে প্রস্তুত হলেন তিনি। তারপর বরাবরের মত মাটিতে আঁকা চকের বৃত্তটার একজায়গায় অল্প একটু মুছে দিলেন যাতে প্রাণীটা মন্ত্রপূত বৃত্তে প্রবেশ করতে পারে। তারপর পেছনে সরে এলেন। অপেক্ষা করতে থাকলেন কখন প্রাণীটা বৃত্তে ঢুকবে। প্রাণীটার দাপাদাপি কমে এল। বৃত্তের ফাঁক দিয়ে প্রাণীটার তাঁর দিকে এগিয়ে আসা অনুভব করতে পারলেন রায়হান সাহেব। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে প্রাণীটা। এখনও মাটিতে ঘষটানোর কোন শব্দ কানে আসছে না তাঁর। আরেকটু কাছে আসতে দিলেন আর তারপর ত্রিশূলটা ডান হাতে শক্ত করে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রাণীটার উপর। বুকের মাঝখানে গেঁথে গেল ত্রিশূলটা। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল প্রাণীটা। শরীরের উপর থেকে এক ঝটকায় ফেলে দিল রায়হান সাহেবকে। লাইব্রেরির দেয়ালে আছড়ে পড়লেন তিনি। মৃত্যুর আগে কোনরকমে মাথা তুলে দেখতে পেলেন মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা প্রাণীটার কোমরের নীচে আরও দুটি

হাত। কোত্থেকে এল এ দুটি হাত? মাটিতে নেমে এল তাঁর মাথাটা। চোখদুটো বন্ধ হয়ে গেল। মারা যাওয়ার আগে রায়হান সাহেব জেনে যেতে পারলেন না নীচের হাতদুটো কীভাবে এল প্রাণীটার শরীরে। তবে বুঝতে পারলেন প্রাণীটার আবির্ভাবের পর থেকে একবারের জন্যও কেন তিনি মাটিতে ঘষটানোর শব্দ পাননি।

মোঃ মুশফিকুর রহমান মিশুক

অবাঞ্ছিত আবাস

এক

ময়-মুরুব্বিদের কাছে শোনা—অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর। কিন্তু অধিক খুশি হলে কী হয় তা তাঁরা বলে যাননি। বলে গেলে বোঝা যেত—মামনুন শফিকের এখন কী অবস্থা! অধিক খুশিতে খুব সম্ভবত ডগমগ। ডগমগ! ডগমগ!! ডগমগ!!! অতিরিক্ত আনন্দে অনেকটা আইঢাই করছেন তিনি। না, কিছু বলে স্বস্তি পাচ্ছেন না। নেহাত বয়স বেড়ে ভুঁড়ি গজিয়েছে, তা না হলে ডিগবাজি খাওয়ারও একটা সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

'ও কী!' চেঁচিয়ে ওঠেন মামনুন শফিকের স্ত্রী। 'ফুলদানি কেউ এভাবে রাখে? সোজা করে রাখো। গড়িয়ে পড়ে যাবে তো!'

আরে তাই তো, খেয়াল করেননি তিনি। ফুলদানিটা সোজা করে রেখে তিনি লজ্জিত চোখে স্ত্রীর দিকে তাকান। এসব গেরস্থ কাজ তিনি জীবনে করেননি। ওকালতি তাঁকে সে সুযোগ দেয়নি। কিন্তু তারপরও নিজের ঘর বলে কথা। আহা! কে ভাবতে পেরেছিল, এমন আকালের যুগে ঢাকা শহরের মত জায়গায় এত সস্তা দরে বাড়ি কিনে ফেলবেন!

অবশ্য বাড়িটার জন্য একটা ধন্যবাদ প্রাপ্য প্রাক্তন মালিকেরও। রেডিমেড বাড়ি। তাও দাম নিয়ে তেমন একটা দরাদরি করেননি। করবেনই বা কী? লোকটার এ কূলও গেল—ও কূলও গেল। বেচারা!

'বুঝলে, লাবণী...'

'হুম।' কুশনগুলো সোফায় সাজাতে সাজাতে উত্তর দেন।

'বল তো, পৃথিবীতে কোন্ দুটো জিনিস মানুষকে শান্তিতে থাকতে দেয় না।'

'জানি না তো,' বলতে বলতে ধপ করে সোফায় বসে পড়েন লাবণী। মোটা থলথলে শরীর নিয়ে হাঁসফাঁস করতে থাকেন। মধ্যবয়স, কাজ আর মানবে কেন? ফোঁস ফোঁস করে হাঁফ ছাড়তে ছাড়তে লাবণী বললেন, 'হঠাৎ এ কথা জানতে চাইছ কেন?'

'ওহ হো! উত্তর জানতে চেয়েছি, প্রশ্ন নয়।'

'বললাম তো জানি না। তুমি বল। শুনি।' উন্নাসিক কণ্ঠে বললেন লাবণী।

'শোনো তা হলে, সে দুটো হচ্ছে–সন্তান আর সম্পদ।' বলতে বলতে স্ত্রীর দিকে যেই না তাকিয়েছেন অমনি তাঁর চেহারাটা আমসি মেরে গেল। বুঝতে পারলেন কথাটা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারেননি। স্ত্রী অন্যভাবে নিয়েছে। মুখটা কেমন কালো করে ফেলেছে।

'ইয়ে...' ফাঁড়া কাটাতে চেষ্টা করেন তিনি। 'তুমি আবার কী ভাবতে কী ভাবছ? আমি আসলে ওই মিন করে কথাটা বলিনি। বিশ্বাস করো...'

'থাক।' কথা কেড়ে নেন লাবণী, 'তোমার আর দোষ কী? বিয়ের এগারোটা বছরেও তোমাকে একটা সন্তানের মুখ দেখাতে পারিনি, শান্তি আর...' বলতে বলতে মাথা নিচু করে চুপ করে যান। নারী জাতির চোখের জল ঢাকার চেষ্টা।

বেশ বিব্রত হন মামনুন, 'এই দেখো! পুরো কথা আগে শুনবে তো! সন্তান আর সম্পদের কথা আমি আমাদের ইয়েতে বলিনি–বলছিলাম এ বাড়ির আগের মালিকের কথা। সন্তান থেকেও নেই। একমাত্র ছেলে, তাও বাপকে দেখতে লণ্ডন ছেড়ে দেশে আসবে না। স্ত্রীও মারা গেলেন গেল মাসে। বেচারার এখন সম্পদ নিয়েও কোনও মাথা ব্যথা নেই। কেমন জলের দরে বাড়িটা বেচে দিয়ে গেল।'

'কোথায় যাবেন বলেছেন কিছু?' আসল ব্যাপার বুঝতে পেরে পরিস্থিতি হালকা করার চেষ্টা করেন লাবণী।

'গ্রামের বাড়িই তো বললেন।'

'লোকটার জন্য কষ্ট হচ্ছে। কত স্বপ্ন নিয়েই না বাড়ি করেছেন। কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এ বাড়ির প্রতিটা রুমে, ব্যালকনিতে, ছাদে...'

'এহ! ভাল কথা মনে করেছ তো! শোনো শোনো...' স্ত্রীকে কথা শেষ করতে না দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি, 'তুমি কিন্তু আজকালই ছাদে টাদে যেয়ো না। কাপড়-চোপড় শুকাতে দেয়ার থাকলে ব্যালকনিতেই দিয়ো।'

'কেন!' বিস্মিত হয় লাবণী। এমন অসম্ভব কথাও স্বামী বলতে পারল? নিজের বাড়ির ছাদ, আর নিজেরাই যাবে না? এও কী হয়?

'না, মানে...' ব্যাপারটা কীভাবে বললে কম হাস্যকর মনে হবে তাই

আগপাছ ভেবে নেন মামনুন শফিক, 'আসলে হয়েছে কী...এ বাড়ির মালিক যিনি ছিলেন তিনি যাওয়ার আগে বলে গেছেন, এ বাড়ির ছাদে যেন না যাই।'

'তারপর!' এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না স্বামীর কথা। এসব কী বলছে সে!

'তারপর আর কী? মিলাদ পড়িয়ে তারপর যাওয়া ভাল। বুঝলে না, কত খারাপ কিছু ঘোরাফেরা করে ছাদে। তা ছাড়া শোননি কখনও, বাড়ির মালিকানা বদল হলে আছরের দোষ হয়, মিলাদ পড়িয়ে বাড়ি বন্ধ করতে হয়। তা না হলে...'

রিনরিনে হাসির শব্দে থামতে হয় তাঁকে। অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। এতটা বছরে অনেকটা মোটা হয়েছে স্ত্রী। বয়স হামাগুড়ি দিচ্ছে কালো হয়ে বসে যাওয়া চোখে, কমে পাতলা হয়ে আসা চুলে, থলথলে মেদবহুল শরীরে। কিন্তু এই মিষ্টি হাসির এতটুকুও পরিবর্তন হয়নি।

কোনওমতে হাসি থামিয়ে বলতে পারলেন লাবণী, 'তার মানে তুমি ভূত-প্রেতের কথা বলছ! বিশ্বাস করো ওসব?'

'জিনে বিশ্বাস করি। পবিত্র কোরআনে আছে। এটা বিশ্বাস না করলে... এই! কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'ছাদে।'

'ছাদে মানে!'

'ছাদ চেনো না? ছাদে কী আছে দেখতে যাচ্ছি!' বলেই স্বামীকে আর দ্বিতীয় কথাটি বলতে না দিয়ে হন হন করে রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। মামনুন শফিকও আর কী করেন, স্ত্রীর পিছে পিছে ছাদের সিঁড়ি ভাঙা আরম্ভ করলেন।

ছাদে পৌঁছানো যেন নয়, বিস্ময়ের চূড়ান্তে পৌঁছে গেলেন যেন দুজনে। বাহারি ফুলের টব, বেতের চেয়ার-টেবিল, একটা সাদা ধবধবে রং করা দোলনা–সব মিলিয়ে বেহেশতি আয়োজন।

বাড়ির আগের মালিকের কথা ভেবে অবাক হলেন মামনুন। ভদ্রলোক আজব তো, একটা কিছু সরিয়ে নেননি। নাকি...যাওয়ার আগে ছাদেই আসেননি।

কিন্তু কেন! ছাদে তাঁর এত অভক্তি কেন? আমাদেরই বা ছাদে আসতে না করলেন কেন?

হঠাৎ চমক ভাঙে স্ত্রীর কথায়, 'কাণ্ড দেখেছ! এমন সুন্দর ছাদে কিনা আসতে নেই। আমি তোমার ওসব ভং চং শুনব না, বাপু। প্রতিদিন বিকেলে আমি আমার ছাদে আসব।' বলতে বলতে তিনি দোলনায় বাচ্চাদের মত জোরে জোরে দুলুনি খেতে লাগলেন। সুখ মানুষের বয়স কমিয়ে দেয়– বাড়িয়ে দেয় দুঃখ।

'ওই দেখো! কী সুন্দর!'

মামনুন শফিকও স্ত্রীর দেখাদেখি ওদিকে তাকালেন। এ বাড়ির চারপাশে অনেকগুলো বাড়ি। এদিকে সোজাসুজি দু-তিনটা বাড়ি পরেই একটা দোতলা বাড়ি। ওটার ছাদে ফুটফুটে চেহারার একটা মেয়ে বল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর পিছে পিছে একজন শুকনো মত মহিলা খাবারের বাটি হাতে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। ঝামেলার ব্যাপার। এতে সুন্দরের কী আছে তিনি ভেবে পান না।

'কী আশ্চর্য! মেয়েটা আমাকে হাত নেড়ে ডাকছে! ও কী করে বুঝল যে আমরা ওকেই দেখছি?'

'বাচ্চারা সব বোঝে। শুধু ম্যাডাম আপনি বুঝলেন না আমার পেটের ভেতর ছুঁচো নাচছে, ওটাকে থামানোর একটা ব্যবস্থা তো করা উচিত, নাকি!'

'আহারে বেচারা! চলুন!' মুচকি হেসে দুলুনি থামালেন। উঠে পড়লেন লাবণী।

সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে আসতে আসতে কিছুটা আনমনা হয়ে পড়েন মামনুন শফিক। কেমন যেন একটা খটকা লাগে মনে। না। স্ত্রী বলার আগ পর্যন্ত এক পলকও দৃষ্টি সরাননি মেয়েটার ওপর থেকে। তাঁর নিজেরও দেখতে ভাল লাগছিল পরীর মত মেয়েটাকে। কিন্তু এদিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল কখন?

মামনুন শফিক তখনও জানলেন না–তাঁর প্রশ্ন বিস্ময়ে রূপ নিতে বেশি সময় নেবে না।

দুই

মধ্য জিনিসটাই অদ্ভুত। মনকে কেমন যেন করে দেয়।

কেউ বলতে পারবে না মধ্য দুপুরে মনটা কেন আপনিতেই উদাস হয়ে যায়। মধ্য রাতও তেমন। কেমন যেন রহস্য আর ভাবালুতা ভরা।

একা একা শুয়ে নানা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমানোর চেষ্টা করতে লাগলেন লাবণী। স্বামী স্টাডি রুমে। ঘর গোছানোর কাজে হেল্প করায় কেসে সময় দিতে পারেননি। কাল নাকি কোনও এক বিধবার কেস কোর্টে উঠবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতা। আজ সারা রাত ও ঘরে কাটিয়ে দেয়া বিচিত্র নয়।

কাজ কাজ আর কাজ! বোকা লোকটা ভুলেই গেছে যে আজকে তাঁর স্ত্রীর জন্মদিন ছিল।

মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘুমাতে চেষ্টা করলেন তিনি।

ঘুম এসেও গেছিল প্রায়। হঠাৎ ভেঙে গেল। ঠাহর করেও বোঝা গেল না ঘুম ভাঙার কারণ কী। শুধু একটা গন্ধ পেলেন। কোনও কিছু পোড়ার গন্ধ। তিনি শতভাগ নিশ্চিত চুলায় কিছু পুড়ছে না। প্রতি রাতে চেক করেই ঘুমুতে আসেন। আর পতিদেবতা–এক কাপ চা করা দূরে থাক, জীবনে কোনওদিন চুলায় ম্যাচ জ্বেলে দেখেছে কি না সন্দেহ আছে। চরম বিরক্তি নিয়ে তিনি আবার ঘুমানোর চেষ্টা করতে লাগলেন।

ঢুপ...ঢুপ-ঢুপ...

চমকে উঠে বিছানায় বসেন তিনি। এবার বুঝতে পারলেন ঘুম ভাঙার কারণ কী। পেরেক ঠোকা হচ্ছে নাকি! পেরেক ঠোকার মত ভোঁতা শব্দ হচ্ছে কোথা থেকে? তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে স্বামীর স্টাডিরুমের দিকে রওনা হলেন তিনি। রাত-বিরাতে পেরেক ঠোকার রহস্য জানা উচিত।

ডাইনিং পেরোতেই দ্বিতীয়বারের মত চমকাতে হলো তাঁকে। স্টাডিরুমে আর যাওয়া হলো না। তাড়াতাড়ি ডাইনিং-এর লাইট জ্বেলে দিলেন।

ভীষণ বিস্ময় নিয়ে তিনি দেখতে থাকলেন, আজ দুপুরে পাশের ছাদে দেখা সেই ফুটফুটে মেয়েটা তাদের ডাইনিং টেবিলের নীচে বল নিয়ে বসে!

হাতে একটা পিতলের ফুলদানি। সেটা দিয়েই মেঝেতে ঠুক ঠুক করছে। এটার শব্দই পেরেক ঠোকার আওয়াজ ভেবে তিনি ভুল করছিলেন এতক্ষণ।

বড় বড় চোখ করে খানিকক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে থেকে আবার নিজের কাজে মন দিল মেয়েটা। থেকে থেকে বিড় বিড় করে কিছু বলছেও যেন। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

তিনি তড়িঘড়ি করে স্টাডিরুমের দিকে গেলেন। স্বামী মস্ত সমস্ত বই টেবিল জুড়ে খুলে রেখে তার উপর মাথা রেখে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছেন। কালবিলম্ব না করে তাঁকে ঠেলে ওঠানো হলো। 'শুনছ? এই, ওঠো! ওঠো বলছি!!'

'কীক্ কী হলো?' ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে বসতে বললেন তিনি।

'দেখবে, এসো!'

ডাইনিং রুমে এসে চোখ কপালে উঠে গেল মামনুনের। ঘোড়ার মত চিঁহিঁচিঁহিঁ করে কোনওমতে বলতে পারলেন, 'এই মেয়ে! তুমি এখানে কেন!'

মেয়েটি কোনও উত্তর দিল না। আপন মনে বিড় বিড় করতে লাগল।

তাজ্জব বনে যান দুজন। এ মেয়ে ঘরে ঢুকল কখন! ভেবে পান না মামনুনও। ঘরে সিগারেট খাওয়া স্ত্রীর বারণ। তাও নির্ধারিত– দিনে একটা। সেটাই পরম আবেশে নিঃশেষ করার জন্য রাতের খাওয়ার পর পরই ছাদে ছুটতে হয় তাঁকে। আজও গিয়েছেন। তবে কি মনের ভুলে দরজা বন্ধ করেননি? সে ফাঁকে কি...

কিন্তু এই রাত-বিরাতে মেয়েটা তার বাসা থেকেই বা বেরুল কেন? তার মা কি তাকে খুঁজছে না? রাজ্যের চিন্তা মাথায় এসে ঘোঁট পাকায় তাঁর।

'এই? তোমার মা কোথায়? তাকে না বলে এই রাতে বাসা থেকে বের হয়েছ—এটা কি ঠিক?'

হাতের ফুলদানিটা মেঝেতে ঠুক ঠুক করতে করতে বলল মেয়েটা, 'মার জন্য অপেক্ষা করছি।' বলেই পুট করে ডাইনিং টেবিলের নীচ থেকে বের হয়ে এল সে।

ভীষণ বিরক্তির উদ্রেক হলো মামনুন শফিকের মনে। ওর মার জন্য আমাদের ডাইনিং-এর তলে অপেক্ষা করছে মানে কী! এসব কী ধরনের ঢং! 'চল মেয়ে। তোমাকে দিয়ে আসি। তোমার মা এত রাতে তোমাকে ছাড়ল কোন্ আক্কেলে জেনে আসি। হারিয়ে যেতে যদি!'

মেয়েটা কোনও উত্তর দিল না, কেমন আর্দ্র চোখে তাকিয়ে থাকে লাবণীর দিকে। লাবণীও তাতে সিক্ত হন। 'ওকে বকছ কেন!' পরক্ষণে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি আমার কাছে এসেছ, না? ছাদ থেকে আজ হাত নাড়লে...আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে?'

মেয়েটা সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বরং হঠাৎ চোখ জোড়া বন্ধ করে ফেলল, সে অবস্থাতেই বলল, 'আগুন।'

'আগুন!!' চমকে ওঠেন দুজনে।

'কোথায়?' ভূতে পাওয়ার মত জানতে চাইলেন মামনুন।

মেয়েটা সে কথার উত্তর না দিয়ে আবার বলল, 'আগুন'।

কেমন যেন খটকা লাগে ওঁদের দুজনেরই। সত্যি। পোড়া গন্ধ আসছে যেন কোত্থেকে। সম্ভাব্য উৎস আন্দাজ করে দুজন দুদিকে ছুটলেন।

আগুন লেগেছে লাবণীর ঘরে। খাটের পাশে পাপোশে। মশার কয়েল কাত হয়ে আছে কাপড়ের পাপোশের ওপর। কয়েলটা সুদ্ধ মেঝেতে যম পোড়া পুড়ছে সেটা। বিছানার চাদর এলিয়ে ছিল মেঝেতে, আগুন তাতে লেগেছে। আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই পানি ছিটিয়ে আগুন নিভিয়ে একটু ধাতস্থ হতেই মনে পড়ে গেল মেয়েটার কথা, আশ্চর্য ঘ্রাণ শক্তি তো মেয়েটার। ভাল কথা, কোথায় ও!

দুজনেই হন্তদন্ত হয়ে ডাইনিং রুমে এসে আবিষ্কার করলেন মেয়েটা গায়েব! লাবণীই আবিষ্কার করলেন জানালা দিয়ে, 'ওই দেখো!'

মেয়েটা একা একা ফিরে যাচ্ছে। ওদের বাড়ির দিকেই। এবং সাথে ওর মা নেই।

'পারবে তো ফিরে যেতে! তুমি একটু এগিয়ে দিয়ে এসো না।'

স্ত্রীর আবদারে মেজাজ খারাপ হয় মামনুনের, 'পারবে ছাড়া কী! আসতে যখন পেরেছে তখন যেতেও পারবে। কাল ও বাড়িতে গিয়ে মহিলার সাথে কথা বলে আসব। আর ভাল করে চেক করে দেখো কিছু চুরি টুরি করেছে কিনা। ফুলদানিটা আমাদের ছিল নাকি?'

লাবণী মন খারাপ করা দৃষ্টি নিয়ে স্বামীর দিকে চাইলেন।

'তুমি এসব নিয়ে অত বাজে চিন্তা করে প্রেশার বাড়িও না। চল ঘুমুতে যাই।'

এবারে যেন ক্ষেপে গেলেন লাবণী, 'বাজে চিন্তা আমি করছি, না তুমি?

ফুলদানি মোটেও আমাদের না। আর তুমি ওকে চোর বলছ? অথচ দেখো, আজকে মেয়েটা কত বড় উপকার করেছে! তোমার দাদীর দেয়া খাট, পুড়ে গেলে এমন স্মৃতি টাকায় কিনতে পারতে?'

মামনুন কোনও উত্তর দিলেন না। এবং শুনতেও পেলেন না, ঢং ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে কোথাও। অশনি ঘণ্টা।

তিন

রহস্যময় মেয়েটার বাড়িতে মামনুন শফিকের আর যাওয়া হলো না। চার পাঁচ দিন কেস নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। ব্যস্ততা যখন শেষ হলো তখন তিনি আবিষ্কার করলেন অন্যকিছু।

তাঁর স্ত্রী লাবণী চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় পনেরো ঘণ্টাই ছাদে কাটায়! কিছু না। শুধু বসে থাকে। আর এক দৃষ্টিতে সেদিনের সেই রহস্যময় মেয়েটার বাড়ির ছাদের দিকে চেয়ে থাকে। স্ত্রীকে এ ব্যাপারে কিছু বললেন না তিনি। এমন ভান করতে লাগলেন যেন এসব কিছু তাঁর নজরেই পড়ছে না।

কিন্তু তাঁর এ ধরনের আচরণের কোনও মানেও খুঁজে পেলেন না। এমনও তো হতে পারে, তাঁর কোনও কথায় মনে কষ্ট পেয়েছে–এমন অসম্ভব ধারণাও তাঁর মনে উঁকি দিতে ছাড়ে না। যদিও আজ দীর্ঘ এগারো বছরের সংসার জীবনে স্ত্রীকে কোনও কটু কথাই বলেননি তিনি। কিংবা বলা যায়, ওকালতির ব্যস্ততা তাঁকে সে সুযোগ দেয়নি।

তিনি পুরো পরিস্থিতিকে তাঁর আপনার মত ছেড়ে দিলেন। টাইম ইজ দ্য বেস্ট হিলার। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু না।

পরিস্থিতি স্বাধীনতা পেয়ে আপন খুশিতে নিজেকে আরও ঘোলাটে করে তুলল।

বিকেলে ছাদে উঠেছিলেন। কোনও শব্দ না করে চুপি চুপি স্ত্রীর পেছনে এসে দাঁড়ালেন। ভীষণ অবাক হলেন তিনি। শুনতে পেলেন স্ত্রী বিড় বিড় করে কী যেন আপন মনে বকছেন। তিনি কান খাড়া করে যেটুকু উদ্ধার করতে পারলেন সেটা এ রকম দাঁড়ায়, 'এই! তুই কাল রাতে ওভাবে চলে

গেলি কেন?'

ক্ষণিকের বিরতি।

'না। ও রকম আমি খাই না।'

আবার বিরতি।

'ঠিক আছে। আমি তোকে বানিয়ে দেব।'

বিরতি।

'আমাকে মা বানাতে চাস? হব! হব!!'

বিরতি। ভীষণ একটা কষ্টে লাবণীর দুই ভ্রু কুঁচকানো।

'এত তাড়াতাড়ি চলে যাবি! কাল কখন আসবি?'

হতভম্ব মামনুন দূরের ছাদের দিকে তাকান। শেষ বিকেলের আলো খেলা করছে সব ছাদে। নির্দিষ্ট ছাদটায় যার থাকা নিয়ে এ মুহূর্তে তাঁর বিচলিত হওয়ার কথা, সে-ই নেই। শুকনো মত মহিলা সম্ভবত মেয়েটার মা, সেও নেই।

তিনি বিব্রতভাবে স্ত্রীর সামনে এসে দাঁড়ান।

আশ্চর্য! স্ত্রী খেয়ালও করল না যেন! যেন তাঁর কোনও অস্তিত্বই নেই। সেই একই অন্যমনস্ক দৃষ্টি, আর থেকে থেকে বিড় বিড়।

এতটাই সন্তান লালসা ভেতরে জিইয়ে রাখছিল সে, চিন্তা করতেই ভেতরটা কুঁকড়ে যায় তাঁর। সেই লালসা রাখতে রাখতে বউ এখন পাগলপ্রায়। পরের একটা মেয়ে তার কল্পনায় এসেও মা ডাক শোনাচ্ছে। সন্তানের জন্য এতই হাহাকার ছিল তো সে মুখ ফুটে কোনওদিন বলেনি কেন!

স্ত্রীর অন্যজগতে ভেসে যাওয়া চোখ জোড়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে হলো তাঁর। দত্তক সন্তানও লাবণীর মাতৃত্ব ঘোচাতে পারত!

নাহ! ওকালতি তাঁর শেষ জীবনটাও খেল। বছর আটেক আগে দত্তক নেয়ার চিন্তাটা মাথায় আসলে ওরকম একটা মেয়ে এখনই তাকে মা মা করে অস্থির করে তুলতে পারত।

হঠাৎ চমকে ওঠেন তিনি, সমস্ত শরীরে প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এ কী দেখছেন তিনি! এতক্ষণ স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন, অথচ একটিবারের জন্যেও তাকে পলক ফেলতে দেখলেন না! কী করে সম্ভব হচ্ছে এটা—এতক্ষণ পলক না ফেলে থাকা!

'এই লাবণী? লাবণী! তাকাও–তাকাও আমার দিকে। এই!'

যেন কাঁচা ঘুম থেকে প্রবল ধাক্কায় হঠাৎ জেগে ওঠার মত–প্রচণ্ড ভাবে লাফিয়ে উঠলেন লাবণী। বোকার মত খানিকক্ষণ আশপাশে তাকালেন। তারপর আপন মনেই বললেন, 'ওহ্।'

'কী হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ লাগছে?'

'না তো। তুমি কখন ছাদে এলে?' মিষ্টি হেসে বললেন তিনি। তারপর চারপাশে তাকিয়ে একটু মন খারাপ করলেন যেন। 'দেখলে, বেলা কত পড়ে এল, পুরি রেডি করে রেখেছিলাম, জাস্ট শুধু ভাজব। ভেবেছিলাম ছাদে বসে গরম পুরি আর চা খাওয়াব তোমাকে। ইস! আমি যে একটা কী!' বলতে বলতে লজ্জিত হেসে দোলনা ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি।

'থাক। নীচে চল। আজ বাসায়ই খাই। আমার স্টাডিও এখন শেষ হয়নি।' এতক্ষণ ছাদে যা ঘটল তা কোনও ভাবেই স্ত্রীকে জানালেন না তিনি।

সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসার সময় ও ছাদের দিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ করেই বুকটা কেঁপে উঠল তাঁর।

চার

পরিস্থিতি অনেকভাবে থামাতে চেষ্টা করেছিলেন মামনুন। লাভ হয়নি। সেটা ঘোলাটে থেকে বরং প্রস্তর কঠিন রূপ লাভ করেছে।

স্ত্রীর বিড়বিড় করে কথা বলা আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে গেছে। তনু তনু বলে কাকে যেন ডাকে।

দাঁত ব্রাশ করতে করতে রান্নাঘরে উঁকি দিলেন তিনি। স্ত্রী সকালের নাস্তা রেডি করছে। থেকে থেকে বিড়বিড়ও। ডিম পোচের প্লেটের দিকে তাকিয়ে মেজাজ খারাপ হলো তাঁর। আজ টানা তিন দিন ধরে এ অবস্থা। সব কটা ডিমের মাঝখান থেকে গোল করে কুসুম উধাও। ধারণা করে নিলেন সে মেয়েটার জন্যই। সে নিশ্চয় কুসুম খায় না? আশ্চর্য! মেয়েটা তাকে এত অধিকার করে নিল!

সেই রাতের পর আর দেখেননি ওকে এ বাড়িতে। তা হলে নিশ্চয় মাঝে মধ্যে ওর মায়ের সাথে এসেছে। তা না হলে ও কী খায় না খায় তা পর্যন্ত ওর নখাগ্রে থাকবে কী করে? কিন্তু ওর কথা একবারও তো বলল না লাবণী!

রান্নাঘর থেকে সরে আসতে আসতে মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি। মেয়েটার বাড়ি যাবেন ভেবেছিলেন। কেসের ঝামেলায় তাঁর যাওয়া হয়নি। আজ সিদ্ধান্ত নিলেন সে বাড়ি ঘুরে আসবেন। নাস্তা করার আগেই।

এ মুহূর্তেই।

ঝটপট কাপড় বদলে স্ত্রীকে কিছু না জানিয়েই বেরিয়ে পড়লেন তিনি। মলিন হয়ে আসা আকাশী রঙের দোতলা বাড়িটা খুঁজে পেতে তাঁর সময় লাগল না।

গেটের তালা খোলা। গ্যারেজের জন্য জায়গা রেখে সিঁড়ি উঠে গেছে উপরের দিকে। সেটা ধরে উপরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন তিনি। অমনি থমকাতে হলো তাঁকে। পেছন থেকে একটা আওয়াজ তাঁকে থামিয়ে দিল।

'এই যে, ভাই? কোথায় যাচ্ছেন?'

পেছন ফিরে তাকাতেই তিনি দেখতে পেলেন এক লোককে। গেটের বাইরে রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে। মধ্যবয়স। ডিম্বাকার টাকের উপর তুড়ি বাজাচ্ছে। কাঁচাপাকা গোঁফ আর চৌকোনা মুখ মিলে কেমন একটা সৌম্য চেহারা। লোকটা বাজারের ব্যাগ হাতে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে।

'পাগল নাকি আপনি? উপরে কোথায় উঠছেন?'

'ইয়ে...' কী বলবেন ভেবে পান না মামনুন।

'এলাকায় নতুন?' আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রশ্ন আসে।

'হুম।' সিঁড়ির তিন ধাপ ভেঙেছিলেন। আবার নেমে লোকটার সামনে আসেন। দোনো-মনো করে শেষে বলেই ফেললেন, 'এ বাড়িতে একটা ছোট্ট মেয়ে আছে না?'

'আছে নয়। ছিল।'

'মানে!'

'তনু নামের একটা মেয়ে ছিল। তার মা, বাবা আর দাদী মিলে থাকত। খুব খারাপ একটা ঘটনা ঘটায় ওরা চলে গেছে এখান থেকে। সেও প্রায় আজ দু বছর হতে চলল।'

মাথা বোঁ করে ঘুরে উঠল এক পাক। তনু! এ নামটাই তো স্ত্রীর মুখে শুনছেন আজ কদিন। কোনওমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলতে পারলেন, 'খারাপ ঘটনাটার কথা জানতে পারি?'

'অবশ্যই। কেন নয়? এলাকার মানুষ হিসেবে আপনাকে জানানো তো আমার কর্তব্য। তবে এখানে নয়। চলুন। সামনে এগোতে এগোতে বলা

যাক।'

আড়ষ্ট হয়ে আসা পা চালিয়ে লোকটার সাথে চলতে বড় কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। সে অবস্থায় শুনতে থাকলেন পুরো ঘটনা।

'এলাকায় মিষ্টি মেয়ে তনু খুব পরিচিতি পেয়েছিল। সাত বছর বয়স। হড়বড় করে কথা বলত। বাবা ব্যাংকে চাকরি করত। ওর মা আর দাদী থাকত বাসায়। খুব সুন্দর একটা পরিবার। কিন্তু মহিলাই ছিল যত নষ্টের মূল। ওদের বাসার নীচতলায় ব্যাচেলর ভাড়াটে থাকত। সে লোকের সাথে মহিলার অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কেউ জানত না। অসুস্থ শাশুড়ি নিজের ঘরেই থাকতেন বেশিরভাগ সময়। তনুই একদিন দেখে ফেলে। অন্যলোকের সাথে মাকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে খুব কান্নাকাটি করে। বাবা অফিস থেকে আসলে বাবাকে বলে দেবে বলে চেঁচাতে থাকে। হঠাৎ হতভম্ব হয়ে গিয়ে কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে মহিলা খাটের উপর থেকে বালিশ এনে মেয়ের মুখের উপর চেপে ধরলেন। শ্বাস বন্ধ হয়ে মেয়ে তড়পাতে থাকে। বালিশ তুলে যখন দেখলেন মেয়ে মরেনি তখন হাতের কাছে পিতলের শো পিস নিয়ে মেয়েটার মাথায় বাড়ি দিয়ে শেষে মেরেই ফেললেন।'

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে পড়ে লোকটার। 'বুঝলেন ভাই, হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ায় মহিলা এমন ভয়ঙ্কর কাজ করেছে। শেষে নিজেই পুলিশ ডেকে পুলিশের কাছে ধরা দিলেন। কিন্তু তাতে কী? অমন ফুলের মত মেয়েটা তো আর ফিরে এল না। সে বছরই তনুর বাবা এ বাসা ছেড়ে দেন। আচ্ছা ভাল কথা, আপনি তনুর ব্যাপারে এসব জানেন না, অথচ তনুকে চিনলেন কী করে?'

আসল দরজায় কড়া পড়ায় এবার মামনুনের নিজেরই অপ্রস্তুত অবস্থা। 'না মানে...জানি। ঠিক পুরোটা জানতাম না। ওই যে! আমার বাসা।' তাঁর বাসা দেখিয়ে দিয়ে কথা এড়ানোর চেষ্টা করেন তিনি। 'চলুন না। এক কাপ চা খাবেন।'

'না, না, ভাই। বাজার করা লাগবে। দেরিতে গেলে ভাল পাব না। আরেকদিন আসব না হয়।'

'আসলে খুব খুশি হব। আপনাদের এলাকায় এসেছি, চিন-পরিচয় থাকা ভাল।'

'সে আসা যাবে। কিন্তু ভাই একটা কথা–বিশ্বাস করি না, তাও লোকের

কাছে শোনা বলেই বলছি, ও বাড়ির ধারে কাছে যাবেন না।'

'কেন?'

'বাড়িটা ভাল না। খুনে বাড়ি।' গলা নামিয়ে বললেন লোকটা, 'মাঝে মধ্যে নাকি পিচ্চি মেয়ের কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায়। ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। আমি অবশ্য শুনিনি কখনও। তারপরও...সাবধান থাকা ভাল, বুঝলেন না?'

'হুম।' ভীষণ একটা অস্বস্তি নিয়ে বললেন মামনুন।

'তো ঠিক আছে। আজ চলি, তা হলে।'

'আসবেন কিন্তু।'

'হুঁ। হুঁ। অবশ্যই।' লোকটা হন হন করে বাজারের দিকে হাঁটা দিয়ে তাকে আরও বেশি অপ্রস্তুত হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল। ক্লান্ত পায়ে বাসায় ফেরেন তিনি। মনের উপর দিয়ে মস্ত একটা ঝড় বয়ে গেছে। সহজেই বুঝতে পারছেন—এ বিধ্বস্ত অবস্থা সারিয়ে তুলতে তাঁকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে।

মেয়েটা যদি দু'বছর আগে মারা গিয়ে থাকে তা হলে ছাদে দেখা কী করে সম্ভব...আর স্ত্রীই বা তা হলে কী করে জানল যে মেয়েটার নাম তনু...

সব ওই লোকের কথার সাথে মিলে যাচ্ছে। তা ছাড়া ওই রাতে দেখেছেন মেয়েটার হাতে পিতলের ফুলদানি—আজ লোকটাও বলল ওটা দিয়েই নাকি ওর মা...কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল হচ্ছে।

লোকটার কথাই ঠিক! প্রেতাত্মা হতে পারে!

হয়তো ও বাড়ির মায়া কাটাতে পারেনি বলে এখনও তাকে দেখা যায়—গল্প উপন্যাসে যেমনটা হয়। কিন্তু এ অসম্ভব জিনিসটা সম্ভব হলে আরও ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে চলেছে—মনে মনে ভাবেন তিনি।

তা হলে ধরে নিতে হবে, তার স্ত্রীর উপর সেই প্রেতাত্মা ভর করেছে!

ধরে নিতে হবে, সেদিন সিগারেট খেয়ে ছাদ থেকে ফিরে অবশ্যই তিনি দরজায় ছিটকিনি দিয়েছিলেন।

ধরে নিতে হবে, ওই প্রেতাত্মাই সেদিন আগুন লাগিয়েছিল। লাবণীকে মারতে। যেভাবে বিছানার চাদরে ধরে গিয়েছিল! লাবণী নাকি ঘুমানোর সময়ও পোড়া গন্ধ পেয়েছিল।

নাহ! কী সব বিশ্রী ভাবনা। বিরক্ত মুখে তিনি আরও দ্রুত সিঁড়ি ভাঙেন।

ডাইনিঙে নাস্তা রেডি। তিনি এসে চেয়ারে বসতেই স্ত্রী টি-পটে চা নিয়ে হাজির। তাঁর চোখে এখনও ঘোলাটে দৃষ্টি। বিড়বিড় করছেন। কিন্তু ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মনের ভেতর কেমন একটা অশনি ডেকে গেল। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল তাঁর।

'লাবণী?' ডাকলেন তিনি। যেন শুনতেই পেল না তাঁর স্ত্রী।

'লাবণী!' আরও জোরে ডাকলেন তিনি।

এবার যেন হুঁশ ফিরল তাঁর। প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে বেশি সময় লাগল না। এখন সব স্বাভাবিক। খাবার প্লেটের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে উঠলেন তাঁর স্ত্রী। 'একী! তুমি এ অভ্যেস শুরু করেছ কখন থেকে? এ কদিন প্রায়ই দেখছি ডিমের কুসুম আগে খেয়ে ফেল। আমারটাও। কুসুম ছাড়া ডিম দেখতে কেমন বিচ্ছিরি দেখায় না?'

'আর খাব না।' হাসার চেষ্টা করেন মামনুন।

'এই সাত সকালে কোথায় যাওয়া হয়েছিল স্যারের?' বাটার লাগানো পাউরুটিতে কামড় বসাতে বসাতে বললেন লাবণী।

'এই তো...একটু হাঁটতে। এ কদিনের কাজের চাপে মাথা খারাপের মত অবস্থা, তাই একটু ফ্রেশ হতে।' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু ভাবলেন তিনি। একটু কায়দা করে ওই মেয়েটার প্রসঙ্গ তুললেন।

'আচ্ছা, লাবণী, ছাদে দেখা ওই মেয়েটা–ওই যে, সেদিন আমাদের বাসায় ঘাপটি মেরে বসে ছিল, ও কি আর এসেছিল নাকি এ বাসায়?'

'কই, না তো? ছাদেও ইদানীং আর ওঠে না। শুকনো মত ওই মহিলাটাও না।'

'ও।' আর কিছু বললেন না তিনি। চুপচাপ নাস্তা খেতে লাগলেন। ভাবলেন, মেয়েটা বুঝি তার কল্পনাতেই আসে! স্বাভাবিক অবস্থায় যখন থাকে তখন তো বউ একেবারে সুস্থ।

মনে মনে সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেললেন। এ বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে চলে যাবেন। গোল্লায় যাক বাড়ি। স্ত্রীকে নিয়ে বহুদূরে চলে যাবেন তিনি, যেখানে তনু নামটা স্ত্রীর কানে বাজার চেষ্টা করবে না।

হ্যাঁ। খেতে খেতে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। এবার একটা বাচ্চা দত্তক নেবেন।

পাঁচ

রহস্যনামচার অধ্যায় শেষ ভেবেছিলেন।

এবার আবিষ্কার করলেন তার শুরু।

মামনুন শফিক যখন বাসায় ফিরে এলেন তখন বিকেল চারটা। পোশাক ছেড়ে ফ্রেশ হয়ে এসে আচানক মনটা ভাল হয়ে গেল তাঁর। কারণ, অনেকগুলো ভাল ব্যাপার আবিষ্কার করলেন তিনি।

প্রথমত, স্ত্রীর মধ্যে সব সময় যে অন্যমনস্ক একটা ভাব থাকত সেটা চলে গেছে।

দ্বিতীয়ত, সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছাদে থাকছে না। চমৎকার গৃহিণীপনা সারছে।

পরপর দুদিন এ রকম ঘটল। মনে মনে স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন তিনি। যাক, সব ঠিকঠাক হয়ে যাচ্ছে তা হলে।

বাড়ি বিক্রির কথা শুনে তাঁর উকিল-বন্ধু এ বাড়িটা কিনবে বলেছিল। মাঝখানে যে কদিন পাওয়া যাবে তার মধ্যে দূরে কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসা যায়। সেন্টমার্টিন—হ্যাঁ, লাবণীর প্রিয় জায়গা।

'বান্দরবান গেলে কেমন হয় বল তো? অনেকদিন যাওয়া হয় না। তোমার প্রিয় জায়গা।' স্ত্রীর কথায় হঠাৎ থতমত খেয়ে গেলেন তিনি। চা খাচ্ছিলেন। খানিকটা ছলকে পড়ল জামায়। কী কাকতালীয়! এমনটাই তো তিনি ভাবছিলেন এতক্ষণ। যাক। ছ-য়ে ছক্কা মিলে গেল।

তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে লাবণী বলে উঠলেন, 'লামায় যাওয়া যায়। ঘুরে আসাও হলো, রিপা-আরিফকেও দেখে এলে। রিপার বাচ্চাটা এখন স্কুলে পড়ে। ক্লাস ফোরে।'

মাথায় পুরো আকাশ ভেঙে পড়লে বরং এতটা অবাক হতেন না মামনুন শফিক। সাদাটে কাগজের মত হয়ে যাওয়া মুখ নিয়ে তিনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। রিপার কথা এ জানল কী করে? কোনওদিন বলা হয়নি তো!

রিপা তাঁর স্কুল জীবনের সহপাঠী– পরবর্তীতে প্রেমিকা। ভার্সিটি পর্যন্ত রিপা পাশে পাশে ছিল। ওর প্রতি গভীর প্রেমে সে সময়ও একা একাই হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। একতরফা প্রেম। তারপর রিপাকে সঙ্গে নিয়ে ডুব দেবার চিন্তা ভাবনা করছেন, ঠিক সে সময় আবিষ্কার করলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুটি এরই মধ্যে তাকে নিয়ে ডুব দিয়ে ফেলেছে। প্রেম নিবেদন শুধু নয়, বিয়ের কথা পর্যন্ত দুই পরিবারের মধ্যে পাকা হয়ে আছে। আরিফ তার বুকে খড়গ বসিয়ে সেদিন হাসতে হাসতে বলেছিল– সারপ্রাইজ দেবে বলে এতদিন জানায়নি।

সেই রিপা। সেই আরিফ। তাদের সন্তান। কিন্তু লাবণীর তো এসব জানার কথা নয়? কোনও ডায়েরি-ফায়েরিও লেখেননি কোনওদিন, তা হলে? রিপাই কি...

'কী ভাবছ?' ভ্রু নাচিয়ে জানতে চাইলেন লাবণী।

'কিছু না। মানে...তুমি...' মামনুন শফিকের মুখে কথা আটকে গেল। না। বুড়ো বয়সে পুরোনো প্রেম নিয়ে নাড়াচাড়ার জন্য নয়, বরং আরও বড় কিছুর আশঙ্কায়।

এবং সে আশঙ্কা তৎক্ষণাৎ সত্যে পরিণত হলো।

চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে রহস্যময়ীর হাসি হাসলেন লাবণী, 'তুমি গত মাসে রিপার সাথে বসুন্ধরা সিটিতে দেখা করতে গিয়েছিলে, আমাকে বলনি। কিন্তু আমি সব জানি।'

'কীভাবে!' থতমত খাওয়া আরক্তিম মুখে জানতে চাইলেন তিনি। কথা সত্যি। রিপা ওর দেবরের বিয়ের কেনাকাটা করার জন্য ঢাকা এসেছিল। কোনও একটা অদৃশ্য টানে বসুন্ধরা সিটি চলে গিয়েছিলেন। যদিও আরিফ ছিল, এবং সে-ই এই একত্রিত হওয়ার হোতা– তবুও...একটু চোখের দেখা!

কিন্তু তাঁর স্ত্রীর কাছে এ খবর এল কী করে?

'বললে না? কে বলেছে তোমাকে এসব?' জানার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি।

'ও বলেছে।' এবার যেন খানিকটা গম্ভীর হয়ে গেলেন লাবণী। আর দৃষ্টিও কেমন যেন বদলে গেছে। আগের সেই নিষ্পলক দৃষ্টি। কোনও কথা না বলে উঠে পড়লেন তিনি। বেডরুমের দিকে গেলেন।

ও-টা কে সেটা জানতে তীব্র ইচ্ছা হলেও মামনুনের আর সাহস হলো না

স্ত্রীর সাথে এ নিয়ে কথা বলার। তিনি নিজের স্টাডিরুমে ফিরে এলেন।

এতে লাভ হলো। মনের মেঘ আস্তে আস্তে সরে পড়তে লাগল। অস্বস্তি ভুলে গভীর মনোযোগে ওকালতি সংক্রান্ত বইপত্র নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। সন্ধ্যে গড়িয়ে কখন রাত এসে পড়ল সে খবর তাঁর নেই।

নেই বলেই জটিলতর কেসটার প্যাঁচ খুলে আসছে। তিনি আরও নিমগ্ন হয়ে পড়লেন। দেয়াল লাগোয়া তাক, হাত বাড়িয়ে পটাপট আরও বই পাড়তে শুরু করলেন। কিন্তু যেটা পাওয়ার আশায় তিনি তাক হাতড়াচ্ছিলেন সেটা এল না। তার বদলে এল অন্যকিছু।

বইয়ের মতই, কিন্তু বই নয়।

তিনি রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে অন্যকিছুর পাতা ওল্টালেন।

চমকে উঠলেন তিনি। বুকটা দুরুদুরু কেঁপে উঠল তাঁর। তিনি নিজেও কাঁপতে লাগলেন থরথর করে। অসম্ভব! অসম্ভব!

মামনুন শফিকের হাতে এ মুহূর্তে বই নয়, অ্যালবাম। ছবিতে ভরা। এ বাড়ির আগের সে মালিক, ভুলে ফেলে গেছেন। সে ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী, সন্তান। সাধারণ ছবি।

সাধারণ কিন্তু অবিশ্বাস্য।

কারণ ভদ্রলোকের পাশে যে মহিলা, সে মহিলা আর সেদিন ছাদে দেখা মেয়েটার সাথে থাকা মহিলার চেহারা হুবহু এক! একই রকম শুকনো পাতলা, বব-কাট চুল। সব। সব এক!

ছবিগুলো দেখতে থাকলেন তিনি। এর পরেরটা–তার পরেরটা–তার পরেরটা। এক। সত্যি ভীষণ মিল। কিন্তু তিনি তো মারা গেছেন!

চকিতে বিদ্যুৎ ঝিলিক খেলে গেল মাথায়। তৎক্ষণাৎ পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

অসম্ভব এবং শুনতে কিম্ভূত শোনালেও মনে মনে বেশ কটা যুক্তি তিনি দাঁড় করাতে চাইলেন–প্রথমদিন ছাদে এবং রাতে তার বাসায় যে মেয়েটিকে দেখেছিলেন সে তনু নামের মেয়েটারই আত্মা! মায়ের হাতে খুন হয়ে অতৃপ্ত বাসনায় ওই বাড়ি ছাড়তে পারেনি। অতৃপ্ত বাসনা এটাই যে–তার নিজের মা তাকে খুন করেছে বলে এখন তার ভাল মা দরকার। এ জন্য সে...তার পছন্দের মানুষটিকে ওর জগতে নিয়ে যায়। যেমন করে নিয়েছে এ বাড়ির আগের মালিকের স্ত্রীকে! এজন্যই তিনি ছাদে উঠতে মানা করেছিলেন?

শিউরে ওঠেন মামনুন। হাতে ধরে রাখা অ্যালবাম কেঁপে যায়–বিছানার চাদরে আগুন ধরানোর পেছনে তা হলে ও দায়ী! পুড়িয়ে মেরে লাবণীর আত্মাকে ওর জগতে নিয়ে যেতে চায় ও? রিপার কথা জানতে পেরেছে–কী বলেছে ও?

মুহূর্তের মধ্যে সব যেন ওলট পালট হয়ে গেল মামনুনের। দৌড়ে বেডরুমে আসেন। স্ত্রী নেই! বুক ধড়ফড় করতে থাকে। পলকের মধ্যে ছাদে চলে যেতে চাইলেন–পারলেন না। রুমের মধ্যেই খেই হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। কোথায় দরজা, কোথায় সিঁড়িঘর, সব যেন অচেনা মনে হলো তাঁর।

ছাদে আসার সিঁড়িটুকু ভাঙতে ভাঙতে তাঁর মনে হলো লক্ষ ক্রোশ পার হয়ে এসেছেন। লাবণীকে দেখতে পেলেন দোলনায়। চটজলদি স্ত্রীর কাছে এলেন। 'চলো। ভেতরে যাবে চলো! এখানে আর না! এ বাড়িতেও আর না!'

কোনও উত্তর নেই।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মামনুন খেয়াল করলেন, আজই প্রথমবারের মত দোলনা দুলছে না। চোখের দৃষ্টি ও স্ত্রীর শরীর, দুটোই শান্ত...স্থির।

এবং সে দোলনা লাবণী আর কখনও দোলাননি।

তথাপি...

'বাড়িটা তোমার পছন্দ হয়েছে?'

দোলনায় দোল খেতে খেতে বলল সারাহ, 'বাড়ি না ছাই! কেমন পুরোনো পুরোনো চেহারা। আমার পছন্দ হয়েছে এ ছাদটা–কেমন খোলামেলা...কী সুন্দর সাজানো...আরে দেখ দেখ! ও ছাদের পিচ্চিটা আমাকে হাত নেড়ে ডাকছে!'

সেদিকে তাকাল ইশতি। কিছুই চোখে পড়ল না।

'ওই দেখ আবার হাত নাড়ছে!' উচ্ছ্বসিত সারাহ।

মনে মনে বিরক্ত হলো সে, ওর স্ত্রী সব কিছু এত বাড়িয়ে বলে। মোটেও মেয়েটা হাত নাড়ছে না। দিব্যি বল নিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে, আর ওর পিছে পিছে খাবারের বাটি হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা মোটা মত মহিলা। সম্ভবত ওর মা।

তাহমিনা সানি

সংকেত

এক

নাহ্, এবার অব্রের কাছে না গেলেই নয়। এবারও যদি না যাই তাহলে নির্ঘাৎ বন্ধু বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। অব্রে ছবি আঁকে। শিল্পীদের অনেকেই খেয়ালী হয়। আর এই খেয়ালীপনা আমার বন্ধুটির মধ্যে পুরোমাত্রায়ই রয়েছে। খেয়ালী বলেই হঠাৎ করে শহর ছেড়ে একটা পুরনো কেল্লায় থাকতে গিয়েছে সে। বছরখানেক ধরে ওই পুরনো প্রাসাদ দুর্গটিতেই রয়েছে প্রিয় বন্ধু অব্রে।

প্রতি মাসেই সে আমাকে একটি করে চিঠি লেখে। এ পর্যন্ত আমি ওর কাছ থেকে বারোটি চিঠি পেয়েছি। চিঠিগুলোর বেশিরভাগ অংশ জুড়ে বাড়ির প্রশংসা। প্রায় প্রতিটি চিঠির শেষের দিকে লেখা থাকতঃ

'কপালগুণে খুব কম ভাড়ায় চমৎকার একটি বাড়ি পেয়ে গেছি, ভাই। শিল্পী আর সাহিত্যিকদের জন্যে এ একটি খাসা জায়গা। আমি অনেকগুলি চমৎকার ছবি এঁকে ফেলেছি। নিজের তুলির কাজ দেখে আমি নিজেই মুগ্ধ। সত্যিই কি আমি এই ছবিগুলি এঁকেছি!

তুইও তো লেখক। তোর লেখালেখির সরঞ্জাম নিয়ে এখানে চলে আয়। এখানকার পরিবেশ তোর কল্পনাকে এমনভাবে উদ্দীপ্ত করে তুলবে হয়ত তোর হাত দিয়েই একটি কালজয়ী উপন্যাস বের হয়ে আসবে। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাবি। নামী প্রকাশকেরা লেখার জন্য তোর দরজায় এসে ভিড় করবেন। কাজেই আর দেরি না করে চলে এসো, বন্ধু।'

অব্রের প্রতিটি চিঠির উত্তরে আমার জবাব ছিলঃ

'তোর ওখানে বেড়াতে যাব নিশ্চয়ই। হাতের কাজগুলো শেষ করেই চলে আসব। তুই কেমন জায়গায় থাকছিস, দেখতে আমারও খুব ইচ্ছে করছে।'

অব্রে তার শেষ চিঠিতে রীতিমত হুমকি দিয়ে লিখল ঃ

'তোকে এই শেষবারের মত আসবার জন্য লিখলাম। আর আসতে

অনুরোধ করব না এবং আর কোন চিঠিও লিখব না। যদি না আসিস ধরে নে তোর সঙ্গে আমার এখানেই বন্ধুত্বের ইতি।'

এই চরমপত্রকে কি আর অগ্রাহ্য করা চলে? কাজেই যাত্রার আয়োজন করতেই হলো। টিকিট কাটবার প্রয়োজন নেই, কেননা ট্রেনে করে যাব না আমি। লেখার টাকা দিয়ে একটি টু-সিটার গাড়ি কিনেছি। ড্রাইভিং-ও শিখে নিয়েছি। ঠিক করলাম নিজের গাড়িতে করেই দেড়শ' মাইল পথ পাড়ি দেব। একদিন সকালে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েও পড়লাম। বিকেল নাগাদ পৌঁছে গেলাম অব্রের বাড়িতে।

বাড়ি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এটা সাধারণ কোন বাড়ি নয়– এক বিরাট প্রাসাদ-দুর্গ! আদ্যিকালের দুর্গ। দুর্গটির অনেক জায়গা ভেঙেচুরে গেলেও তাতে এর বিশালত্ব নষ্ট হয়নি। যদ্দুর জানি অব্রে ছবি এঁকে খুব একটা কামাই করে না। সে এরকম একটা বিশাল প্রাসাদ দুর্গ ভাড়া করল কী করে? সে একলা মানুষ; এতবড় বাড়ি তার কোন কাজে লাগবে?

প্রাসাদ দুর্গের চারদিকে ঘিরে যে পরিখা ছিল, তা এখনও বোঝা যায়। ড্র-ব্রিজ বা টানা সেতুর উপর দিয়েই পরিখা পার হয়ে দুর্গে যেতে হত। শত্রু এলে সেতু তুলে ফেলা হত। সেই সেতুই হত প্রাসাদ দুর্গের তোরণের সামনের এক অতিরিক্ত আবরণ। সেতুর এ পাশে আমি থেমেছি। এবার গাড়ি নিয়ে সেতু পার হয়েই আমাকে প্রাসাদ দুর্গের তোরণের সামনে যেতে হবে।

গাড়ি চালিয়ে তোরণের সামনে এলাম। তোরণ থেকে অনেকটা দূরে প্রাসাদ-দুর্গ। অন্ততঃ আধ ফার্লং তো হবেই।

প্রাসাদ-দুর্গের জানালায় একখানা মুখ দেখা গেল। দূর থেকে হলেও সে মুখ আমি চিনতে পারলাম। অব্রের। গাড়ি দেখেই মুখখানা জানালার কাছ থেকে সরে গেল। একটু পরেই হাসিমুখে নিচে নেমে এল অব্রে। তাকে দেখে আমি গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লাম। মহা উল্লাসে অব্রে আমার হাত ধরে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিল। তার ঝাঁকুনির চোটে আমার হাত ব্যথা হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, 'এই যে প্রাসাদ-দুর্গটা দেখছিস, এটার নাম 'ওয়েলিংডন ক্যাসেল'। এক সময় এই প্রাসাদ-দুর্গটি খুবই বিখ্যাত ছিল। আশপাশের বিরাট অঞ্চল জুড়ে ছিল এখানকার সামন্ত প্রভুর জমিদারি। সামনে ঐ যে ছোট ছোট বাড়ি দেখছিস, ওগুলো কিছুদিন আগে ছিল না।

ওখানে ছিল বনভূমি। 'ওয়েলিংডন ক্যাসেল'-এর সামন্ত প্রভুদের নিজস্ব বনভূমি। ওখানে হরিণ চরে বেড়াত। রাজার বিশেষ অনুমতি ছাড়া কেউ হরিণ শিকার করতে পারত না। তবে ওয়েলিংডনের সামন্ত প্রভুদের রাজা হরিণ শিকার করার অনুমতি দিয়েছিলেন।'

প্রাসাদ-দুর্গ আর তার মালিক সামন্ত প্রভুদের প্রশংসায় অব্রে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। সে হড়বড় করে কথা বলেই চলেছে। বেশিরভাগ কথাই আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলো। মনে হলো এই বিশাল পরিত্যক্ত প্রাসাদে টানা এক বছর একদম একলা থেকে থেকে ওর মাথার নাটবল্টু বোধহয় ঢিলে হয়ে গেছে।

অব্রের বাক্যস্রোতে বাধা দিয়ে আমি এক ফাঁকে প্রশ্ন করলাম, 'গাড়ি কোথায় রাখব? এই প্রাসাদ-দুর্গে নিশ্চয়ই গ্যারেজ নেই।'

'তা নেই। কিন্তু আমার প্রাসাদে আস্তাবল তো আছে।'

অব্রে 'আমার' কথাটার উপরে একটু মাত্রাতিরিক্ত জোরই দিল। শুনে আমার হাসি পেল, তবে হাসিটা সামলে নিয়ে বললাম, 'আস্তাবল?'

'হ্যাঁ,' অব্রে সগর্বে বলল, 'আমার আস্তাবলটা বিরাট। সেখানে দু'শ' ঘোড়া রাখা যায়। এক সময় অত ঘোড়াই থাকত ওখানে। আস্তাবলটার অবস্থা আমার শোবার ঘরের চাইতে অনেক ভাল। এখন ওটা খালিই পড়ে আছে। তুই তোর গাড়ি ওখানে রেখে দে।'

গাড়িটি রাখলাম আস্তাবলে। তারপর অব্রের সঙ্গে প্রাসাদ-দুর্গের ভিতরে ঢুকলাম।

দুই

প্রথমেই এলাম হলঘরে। কী বিশাল ঘর! কিন্তু ঘরের অবস্থা এখন শোচনীয়। সিলিং-এর প্লাস্টার খসে পড়েছে। কাঠের পাটাতন ভাঙা। ঘরের এক কোণ দিয়ে উপরের দিকে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। তবে সিঁড়ির সঙ্গে কোন রেলিং নেই।

অব্রে জানাল, 'সিঁড়ির সঙ্গে ওক কাঠের রেলিং ছিল।'

'রেলিংটা এখন কোথায়?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'এ প্রাসাদ-দুর্গের কেয়ারটেকার দামী রেলিংটাকে খুলে নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে।'

আমি বললাম, 'বেশ বেশ! কেয়ারটেকার তো বেশ ভালই বাড়িঘর টেক কেয়ার করছে।'

মুচকি হেসে অব্রে বলল, 'তা ঠিকই বলেছিস। তবে ভাই ঐ সিঁড়ি দিয়েই আমাদের উপরে উঠতে হবে। আমি উপরে থাকি। সাবধানে উঠিস। নীচে পড়ে গেলে জখম তো হবিই, ভবলীলাও সাঙ্গ হয়ে যেতে পারে।'

বাঃ! কি চমৎকার কথা! শুনলে প্রাণটা একেবারে জুড়িয়ে যায়!

'আমার পিছু পিছু আয়। সাবধানে আসবি।'

অব্রের পিছু পিছু ভাঙাচোরা সিঁড়ি দিয়ে পৈত্রিক প্রাণটিকে একরকম হাতে নিয়েই উপরে উঠতে লাগলাম।

এক সময় দোতলায় এসেও গেলাম।

দোতলায় অনেকগুলো ঘর। তবে সবগুলো ঘরেরই ভগ্ন দশা। এরকম ঘরে মানুষ থাকতে পারে? থাকা অতিশয় বিপজ্জনক। কখন কী দুর্ঘটনা ঘটে যাবে কে জানে। হয়ত মাথার উপরে পাথর খসে পড়বে; নয়ত মেঝের ফাটলের ভিতর থেকে সাপ উঠবে ফোঁস্ করে। একটু অন্যমনস্ক হলে মেঝের গর্তের মধ্য দিয়ে এক তলায় পড়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

অব্রে বলল, 'এ মহলটা একেবারে ভেঙে গেছে। আমি এখানে থাকি না। আমি থাকি মাঝের মহলে। সেখানে কয়েকটি ঘর এখনও মোটামুটি থাকার মত অবস্থায় রয়েছে।'

সাবধানে আমাকে নিয়ে অব্রে মাঝের মহলে এল।

প্রাসাদ দুর্গের এই অংশে কয়েকটি ঘর এখনও আস্ত দেখলাম। শুধু তাই নয়, ঘরগুলোর দেয়ালে যে ওয়ালপেপার লাগানো ছিল তা অনেক পুরানো হয়ে গেলেও এখনও ছিঁড়ে যায়নি। ওয়ালপেপারের ছবিগুলো অবশ্য একদম অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই ঘরগুলো কী করে টিকে গেল অব্রে জানে না। এখানকার সবচেয়ে বড় ঘরটিকে সে তার স্টুডিও বানিয়েছে। এখানে বসেই সে ছবি আঁকে। গত এক বছর ধরে অব্রে যে সব ছবি এঁকেছে, সে সব এ ঘরে সযত্নে সাজানো রয়েছে। কয়েকটি ছবি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

পরিত্যক্ত এই প্রাসাদ-দুর্গ আমার বন্ধুর কল্পনাকে সত্যি উদ্দীপ্ত করে তুলেছে। অব্রের শিল্প প্রতিভা আক্ষরিক অর্থেই যেন বিকশিত হয়ে উঠেছে। তার কয়েকটি ছবির মধ্যে একজন দক্ষ শিল্পীর স্বাক্ষর চোখে পড়ল আমার।

কিন্তু অব্রে আমাকে ছবিগুলি না দেখিয়ে বরং আগে দেখাতে চাইছে তার বিশাল প্রাসাদপুরী। তার ঘরগুলি দেখলাম। আগেই বলেছি, সব চেয়ে বড় হলো তার স্টুডিও। তারপর অপেক্ষাকৃত ছোট দুটো ঘরের মধ্যে একটি হলো তার শোবার ঘর, অন্যটি রান্নাঘর। এর পরই চতুর্থ ঘরটি। এটি সে আমার থাকার জন্য বরাদ্দ করেছে। আমি আসব শোনার পর থেকে রোজ সে এ ঘর একবার করে ঝাড়ামোছা করে। শুনে ওর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মনটা ভরে গেল। অব্রের কারণে আমার থাকবার ঘরখানা মোটামুটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নই রয়েছে।

আমি জানতে চাইলাম, 'রান্না-বান্না কি তুমি নিজেই কর?'

'না রে ভাই, নিজে করি না। প্রাসাদের পিছন দিকে একটা বস্তি আছে। সেখান থেকে এক বুড়ি এসে রান্নাটা করে দেয়। আমার একলার সংসারের সামান্য কাজকর্মটুকুও সে করে। অবশ্য দিনের মধ্যে রান্না হয় একবারই। সন্ধ্যার অনেক আগেই বুড়ি নিজের বস্তিতে চলে যায়। এই পরিত্যক্ত প্রাসাদপুরীতে সে রাত কাটাতে মোটেই ইচ্ছুক নয়। কাজেই রাতের খাওয়ার জন্য টিনের খাবারই ভরসা। সে খাবারে চলবে তো?'

ভাবলাম, না চলে আর উপায় কি? কিন্তু অব্রেকে বললাম না সে কথা। একথা শুনলে সে হয়ত দুঃখ পাবে।

'সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে,' অব্রে বলল, 'আজ আর এই বিশাল বাড়ির সবকিছু তোকে ঘুরিয়ে দেখাতে পারব না, কাল দিনের আলোয় দেখাব। অনেক দূর থেকে এসেছিস। নিশ্চয়ই ক্লান্ত। আগে একটু বিশ্রাম করে নে তারপর রাতের খাওয়ার পাটটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলব।'

একটু রেস্ট নিলাম। তারপর অব্রে আমাকে নিয়ে গেল রান্নাঘরে। এখানে বসেই সে খাওয়া-দাওয়া করে। খেতে খেতে গল্প করতে লাগলাম দু'জনে।

অব্রে বলতে লাগল, 'বাড়িটা খুবই প্রকাণ্ড। এ বাড়ির চার পাঁচটি ঘর আমি ব্যবহার করি, যদিও গোটা প্রাসাদ-দুর্গই ভাড়া নিয়েছি। এর ভাড়া কত জানিস?'

'কত?'

'মাসে দশ শিলিং।'

'মোটে!' আমি হেসে ফেললাম।

অব্রে গম্ভীর হয়ে বলল, 'এ বাড়ির কেয়ারটেকারের ব্যবসা বুদ্ধির কমতি নেই। সে জানে, এই দশটা শিলিং-ই তার নগদ লাভ। এখানে এই পরিত্যক্ত প্রাসাদ-দুর্গ কে ভাড়া নেবে? আমি এখানে আসবার আগে বহুদিন ধরে এ বাড়ি খালিই পড়েছিল। এর ইট, কাঠ, পাথর চুরি হয়ে যাচ্ছিল। এ বাড়ির কেয়ারটেকার যখন দেখল, বাড়ি ভাড়া দিলে তার বরং লাভই হবে কারণ বাড়ি দেখাশোনা করার জন্য বিনিপয়সায় একজন ভাড়াটে সে পেয়ে যাচ্ছে। যাকে মাইনে দিতে হবে না; বরং তার কাছ থেকে মাসে দশটি করে শিলিং পাওয়া যাবে।'

'এ প্রাসাদ-দুর্গ কতদিনের পুরনো?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'অনেকদিনের পুরনো। ওয়েলিংডন বংশের সন্তানেরা দীর্ঘদিন এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। তাঁরা ছিলেন দেশের প্রথম শ্রেণীর জমিদার। এ অঞ্চল তো বটেই, এমন কি রাজধানী এবং রাজসভাতেও তাঁদের খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। সপ্তদশ শতকে স্টুয়ার্ট বংশের রাজা প্রথম চার্লস এই প্রাসাদ-দুর্গে কয়েকদিন থেকেও গিয়েছিলেন। যে ঘরটিকে আমি স্টুডিও বানিয়েছি হয়ত সে ঘরে বসেই রাজা বিশ্রাম নিতেন।'

আমি পরিহাসের সুরে তরল কণ্ঠে বললাম, 'এই আদ্যিকালের প্রাসাদে দু'চারটে ভূত না থাকলে তো মানায় না। তা ভূত-টুত আছে নাকি এখানে?'

'থাকতে পারে,' অব্রে হাল্কা গলায় উত্তর দিল, 'তবে আমি এখন পর্যন্ত ওরকম কিছু দেখিনি। অবশ্য বুড়ি ন্যানসি এ বাড়ি সম্বন্ধে অনেক কথাই জানে।'

'ন্যানসি কে?'

'ঐ যে, যে বুড়ি এসে আমার রান্না করে দিয়ে যায় তারই নাম ন্যানসি। বুড়ি এ বাড়ি নিয়ে গাল-গল্প শুরু করলেই আমি কাজের ছুতোয় স্টুডিওতে ঢুকে পড়ি। তোর সে সব গল্প শুনবার ইচ্ছা হলে বুড়ির কাছ থেকে শুনতে পারিস। একজন শ্রোতা পেলে সেও খুব খুশি হবে। তবে ন্যানসির কাছ থেকে গল্প শুনতে হলে দিনের বেলাতেই শুনতে হবে। কেননা সন্ধ্যা নামার আগেই সে নিজের বস্তিতে ফিরে যায়। সন্ধ্যার পর তাকে কোন মতেই

প্রাসাদ-দুর্গের সীমানার মধ্যে রাখা যায় না। বুড়ির মনটা কুসংস্কারে ভরা, আমি তার কুসংস্কার দূর করবার কোন চেষ্টাও অবশ্য করিনি। খামোকা সময় নষ্ট করে লাভ কী?'

তিন

সারাদিন গাড়ি চালিয়ে অনেকটা পথ এসেছি। দেহমনে ক্লান্ত ছিলাম। সোনা মুখ করে টিনের খাবার খেয়ে অব্রেকে শুভরাত্রি জানালাম। তারপরে চলে গেলাম আমার নির্দিষ্ট ঘরে। ঘুম পাচ্ছিল। কিন্তু এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। কয়েকখানা জরুরি চিঠি লিখতেই হবে। কাল সকালের ডাকেই চিঠিগুলি যাওয়া চাই।

ক্লান্ত মনে চিঠি লিখতে শুরু করলাম। শেষ করতে অনেকটা সময় লাগল। ঘুমঘুম চোখে আমি ঢুলছিলাম। আমার কলম আর এগোতে চাইছিল না। বেশ কষ্ট করেই চিঠিগুলি শেষ করলাম। তারপর পোশাক পাল্টে, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। অব্রে বিছানা পেতেই রেখেছিল।

ঘুম আসতে দেরি হলো না।

রাতে টানা ঘুম হয়নি। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গিয়েছে। অবশ্য ওগুলোকে ঠিক দুঃস্বপ্ন বলা চলে না। অতীত যুগের অভিজাতরা চিত্র শিল্পীদের মোটা অংকের দক্ষিণা দিয়ে নিজেদের ছবি আঁকিয়ে রাখতেন। সে রকম ছবি আমি অনেক দেখেছি। এই প্রাসাদে-দুর্গের মস্ত হলঘরের দেয়ালেও আমি সেরকম কয়েকটি ছবি টাঙানো দেখেছি।

সে রকম একজন অভিজাত পুরুষকেই আমি বারবার স্বপ্নে দেখেছি। অন্ততঃ তিনবার তো বটেই। একই লোককে আমি তিনবার স্বপ্নে তিনরকম অবস্থায় দেখলাম।

শেষবারের স্বপ্নটা পরিষ্কার মনে আছে। স্বপ্নে দেখলাম যেন সেই অভিজাত পুরুষটি দাঁড়িয়ে আছেন এই প্রাসাদ-দুর্গেরই আঙিনায়। তাঁর কাছ থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একদল সৈন্য। প্রতিটি সৈনিকের বন্দুকের লক্ষ্য সেই অভিজাত ব্যক্তিটি। সংকেত পেলেই সৈনিকেরা অভিজাত তাঁকে

লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বে।

স্বপ্নের মধ্যেই শিউরে উঠলাম। দারুণ আতঙ্কে আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম পাল্লা ভাঙা জানালার ভিতর দিয়ে ভোরের আলো ঢুকছে ঘরে। সবে ভোর হয়েছে। এখনও কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়া যায়। একখানা চাদর ভাঁজ করা ছিল পায়ের কাছে। ওটা টেনে গায়ে দিলাম। তারপর আবার নিদ্রাদেবীর আরাধনা শুরু করলাম।

ঘুম ভাঙল অব্রের ডাকাডাকি আর ঝাঁকাঝাঁকিতে। দুচোখ রগড়ে বিছানায় উঠে বসলাম। চারদিক রোদে ঝলমল করছে। বেলা এখন আটটার কম নয়। অব্রে বলল, 'বাব্বাঃ! তুই দেখছি খুব ঘুমোতে পারিস। কিন্তু না, আর ঘুম নয়, এবার উঠে পড়। চল, একটু ঘুরে আসি। খানিক দূরে একটা খাবারের দোকান আছে। সেখান থেকেই ব্রেকফাস্ট-টা সেরে নেব আমরা। আমি সকালে বেড়াতে গেলে ওখানেই নাস্তা খাই।'

অব্রে দু'কাপ কফি নিয়ে এসেছিল। একটা কাপ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজের কাপে চুমুক দিল।

অব্রেকে সুপ্রভাত জানিয়ে আমি জানতে চাইলাম, 'আচ্ছা, এই প্রাসাদ-দুর্গে কি কাউকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল?'

'হয়েছিল।'

'কাকে?'

'স্যর পিটার ওয়েলিংডনকে।'

'তিনি কে?'

'এক সময় তিনিই ছিলেন এই প্রাসাদ-দুর্গের মালিক,' অব্রে উত্তর দিল।

'কতদিন আগে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'সতের শতকে। অর্থাৎ স্টুয়ার্ট আমলে। স্যার পিটারকে তাঁর নিজের বাড়িতেই হত্যা করা হয়।'

'কেন?'

'সে এক ইতিহাস,' আমার প্রশ্নের উত্তরে অব্রে বলল।

আমি কৌতূহল নিয়ে বললাম, 'ঘটনাটা শুনি তো।'

'তুই নিশ্চয়ই জানিস স্টুয়ার্ট বংশের রাজা প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে ইংল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল। রাজার বিরোধী দলের নেতা ছিলেন অলিভার

ক্রমওয়েল।'

'জানি। তুই গল্পটা বলে যা।'

অব্রে বলতে লাগল, 'গৃহযুদ্ধে রাজার পক্ষ হেরে যায়। স্যর পিটার ওয়েলিংডন ছিলেন রাজা প্রথম চার্লসের অনুগত সামন্ত। তিনি রাজার পক্ষে থেকে 'রাউণ্ড হেড'দের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছিলেন। অলিভার ক্রমওয়েলের সৈনিকদের 'রাউণ্ড হেড' বলা হত।'

'কেন?'

'কারণ ক্রমওয়েলের সৈনিকেরা মাথার চুল খুব ছোট ছোট করে ছাঁটত। এই বিশেষ ধরনের ছাঁটার জন্যই তাদের বলা হত 'রাউণ্ড হেড'। যাক্ যা বলছিলাম– রাজা প্রথম চার্লসের তো প্রাণদণ্ড হলো। ইংল্যাণ্ডের রাজভক্তরা শিউরে উঠল এই নৃশংস ঘটনায়। রাজার প্রাণদণ্ডের পর স্যর পিটার ওয়েলিংডন আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি রাজভক্তদের নিয়ে ক্রমওয়েলের বিরুদ্ধে একটা সৈন্যদল গড়ে তুলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। স্যর পিটার ছিলেন অসমসাহসী। পলাতক অবস্থাতেও তিনি প্রায়ই রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে এই প্রাসাদ-দুর্গে আসতেন। এখানে রাতযাপন করতেন। তারপর ভোরের আলো ভাল করে ফুটবার আগেই চলে যেতেন নিজের গোপন আস্তানায়।

'কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না স্যর পিটার। তাঁর এক নিজের লোকই তাঁকে ধরিয়ে দিল ক্রমওয়েলের সৈনিকের হাতে। 'রাউণ্ড হেড'রা হন্যে হয়ে খুঁজছিল স্যর পিটার ওয়েলিংডনকে।

'একদিন রাতে স্যর পিটার প্রাসাদ-দুর্গে ঢুকবার পরই তাঁর সেই আত্মীয় তেতলার জানালা দিয়ে একটা পতাকা নাড়তে লাগল। এটাই ছিল ইশারা।

'রাউণ্ড হেড'রা কাছাকাছি ছিল। সংকেত পেয়ে তারা ছুটে এল। স্যর পিটার তখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ক্রমওয়েলের সৈনিকেরা অতর্কিতে প্রাসাদ-দুর্গে হানা দিয়ে স্যর পিটারকে টেনে হিঁচড়ে দুর্গের আঙিনায় নিয়ে এল। তারপর একসঙ্গে গর্জে উঠল তাদের বন্দুক। নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলেন স্যর পিটার ওয়েলিংডন। গতকাল যে আঙিনা দিয়ে তুই তোর গাড়ি নিয়ে আস্তাবলে গিয়েছিলি, সেই আঙিনারই কোন একটা জায়গায় পিটার ওয়েলিংডনকে হত্যা করা হয়।'

আমি বললাম, 'অব্রে, এই হত্যাকাণ্ডটাই বোধহয় আমি কাল রাতে স্বপ্নে দেখেছি। কিন্তু আমি এ স্বপ্ন দেখলাম কেন? আমি তো স্যর পিটারের ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। তবে কি কোন উদ্দেশ্য নিয়েই আমাকে এই হত্যার স্বপ্নটা দেখানো হয়েছে?'

আমার স্বপ্নের কথা শুনে অব্রে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ নিয়ে সে আর কথা বাড়াল না। আমাকে তাড়া দিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। দেখছিস না রোদ চড়ে যাচ্ছে।'

চার

অব্রের সঙ্গে অনেকক্ষণ ঘুরলাম। শেষ স্বপ্নটা দেখে মনটা বিগড়ে গিয়েছে। অতীতের একটা ঘটনা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে আমার কাছে এসেছিল? কিন্তু কেন? এই প্রশ্নটাই মনের মধ্যে বার বার ঘুরপাক খেতে লাগল। নতুন জায়গায় বেড়াতে গিয়েও বেড়ানোটা ঠিক উপভোগ করতে পারলাম না। খাবারের দোকানে গিয়ে মুখরোচক খাবার খেয়েও মনের বিগড়ানো ভাবটা কাটল না।

অনেকক্ষণ ঘুরলাম দু'জন। আশেপাশের কোন জায়গাই দেখতে বাকি রইল না।

প্রাসাদ-দুর্গের সামনেই একদা বিশাল বনভূমি ছিল। সেখানে হরিণ ঘুরে বেড়াত। এখানে ওখানে কয়েকটা বিরাট বিরাট গাছ ছাড়া সেই বনভূমির কোন চিহ্ন নেই আজ। যেখানে ছিল বনভূমি সেখানে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট অনেক বাড়ি। বাড়ির সারিগুলির মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছে লাল সুরকির অনেক রাস্তা। যারা প্রাসাদ-দুর্গের সম্পত্তি দেখাশোনা করছে তারা এক ইঞ্চি জায়গাও নষ্ট করেনি।

দেখলাম বহুকালের পুরনো ভগ্ন প্রাসাদ-দুর্গকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক আধুনিক শহর। শহর আয়তনে বাড়ছে। পরিখার ভিতর আধুনিকতার কোন চিহ্ন নেই। অতীত যেন এখানে থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু পরিখার বাইরে আধুনিকতার রাজত্ব। এখানে বিজলী বাতি, রেডিও, আধুনিক

আমোদ-প্রমোদ– এসব কিছুরই ব্যবস্থা রয়েছে। মুখর বর্তমান থেকে নীরব অতীতে ঢুকবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না। কিন্তু সে কথা কি অব্রেকে বলা যায়? সত্যি কথাটা বললে সে দুঃখ পাবে। কাজেই মনের কথাটা মনেই চেপে রেখে পরিখা পেরিয়ে আবার প্রাসাদ-দুর্গে ঢুকতে হলো।

দুপুরের খাবার সময় আমরা প্রাসাদ-দুর্গে ঢুকলাম। ন্যানসি বুড়ি রান্না-বান্না শেষ করে নিজের বাড়িতে চলে গিয়েছিল! আমাদের দু'জনের খাবার ঢাকা দেয়া ছিল। ঢাকনা খুলে আমরা খেতে বসলাম। খাবার তখনও গরম ছিল। খেতে ভালই লাগল। বুড়ির রান্নার হাত মন্দ নয়। খাওয়া শেষ হলে অব্রে তার স্টুডিওতে ঢুকল। রোজ এ সময়েই সে আঁকাআঁকি করে। আমিও আমার ঘরে চলে এলাম, দেখা যাক কিছু লেখালেখি করা যায় কিনা।

ঘরে গিয়ে কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। অনেকগুলি পত্রিকা থেকে লেখা চেয়েছে। কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে চেষ্টা চরিত্র করে যা লিখলাম, তা নিজেরই পছন্দ হলো না। দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে গেল। রান্নাঘর থেকে প্লেট আর পেয়ালার শব্দ শুনতে পেলাম। বোধহয় কেউ চা বানাচ্ছে। কে তৈরি করছে? ন্যানসি বুড়ি না অব্রে নিজে?

ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের কাছে গেলাম। না, বুড়ি নয়, অব্রে নিজেই চা তৈরি করছে। তাকে সাহায্য করার জন্য আমি এগিয়ে গেলাম।

চা-এর পাট শেষ হলো। অব্রে বলল, 'চল, এবার তোকে ভাল করে প্রাসাদ-দুর্গটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনি।'

আমি আপত্তি করলাম, 'সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। এখন এই ভাঙাচোরা প্রাসাদ-দুর্গের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে কী হবে? তাছাড়া সকালেই তো একবার দেখলাম।'

কিন্তু শ্রীমান অব্রের মনে এখন উৎসাহের জোয়ার বইছে। সেখানে ভাটা আনা আমার কম্ম নয়। অব্রে উত্তেজিতভাবে বলল, 'একবার দেখেছিস তো কি হয়েছে। এ এক ঐতিহাসিক প্রাসাদ-দুর্গ। একে বার বার দেখা যায়। তাছাড়া এই বিশাল প্রাসাদের সবকিছু তুই এখনও দেখিসনি। সকালে যা দেখিস নি, এবার তাই তোকে দেখাব। চল।'

অব্রের উৎসাহে আমি খুব একটা উৎসাহবোধ করছিলাম না। তবে সে কথা বলে আমি বন্ধুটিকে আঘাত দিতে চাইলাম না। কাজেই আর কোন আপত্তি না করে অব্রের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

কী বিশাল প্রাসাদ-দুর্গ! এর মধ্যে কত যে ঘর– কত বারান্দা! কোন ঘর একেবারে ভেঙে গিয়েছে, কোন ঘর আবার অর্ধেক ভাঙা। কোন ঘরের সিলিং ফেটে গিয়েছে। কোথাও আবার মাথার উপরে ছাদই নেই। মাথার উপরে দেখা যাচ্ছে তারাজ্বলা আকাশ। অনেক জায়গায় বারান্দা ভেঙে গিয়েছে। সে সব জায়গায় লাফিয়ে লাফিয়ে গর্ত পার হতে হলো। পুরনো সিঁড়ির ধাপ ভেঙে যাওয়ায় অনেক বারই প্রাণটি হাতে করে দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে উপরে উঠতে হলো, নীচে নামতে হলো। এসব দড়ি নিজের ওঠা-নামার জন্য অব্রে নিজেই টাঙিয়েছে।

এমনিভাবে বাড়ি দেখতে দেখতে যখন ছাদে এলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা।

অব্রে বলল, 'এ বাড়ির আর দুটো জিনিস দেখাব তোকে। তার একটা ছাদেই রয়েছে। আর একটা রয়েছে তেতলায়। প্রথমে ছাদের জিনিসটাই দেখাচ্ছি। ঐ দেখ একটা ছোট গীর্জা। গীর্জার মধ্যে একটা মার্বেল পাথরের বেদী রয়েছে।'

কথা বলতে বলতে অব্রে আমাকে ছাদের ছোট গীর্জাটার কাছে নিয়ে গেল। দেখলাম সত্যিই একটা মার্বেল পাথরের বেদী রয়েছে গীর্জার মধ্যে। বেদীর উপরে একটি কাঠের ক্রুশ।

অব্রে বলল, 'ঐ যে ক্রুশ দেখছিস, ওটা বেথেলহেম থেকে আনা।'

'তাই নাকি?' আমি অবাক হয়ে বললাম।

অব্রে সগর্বে বলল, 'তবে আর বলছি কী, তুই নিশ্চয়ই জানিস যে মানুষের ত্রাণকর্তা প্রভু যীশুর জন্ম হয়েছিল বেথেলহেমের এক আস্তাবলে। মা মেরী তাঁকে রেখেছিলেন ঘোড়ার খাবার রাখবার একটা কাঠের পাত্রের মধ্যে। যীশুর কয়েকজন শিষ্য সেই পবিত্র পাত্রের কাঠ দিয়ে কয়েকটি ক্রুশ তৈরি করেছিলেন। বেদীর উপরের ঐ ক্রুশ হল তারই একটি। ঐ ক্রুশ মহা পবিত্র। কেননা একদা ঐ ক্রুশ প্রভুর পবিত্র দেহের স্পর্শ পেয়েছিল।'

অজ্ঞাতসারেই গভীর শ্রদ্ধায় মাথাটা নিচু হয়ে এল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'বেথেলহেমের ক্রুশ এই দূর দেশে এল কি করে?'

অব্রে জবাব দিল, 'মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করার জন্য অনেক ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। পবিত্র ভূমিকে উদ্ধার করার জন্য তারা গিয়েছিল প্রাচ্যদেশের ঊষর মরুপ্রান্তরে। ওয়েলিংডন বংশের সন্তানদের মধ্যেও কয়েকজন ধর্মযুদ্ধে

যোগ দিয়ে বীরত্বের জন্য খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁদেরই মধ্যে কেউ বেথেলহেম থেকে ঐ পবিত্র ক্রুশ এনে নিজের প্রাসাদ-দুর্গের গীর্জার ভিতরকার বেদীর উপরে স্থাপন করেছিলেন। এমনি করেই বেথেলহেমের মহাপবিত্র ক্রুশ এসে যায় এই দূরদেশে।'

'গল্পটা শুনতে ভালই,' আমার মুখ ফসকে কথাটি বেরিয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারলাম আমার উৎসাহহীনতা দেখে বন্ধুবর অব্রে একটু মনঃক্ষুণ্ণই হল।

তবে এক সেকেণ্ড বাদেই ধর্ম প্রচারকের উৎসাহ নিয়ে আমাকে বলতে লাগল, 'আমার রাঁধুনী ন্যানসি বুড়ি ঐ ক্রুশ সম্বন্ধে অনেক কথা জানে, তাকে একবার জিজ্ঞেস করলেই অনেক গল্প শুনতে পাবি। আমিও অনেক গল্প শুনেছি তার কাছ থেকে। এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বিশ্বাস ঐ ক্রুশের নাকি অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। এখানকার লোকে কোন বিপদে পড়লে এই প্রাসাদ-দুর্গে এসে ক্রুশ ধোয়া জল নিয়ে যায়। তাতেই নাকি সবরকমের বিপদ থেকে মুক্ত হয় তারা। তাদের অসুখ বিসুখও নাকি সেরে যায় ঐ জল খেলে।'

কথা বলতে বলতে আমরা তেতলায় নেমে এলাম। আমি বললাম, 'এখানেও কি দেখাবার মত কোন জিনিস আছে?'

'আছে,' অব্রে উত্তর দিল, 'আরে সেটাই এখন তোকে দেখাব।'

'জিনিসটা কি?' আমি একটু কৌতূহলী হয়েই প্রশ্ন করলাম।

'একটা জানালা,' অব্রে উত্তর দিল।

'জানালা!' আমি অবাক হয়ে বললাম।

'হ্যাঁ, জানালাটা আছে পিছন দিকে। স্যর পিটার ওয়েলিংভনের এক বিশ্বাসঘাতক আত্মীয় ঐ জানালা পথেই লাল নিশান দেখিয়ে সংকেত পাঠিয়েছিল 'রাউণ্ড হেড'দের। স্যর পিটার তখন গোপনে প্রাসাদ-দুর্গে এসেছিলেন। সংকেত পেয়েই আশেপাশে লুকিয়ে থাকা 'রাউণ্ড হেড'রা এসে হানা দিয়েছিল প্রাসাদ-দুর্গে। স্যর পিটার ধরা পড়েছিলেন শত্রুর হাতে। তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।'

আমাকে নিয়ে অব্রে এল জানালাটার কাছে। সত্যি বলতে কী জানালাটা দেখে আমার সমস্ত শরীর মন শিউরে উঠল।

জানালাটায় পাল্লা নেই। লোহার গরাদগুলো খুব পুরনো। কালের

কবলে পড়ে সেগুলিতে মরচে ধরে গিয়েছে। গরাদগুলোর নিচের সিমেন্ট খুলে গিয়ে কিছুটা আলগাও হয়ে গিয়েছে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। পরিখাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পরিখার ওপরে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। এক সময় ওখানেই ছিল ওয়েলিংডনদের সংরক্ষিত বনভূমি। এখনও ওখানে কয়েকটা গাছ রয়েছে।

আমি বললাম, 'ঐ ফাঁকা জায়গাটা কি এখনও এই কেল্লারই সম্পত্তি?'

অব্রে বলল, 'না না, ওসব জায়গা বিক্রি হয়ে গিয়েছে। যারা কিনেছে তারা এখনও বাড়ি তুলতে পারেনি। একটু দূরে সারির পর সারি ছোট ছোট বাড়ি দেখতে পাচ্ছিস না?'

'ফুলের বাগানওয়ালা বাড়িগুলো তো?'

'হুঁ, ভাবা যায় ওখানেও একসময় বনভূমি ছিল! দূরের জমি আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। তাই সেখানে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছে। একদা গভীর রাতে ঐ বনভূমির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে 'রাউণ্ড হেড'রা এই কেল্লায় হানা দিয়েছিল। স্যর পিটার ওয়েলিংডনকে তাঁর নিজের দুর্গের আঙিনাতেই গুলি করে হত্যা করেছিল তারা।'

গরাদের নিচে সিমেন্ট নেই। বৃষ্টির জলের ঝাপটায় সেখানে কতগুলি গর্ত তৈরি হয়েছে। আমি অন্যমনস্কভাবে একটা গর্তের ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে নাড়তে লাগলাম, খোঁচাখুঁচি করতে গিয়ে সিমেন্টের একটা বিরাট চাঙর নীচে খসে পড়ল। দেখলাম নীচে একটা গর্ত। এ গর্তটা খালি নয়, একখণ্ড কাপড়ের মত একটা জিনিস রয়েছে সেখানে।

'এটি আবার কী?' বলতে বলতে আমি গর্তের ভিতর থেকে কাপড়টি টেনে বের করলাম। কাপড়খানা ধুলোয় ভরা। আমি সেটি ঝাড়বার জন্য জানালার বাইরে হাত বাড়িয়ে দিলাম।

'কি সর্বনাশ! একি করছিস?' বলতে বলতে অব্রে আমার হাত চেপে ধরার জন্য নিজেও জানালার বাইরে হাত বাড়াল। ততক্ষণে আমি কাপড়টি দু'বার ঝেড়ে ফেলেছি।

পাঁচ

'একি করলি তুই?' আমার হাত থেকে জোর করে কাপড়টি ছিনিয়ে নিয়ে আর্তনাদ করে উঠল অব্রে।

'কেন, কী হয়েছে?' আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'হতে আর বাকি রয়েছে কী?' অব্রে একই সঙ্গে আর্তনাদ এবং গর্জন ছাড়ল।

'তোর কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,' আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম।

'গর্তের ভিতর থেকে তুই কী বের করেছিস জানিস?'

'কেন, একটা পুরানো কাপড়।'

'ওটা সাধারণ কোন কাপড় নয়। ও হলো সেই রক্তপতাকা। ঐ পতাকা নেড়েই স্যার পিটার ওয়েলিংডনের বিশ্বাসঘাতক আত্মীয় 'রাউণ্ড হেড'দের সংকেত পাঠিয়েছিল।

ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। কাপড়টি যে একটি পতাকা তা দেখে বোঝা যায়। ওটার রঙ যে এক সময়ে লাল ছিল, তাও বুঝতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

অত্যন্ত বিচলিতভাবে প্রায় আর্তনাদের সুরেই অব্রে বলল, 'দেখছিস তো, কী সর্বনাশ তুই করেছিস?'

অজানা ভয়ে মনটা কুঁকড়ে গেলেও মুখে সাহস দেখিয়ে বললাম, 'কী এমন করলাম যাতে সর্বনাশ হবে?'

অব্রে বলল, 'তুই পতাকাটাকে জানালার বাইরে নিয়ে গিয়ে ঝাড়লি তো?'

'হ্যাঁ, ঝাড়লাম। তো?'

'তাতেই তো সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।'

'কি রকম?' আমি বিমূঢ়ের মত প্রশ্ন করলাম।

'এই ভর সন্ধ্যেবেলা ঐ রক্তপতাকার সংকেত যে কী ভয়ংকর হতে পারে, তা কি বুঝতে পারছিস না? অতীতের ঐ সংকেতে স্যার পিটার

ওয়েলিংডনের প্রাণ গিয়েছিল... আর বর্তমানে...' বাক্যটা শেষ না করেই অব্রে থেমে গেল।

'বর্তমানে কী?' আমি একটু বিরক্ত হয়েই প্রশ্ন করলাম।

'বুঝতে পারছিস না, বর্তমানে স্যর পিটার ওয়েলিংডনের হত্যাকারীদের হাতেই আমাদের প্রাণ যাবে।'

মনে মনে একটু ভয় যে পাইনি, তা নয়। কিন্তু মুখে হাসি টেনে বললাম, 'কি আবোল-তাবোল বকছিস অব্রে? স্যর পিটার ওয়েলিংডনের 'রাউণ্ড হেড' হত্যাকারীরা নিজেরাই তো কতকাল আগে মরে গিয়েছে।'

'মরলেই যে সব শেষ হয়ে যায়, একথা তোকে কে বলল? প্রেতাত্মারও তো প্রতিহিংসা নেবার ইচ্ছা থাকতে পারে।'

'তুই বলছিস ক্রমওয়েলের সেই 'রাউণ্ড হেড' সৈনিকেরা এখনও প্রেতাত্মা হয়ে আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে?'

'তা হওয়া বিচিত্র নয়।'

'কিন্তু বন্ধু, আমি প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করি না।'

'তোর বিশ্বাস বা অবিশ্বাসে তাদের কিছু আসে যায় না। চল এবার নীচে যাই।'

আমার হাত ধরে অব্রে দোতলায় নেমে এল। রক্তপতাকা পড়ে রইল তেতলার সেই জানালার নিচের ধূলি ধূসরিত মেঝেতে।

দোতলায় এসে অব্রে বলল, 'চল রান্নাঘরে। তাড়াতাড়ি খাওয়ার পাটটা মিটিয়ে নিই।'

'এত তাড়াতাড়ি খাব কেন? এখনও এমন কিছু রাত হয়নি,' আপত্তি করলাম আমি।

'এখনই খেয়ে নিতে হবে,' অব্রে বলল, 'পরে হয়ত খাবার সময়ই পাব না।'

'কী হেঁয়ালি ভরা কথা বলছিস!'

'হেঁয়ালি নয় রে হেঁয়ালি নয়,' অব্রে বলল, 'দেখছিস না পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে রাত। অন্ধকার যত গাঢ় হবে, ততই অপ্রাকৃত অশুভ শক্তিগুলি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকবে। নরকের অতল গহ্বরের দরজা খুলে যাবে। নরকের মহা অমঙ্গলময় অশুভ শক্তির প্রভাবে কায়াহীনেরা দেহ ধারণ করবে। তারা আসবে আমাদেরই কাছে। আমাদের আত্মা নিয়ে যাবে

অনন্ত নরকে। আমরাই তো রক্তপতাকা নেড়ে তাদের সংকেত পাঠিয়েছি।'

শিল্পীরা কল্পনাপ্রবণ হয়। কিন্তু অব্রের কল্পনা যে এতটা উৎকট হতে পারে তা আগে ধারণাই করিনি। বোধহয় এই ভগ্ন প্রাসাদ-দুর্গে একা একা থাকবার ফলেই ও এরকম উৎকট কল্পনাপ্রবণ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

রান্নাঘরে বসে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম দু'জনে। তারপর পোশাক পরে বললাম, 'তোর যেহেতু ধারণা আজ রাতে প্রেতাত্মারা এখানে হানা দেবে কাজেই চল, আজ রাতটা কোন হোটেলে গিয়ে কাটিয়ে আসি।'

'প্রস্তাব মন্দ নয়। চল, তাহলে এখনই বেরিয়ে পড়ি।'

অব্রে এগোতে গিয়ে জানালার কাছে এসেই থমকে গেল। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে শুকনো গলায় অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল।

আমি বললাম, 'কী রে, কী হলো? হঠাৎ অমন করে হেসে উঠলি যে?'

'এদিকে আয়।'

আমি অব্রের কাছে গেলাম।

'বাইরে তাকা,' শুকনো গলায় অব্রে বলল।

তাকালাম।

'কী দেখছিস?'

'কী আর দেখব। এই নিকষ-কালো অন্ধকারে কী কিছু দেখা যায়?'

'কিছু শুনতে পাচ্ছিস?' অব্রে আবার প্রশ্ন করল।

'না, তোর কথা ছাড়া আর কিছুই তো শুনতে পাচ্ছি না। চারদিক কেমন যেন নিঝুম, নিথর আর নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।'

'এটা কি তোর কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে?'

'তোর এই প্রশ্নটার অর্থ ঠিক বুঝলাম না, অব্রে।'

'তুই তো কাল সন্ধ্যার আগেই এখানে এসেছিস। কাল রাতে নিশ্চয়ই কখনও না কখনও জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলি।'

'হ্যাঁ, তো?' আমি বললাম।

'কিছু দেখেছিলি? কিছু শুনেছিলি?'

'দেখেছিলাম দূরের নতুন বাড়িগুলোর আলো। শুনেছিলাম ঐ বাড়িগুলো থেকে ভেসে আসা গান আর বাজনার শব্দ।'

'আর এখন?' অব্রে বিহ্বলভাবে প্রশ্ন করল।

'এখন কিছু দেখছিও না, কিছু শুনছিও না।'

'এর অর্থ বুঝতে পারছিস?'

আমি চমকে উঠলাম। তাকালাম অব্রের দিকে। অব্রে বলল, 'এবার বুঝতে পারছিস? আমি এক বছর ধরে প্রাসাদ-দুর্গে আছি। রোজ রাতে আমি দূরের বাড়িগুলিতে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলতে দেখেছি। ওদিক থেকে ভেসে আসা রেডিওর গান-বাজনার শব্দ শুনতে পেয়েছি। কাল পর্যন্ত অবস্থা এরকমই ছিল। কিন্তু আজ কিছু দেখা যাচ্ছে না, কিছু শোনা যাচ্ছে না! কিন্তু কেন এমন হলো? কেন আমরা রূপ-রস-গন্ধ আর স্পর্শে ভরা মানুষের পৃথিবী থেকে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম? কেন? কারণ নরকের মহা অমঙ্গলময় অশুভ, অলৌকিক শক্তি আমাদের মরজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আমাদের চারদিকে তুলে ফেলেছে এক অদৃশ্য অপ্রাকৃত প্রাচীর। এই প্রাসাদ-দুর্গের বাইরের পৃথিবীতে আলো আছে, গান আছে, কিন্তু প্রেত লোকের বাসিন্দাদের তোলা এই অদৃশ্য প্রাচীরের জন্য আমরা তা দেখতে পাচ্ছি না–শুনতে পাচ্ছি না।'

আমি বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইলাম বাইরের নিরন্ধ্র অন্ধকারের দিকে।

অব্রে ছুটে গেল নিজের ঘরে। মুহূর্তের মধ্যে কোট পরে আর মাথায় টুপি চাপিয়ে বেরিয়ে এল। আমি তখনও জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমি যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। অব্রে এসে আমাকে ঝাঁকুনি দিতেই আমার চমক ভাঙল। উত্তেজিতভাবে সে বলল, 'শিগগির আয়, দেখি ঐ অদৃশ্য প্রাচীরের কোথাও কোন ফাঁক আছে কি না, থাকলে সেই ফাঁক দিয়েই আমরা এই অভিশপ্তপুরী থেকে পালাব।'

ছয়

দু'জনে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম। অব্রের হাতে একটা লণ্ঠন। আমরা হল ঘরের দরজার কাছে আসতেই লণ্ঠনটা একবার দপ্ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল।

'সর্বনাশ!' অব্রে ককিয়ে উঠল, 'এখন এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের মধ্য দিয়েই আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে।'

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে আমরা প্রাসাদ-দুর্গের তোরণের সামনে এলাম। বড় দরজার গায়ে একটা ছোট দরজা আছে। তোরণ দ্বার না খুলেও সেটা খুলে বাইরে যাওয়া যেতে পারে। আমরা ছোট দরজাটা খুলে ফেললাম। এবার আমরা বেরিয়ে যাব এই অভিশপ্ত পুরী থেকে।

কিন্তু বেরুবার চেষ্টা করতেই বাধা পেলাম। আমাদের সামনে একটা দেয়াল। সে দেয়াল অদৃশ্য। সে দেয়াল ইহলোকের নয়– তা পরলোকের– তা নরকের।

সেই অদৃশ্য কঠিন দেয়ালে এমন কোন ফাঁক পেলাম না যা দিয়ে আমরা দু'জনে বাইরে যেতে পারি।

তবু চেষ্টা করে যেতে লাগলাম দু'জন। নাহ্, বৃথা চেষ্টা। বাইরে বেরোবার কোন রাস্তাই নেই। আমরা এই অভিশপ্ত প্রাসাদ-দুর্গে বন্দী। মানুষের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন।

আচম্বিতে মাথার উপরের কালো আকাশটা ফালা ফালা করে চিরে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। শোনা গেল মেঘের গুরু গর্জন। সে গর্জনে বিশ্বচরাচর যেন দারুণ ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল। সেই গর্জন থামতে না থামতেই অন্ধকারের কালো যবনিকা ভেদ করে যেন নরকের অতল গহ্বর থেকে ভেসে আসতে লাগল ক্রুদ্ধ রণহুঙ্কারের পর রণহুঙ্কার।

সেই অপার্থিব ভয়াল হুঙ্কারের শব্দে আমাদের আপাদমস্তক কেঁপে উঠল।

ততক্ষণে চারদিকের অন্ধকার আমাদের চোখে অনেকটা সয়ে এসেছিল। হঠাৎ মনে হলো সেই অন্ধকারের ভিতরে আরো এক মহা অন্ধকার যেন ঘনীভূত হচ্ছে। শুধু তাই নয় সেই মহা অন্ধকার ধেয়ে আসছে প্রাসাদ-দুর্গের তোরণের দিকে।

কাঁপতে কাঁপতে ছোট দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। বলতে গেলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইরের সেই ঘন মহা অন্ধকার এসে আছড়ে পড়ল তোরণের উপরে।

আমরা ছুটে হলঘরে চলে এলাম। অব্রে পকেট হাতড়ে একটা দেশলাই

বের করে লণ্ঠনটাকে জ্বালাল। ওদিকে তখন তোরণের উপরে পড়েছে আঘাতের পর আঘাত। বহুযুগ আগে মৃত 'রাউণ্ড হেড'দের প্রেতাত্মারা পরলোক থেকে বেরিয়ে এসে শিকারের খোঁজে আঘাত হানছে প্রাসাদ-দুর্গের তোরণে।

মড় মড় করে ভেঙে পড়ল তোরণ, পথ খোলা পেয়ে প্রাসাদ-দুর্গের হাতার মধ্যে ঢুকে পড়ল অন্ধকার প্রেতলোকের বাসিন্দারা। তাদের ক্রুদ্ধ গর্জন আর রণহুঙ্কার শোনা যেতে লাগল চারদিকে।

আত্মরক্ষার তাগিদে ভাঙাচোরা সিঁড়ি দিয়েই আমরা উপরের দিকে ছুটলাম। ধুপ্... ধুপ্....ধুপ্... আমাদের পিছনে সিঁড়িতে ছায়াদেহীদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। ওরা আমাদের ধরতে আসছে।

উপরে উঠে আমি নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম, অব্রে হাত ধরে আমাকে থামাল। কঠিন গলায় বলল, 'ভাবছিস ঘরে গিয়ে রক্ষা পাবি? মোটেই না। রক্তপতাকার সংকেতে ওরা সাড়া দিয়েছে। আজ ওরা স্যর পিটার ওয়েলিংডনকে আবার হত্যা করবে। ওদের আজকের শিকার আমি আর তুই, আমাদের আর রক্ষা নেই, বন্ধু!'

ধুপ্... ধুপ্....ধুপ্... ধুপ্... সিঁড়ি দিয়ে পদশব্দগুলি উপরে উঠে আসছে। রণহুঙ্কার এবং ক্রুদ্ধ গর্জন এখন আমাদের একেবারে কাছে এসে গিয়েছে। আর কয়েকটা ধাপ ভাঙতে পারলেই প্রেতলোকের বাসিন্দারা আমাদের সামনে এসে পড়বে। তখন?

হঠাৎ অব্রে উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, 'আমাদের বাঁচবার একটা পথ বোধহয় এখনও খোলা আছে। চল– ছাদে চল।'

'যারা এতদূর আসতে পারল, তারা কি আর ছাদে যেতে পারবে না?' শঙ্কাতুর কণ্ঠে আমি প্রশ্ন করলাম।

ধুপ্... ধুপ্....ধুপ্...ধুপ্... প্রেতলোকের সৈনিকেরা আরও উপরে উঠে এসেছে।

ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে অব্রে বলল, 'শুনতে পাচ্ছিস না ওরা এসে পড়ল বলে। এখন তর্ক করার সময় নয়। শিগগির ছাদে চল।'

অব্রে একরকম টানতে টানতে আমাকে ছাদের দিকে নিয়ে চলল।

ছাদে এসে গেলাম দু'জনে। নিচে তখন শুরু হয়েছে নরকের মহাতাণ্ডবলীলা। জিনিসপত্র ভাঙছে। শোনা যাচ্ছে ছায়া শরীরীদের হুঙ্কার

আর ক্রুদ্ধ গর্জন। আমরা দু'জনে ছুটতে ছুটতে ছাদের উপরকার ছোট গীর্জাটার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। তারপর বেদির উপরে যে ক্রুশখানা ছিল তার দুদিকে দু'জনে আঁকড়ে ধরে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলাম, 'করুণাময় ঈশ্বর আমাদের রক্ষা কর। প্রেমময় যীশু, মহা অন্ধকারের মহা অশুভ শক্তির হাত থেকে আমাদেরকে বাঁচাও!'

ভয়ে, উত্তেজনায় দু'জনেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। জ্ঞান হারানোর সময় শুনলাম প্রাসাদ-দুর্গের একতলা, দোতলা এবং তেতলায় বিদেহী ছায়া শরীরীদের উন্মত্ত গর্জন। তারা শিকার খুঁজে পাচ্ছে না। ছাদে উঠবার সিঁড়ির উপরে তাদের অমানুষিক পদশব্দ শোনা গেলেও ছাদের উপরে তারা ওঠেনি– উঠতে পারেনি।

যখন জ্ঞান ফিরল, ততক্ষণে রাত বিদায় নিয়েছে। পূবের আকাশ লাল রঙে রঙিন। একটু পরেই সূর্য উঠবে। বিশাল প্রাসাদ দুর্গ নিঝুম–নিস্তব্ধ। পবিত্র ক্রুশের সামনে বসে প্রার্থনা করলাম দু'জনে। এই পবিত্র ক্রুশের শুভশক্তিই আমাদেরকে রক্ষা করেছে নরকের আতঙ্কময় অশুভ অলৌকিক শক্তির আক্রমণ থেকে। নরকের সেই মহা অমঙ্গল হানা দিয়েও আমাদের স্পর্শ করতে পারেনি।

নীচে নেমে এলাম। তেতলা, দোতলা আর একতলায় উন্মত্ত ধ্বংসলীলার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে প্রেতপুরীর হানাদারেরা। টেবিল, চেয়ার, আলমারি ভেঙে ফেলেছে। মহা আক্রোশে ছিঁড়ে ফেলেছে পোশাক-পরিচ্ছদ। অব্রের এতদিন ধরে আঁকা ছবিগুলি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে আছে। একখানা ছবিও আর আস্ত নেই। আস্তাবলে এলাম। আমার গাড়িটি সেখানেই ছিল। ওটাকে দেশলাই-এর বাক্সের মত ভেঙে ফেলেছে ওরা। ও গাড়ি আর মেরামত করা সম্ভব নয়। আমার কত শখের গাড়ি!

'আমার জন্যই তোর এই ক্ষতিটা হলো,' নিশ্বাস ফেলে অব্রে বলল, 'আমি তোকে এখানে আসতে না বললেই পারতাম।'

'নারে, তোর আর দোষ কী, আমিই তো ওর সন্ধ্যায় রক্তপতাকা নেড়ে ছায়া শরীরীদের আহ্বান করেছিলাম। তোরও কী কম ক্ষতি হলো? ছবিগুলি নষ্ট হওয়ায় তোর একটা বছরের পরিশ্রমই নষ্ট হলো।'

পুবের আকাশে সূর্য উঠেছে। অন্ধকারের শক্তির আর কোন ক্ষমতা নেই

এখন। আমরা প্রাসাদ-দুর্গের তোরণের গায়ের ছোট দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কোন অদৃশ্য দেয়ালই আজ আমাদের পথের বাধা হলো না।

পরিখার উপরকার টানা সেতুর উপরে এসে দাঁড়ালাম আমরা দু'জন। সামনের ছোট ছোট নতুন বাড়িগুলিতে লোকজন জেগে উঠেছে। কেউ কেউ বেরিয়ে আসছে বাড়ি থেকে। ওরা কেউ জানে না কাল রাতে ওয়েলিংডন প্রাসাদ-দুর্গে কী ভয়ংকর নারকীয় কাণ্ড ঘটে গিয়েছে।

একটু পরেই শুরু হবে দিনের কর্মচাঞ্চল্য। কর্মচঞ্চল দিনে রাতের আতঙ্ককে হয়ত অনেকটা অবাস্তব বলেই মনে হবে। তা হোক। কিন্তু এই অভিশপ্ত প্রাসাদ-দুর্গে আর একটি রাতও থাকব না আমি। অব্রেকেও থাকতে দেব না। ওকে সঙ্গে নিয়েই শহরে ফিরব আমি। ওর কোন আপত্তিই শুনব না।

হোটেলের দিকে পা চালালাম। ব্রেকফাস্ট সেরে ওখান থেকেই বাস ধরব আমরা। বাসস্ট্যাণ্ড হোটেলের কাছেই।

মূল এ এম বারেজ
রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

ঝাঁকটাকে দেখার আগেই ওগুলোর শব্দ শুনতে পেলেন ক্যাপ্টেন অরিন্দম চৌধুরী। ঘড়ঘড়ে একটা গুঞ্জনধ্বনিতে ভরে গেল প্রকাণ্ড ক্যানিয়ন। প্ল্যানেট স্ট্রেনটিওরে ম্লান সবুজ আলোয় চোখ কুঁচকে শব্দ লক্ষ্য করে তাকালেন ক্যাপ্টেন চৌধুরী। প্রথমে মনে হলো, ধোঁয়ার একটা পর্দা, তবে ওটা কাছিয়ে আসতে বোলতার একটা ঝাঁকে রূপ নিল।

সংখ্যায় কয়েক হাজার ওরা, প্রতিটা তিন সেন্টিমিটারের কম নয় লম্বায়, অনুমান করলেন ক্যাপ্টেন। আঁকাবাঁকা ডোরাকাটা দাগের লাল টকটকে শরীর, এগিয়ে আসছে ক্যাপ্টেনের দিকেই। এখানে আর থাকা সমীচীন মনে করলেন না মি. চৌধুরী। এবারের মিশনে যে ক'টি গ্রহে তিনি গিয়েছেন, প্রতিটি জায়গায় প্রকৃতির একটি আইন পরিষ্কার ফুটে উঠেছে তাঁর কাছে, উজ্জ্বল রঙ মানেই বিপদ।

ক্যাপ্টেন তাঁর এক্সপ্লোরেশন পার্টির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে যোগ দিতে এগিয়ে চললেন। তাঁর পেছনে বোলতার ঝাঁকের গতি বৃদ্ধি পেল। মাত্র পঞ্চাশ গজ রাস্তা পার হয়েছেন তিনি, এমন সময় আক্রান্ত হলেন।

অকস্মাৎ তাঁকে ঘিরে থাকা বাতাস লাল হয়ে উঠল দ্রুত ডানা ঝাপটানো পতঙ্গগুলোর আগমনে। ক্যাপ্টেন উন্মাদের মত হাত ছুঁড়ে ওগুলোকে তাড়ানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনই লাভ হলো না। প্রথমে একটা, তারপর আরেকটা তাঁর গায়ে এসে বসল। এই প্রথম আতংক নিয়ে লক্ষ করলেন চৌধুরী, বোলতাগুলোর পেটের মাঝখান থেকে লম্বা, ক্ষুরধার হুল ভাঁজ খুলে বেরিয়ে আসছে।

বাহুতে একটি বোলতা হুল ফুটিয়ে দিতেই বিষের জ্বালায় চিৎকার দিলেন ক্যাপ্টেন। তারপর আরেকটা হুল ফোটাল তাঁর গায়ে, তারপর আরও একটা। আবার আর্তনাদ ছাড়লেন চৌধুরী। তাঁর সামনে, ক্যানিয়নের দেয়াল ঘেঁষে নীল পানির একটা খাঁড়ি চোখে পড়ল। পাথরের গায়ে ঢেউ বাড়ি খেয়ে ফেনা তুলছে।

হাওয়া-কলের মত দু'হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে ওদিকে ছুটলেন ক্যাপ্টেন।

খাঁড়িতে পৌঁছার আগেই অন্তত ডজনবার মাংসের মধ্যে বোলতার বিষাক্ত হুলের সূচের খোঁচা খেলেন তিনি। লাফিয়ে পড়লেন নোংরা পানিতে, ডুব দিলেন। কিন্তু বোলতাগুলো কামড় ছাড়ল না। পাতলা রোমশ শরীর নিয়ে কামড়ে রইল ক্যাপ্টেনের গায়ে।

অরিন্দম চৌধুরী পানির নীচে যতক্ষণ পারেন বন্ধ করে রইলেন দম। এ সময়ে হাতে এবং মুখে কামড়ে থাকা বোলতাগুলো টিপে টিপে মারলেন।

বুকটা যখন বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে অক্সিজেনের অভাবে, বাধ্য হয়ে পানির ওপর ভুস করে ভেসে উঠলেন ক্যাপ্টেন। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগলেন।

তবে তাঁর বিপদ কেটে গেছে। চলে গেছে বোলতার দল।

সাঁতরে তীরে উঠলেন ক্যাপ্টেন অরিন্দম চৌধুরী। টলতে টলতে এগোলেন ক্যানিয়নের শেষ মাথায়। ওখানে তাঁর সঙ্গীরা রয়েছে। ইতোমধ্যে কামড়ের জায়গাগুলো ফুলে গেছে, এক সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ নিয়ে লালচে ফোঁড়ার আকার নিয়েছে। মুখে চারটে জায়গা ফুলে উঠেছে, বিশেষ করে নীচের ঠোঁটের কামড়ের ফোলাটা খুবই মারাত্মক।

'সর্বনাশ, ক্যাপ্টেন!' শিপের বোটানিস্ট উইনস্লো ক্যাপ্টেনকে দেখে আঁতকে উঠল। 'আপনার কী হয়েছে?'

'বোলতা!' গুঙিয়ে উঠলেন অরিন্দম চৌধুরী। রকেট শিপের ডাক্তার অশোক মুখার্জী ছুটে এলেন ক্যাপ্টেনের কাছে। কিন্তু তিনি পরীক্ষা করার আগেই তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চৌধুরী হুকুম করলেন, 'সবাই শাটল পডে যাও।'

এক্সপ্লোরেশন পার্টির ছয় সদস্য শাটল পডে আসার পরে ক্যাপ্টেন পডের নিয়ন্ত্রণভার নিলেন। ছোট ক্রাফটটি স্ট্রনটিও গ্রহ থেকে মাদার শিপ এক্সপ্লোরার-এর উদ্দেশে ধাবিত হলো।

পড রওনা হওয়ার পরে ক্যাপ্টেন ব্যাখ্যা দিলেন, কেন তিনি তাড়াহুড়ো করে এ গ্রহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছেন। 'বোলতা জাতীয় কয়েক হাজার পতঙ্গের হামলার শিকার হই আমি।' অন্যদেরকে বললেন ক্যাপ্টেন। 'এদের বিষ কতটা মারাত্মক জানি না। তবে ধারণা না পেলেও ওদের হিংস্র আচরণ দেখে মনে হয়েছে এরা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কাজেই আপাতত প্ল্যানেট স্ট্রনটিও

থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়।'

মাদার শিপ এক্সপ্লোরার-এ আসার পরে ডাক্তার অশোক মুখার্জী ক্যাপ্টেনকে সোজা মেডিকেল বে'তে নিয়ে গেলেন। ডাক্তারের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন, তাঁর শারীরিক অবস্থা দেখে শিউরে উঠলেন মুখার্জী।

শরীরের এমন কোনও জায়গা বাকি নেই যেখানে হুল ফোটায়নি বোলতা। এমনকী মোটা থার্মা-জ্যাকেট ফুঁড়েও ঢুকে গেছে হুল। মোট পঞ্চাশটা দংশনের চিহ্ন গায়ে, পা থেকে গোটা শরীর; এমনকী পায়ের আঙুলের ফাঁকও বাদ যায়নি। ফোলা আরও বেড়েছে, আগের চেয়ে আকৃতিতে প্রায় দ্বিগুণ, প্রতিটি ফোলার মাঝখানটা কালচে মেরে গেছে।

'হুমম...বোধহয় মাথা গজাচ্ছে,' মন্তব্য করলেন মুখার্জী। 'কেমন বোধ করছেন, ক্যাপ্টেন?'

'ভীষণ জ্বলছে,' দাঁতে দাঁত চাপলেন অরিন্দম।

'আপনার একটা স্ক্যান করা দরকার, স্যর—দেখব ঠিক কী ধরনের বিষ আপনার শরীরে ঢুকেছে।'

মেডিকেল বে'র এক দিকের দেয়ালে লাগানো স্ক্যানালাইজার—এটি বড় আকারের একটি প্লাস্টিন সিলিণ্ডার। সব ধরনের মেডিকেল পরীক্ষা করা হয় এর সাহায্যে। ক্যাপ্টেন সিলিণ্ডারের মধ্যে ঢুকে গেলে ডাক্তার স্ক্যানালাইজারের দরজা বন্ধ করে টিপে দিলেন সুইচ। সঙ্গে সঙ্গে মেশিনের মাল্টিফাংশনগুলো ক্যাপ্টেনের শরীরে প্রবেশ করতে শুরু করল।

ডাটা প্রিন্ট আউটে আসা রেজাল্ট দেখে ডা. মুখার্জীর কপালে ভাঁজ পড়ল। বিষ তো বটেই, পৃথিবীর কেমিক্যাল ফরমালিন টাইপের বিষ। তবে ডাক্তারকে যে বিষয়টি ভাবিয়ে তুলেছে তা হলো, ফোলার ভেতরকার কাঠামো। প্রতিটি ফোসকা আকৃতির ফোলার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ডিম্বাকৃতি অতিসূক্ষ্ম বিন্দুর মত জিনিস।

এক্সিমা সেণ্টরাই সিস্টেমে ক্যান্সার টাইপের সেমি-ভাইরাস ছাড়া এই প্রথম এরকম একটা জিনিস চোখে পড়েছে ডা. মুখার্জীর। তবে বিষয়টি সম্পর্কে আরও ভালভাবে না জেনে ক্যাপ্টেনকে এখুনি ভয় পাইয়ে দিতে চান না তিনি।

'তো, মুখার্জী?' ফুলে থাকা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে জড়ানো গলা ভেসে এল

ক্যাপ্টেনের। 'পরীক্ষায় কী পেলে?'

'বলা মুশকিল, স্যর। আরও বিস্তারিত পরীক্ষার জন্য আপনার ফোসকা কেটে ফ্লুইড বের করতে হবে।'

একটা ফোসকার মধ্যে ডাক্তার সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে দিতেই ব্যথায় মুখ বিকৃত করলেন ক্যাপ্টেন। সিরিঞ্জের ব্যারেল টেনে নিল কুৎসিত চেহারার লাল তরল।

'পরীক্ষা করে দেখতে একটু সময় লাগবে আমার,' ক্যাপ্টেনকে একটি সাদা মেডিকেল গাউন এগিয়ে দিতে দিতে বললেন ডাক্তার। 'নিন, এটা পরে ফেলুন। ইউনিফর্মের বদলে এটা গায়ে থাকলে একটু আরাম পাবেন।'

অরিন্দম চৌধুরী গাউনটি হাতে নিলেন, ওটার দিকে কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

'আপনি ঠিক আছেন তো?' ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেনকে। অরিন্দম একটু চমকে উঠে মাথা নাড়লেন।

'সরি, মুখার্জী, কী-কী বলছিলে তুমি?'

'জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনি ঠিক আছেন কি না।'

ক্যাপ্টেনের চোখে ঘষা কাচের মত চাউনি, কথা বলার সময় জড়ানো গলা শুনে মনে হয় যেন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছেন। 'আ-আমার মাথাটা কেমন খালি-খালি লাগছে। মনে হচ্ছে...কানের মধ্যে বোলতার গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি।' জোর করে নিজেকে যেন সামলে নিলেন তিনি। 'শরীরে আর আগের মত ব্যথা লাগছে না। মনে হচ্ছে চলেই গেছে। আশ্চর্য, ব্যথাটা তো সত্যি প্রায় টেরই পাচ্ছি না!'

'এটা ভাল লক্ষণ,' সতর্কতার সঙ্গে বললেন ডা. অশোক। 'আপনি একটু বিশ্রাম নিন। তাহলে আরও সুস্থ বোধ করবেন।'

রোব গায়ে চড়িয়ে মেডিকেল বাংকের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন। 'ঠিকই বলেছ,' বিশ্রীরকম ফুলে থাকা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা শব্দ দুটো কেমন ঘড়ঘড়ে শোনাল।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে ক্যাপ্টেনের বলা শেষ কথাগুলো ডাক্তারের শিরদাঁড়ায় বরফজল এনে দিল! 'আমি কোনও দিন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডে যাইনি। বলো তো, মুখার্জী—সাদা খরগোশটা কোথায়?'

ডা. অশোক ক্যাপ্টেনের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তাঁর পেছনে

শিপের ইন্টারকমে 'বিপ' করে একটা শব্দ হলো। ভিডিস্ক্রিনে উদয় হলো ফার্স্ট অফিসার কামরান।

'উনি কেমন আছেন, ডাক্তার?'

'ভাল না, মি. কামরান। আমি পরীক্ষা করার জন্য শরীর থেকে ফ্লুইড নিয়েছি, তবে কাজটা করতে একটু সময় লাগবে। ততক্ষণ ক্যাপ্টেনকে ঘুমিয়ে নিতে বলেছি।'

'উনি কি আমাকে কোনও নির্দেশ দিয়েছেন?'

'নাহ্। মনে হয় এখন থেকে আপনাকে নিজের বুদ্ধিতেই চলতে হবে।'

ফ্লাইট ডেকে ইন্টারকমের সুইচ অফ করে দিয়ে এক্সপ্লোরার-এর ক্রুদের দিকে ফিরল কামরান। সব মিলে আটজন কর্মী, ডাক্তার এবং ক্যাপ্টেন ছাড়া। কামরান ছাড়া বাকিদের মধ্যে রয়েছে ইঞ্জিনিয়ার মাকসুদ, চিনা নেভিগেটর ইয়াতসুন। বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেঃ জিওলজিস্ট এবং সিনিয়র বফিন গ্রিগর, তরুণ বোটানিস্ট উইনস্লো, জীববিজ্ঞানী ম্যাকলিন এবং দু'জন মহিলা শারমিন ও ভেরা, প্রথমজন কেমিস্ট, দ্বিতীয়জন ফিজিসিস্ট।

'আমরা এখন কী করব, মি. কামরান?' রিনরিনে কণ্ঠে জানতে চাইল ইয়াতসুন। 'এ সিস্টেমে এখনও একটি গ্রহ অনুসন্ধানের জন্য বাকি রয়ে গেছে। আমি ওটার জন্য কোর্সের প্রোগ্রাম তৈরি করব কি?'

মাথা নাড়ল কামরান। 'না, এখনই নয়। আমরা এখান থেকে রওনা হওয়ার আগে ক্যাপ্টেন হয়তো আরেকবার স্ট্রনটিওতে ঘুরে আসতে পারেন। উনি সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত আমরা এ কক্ষপথেই থাকছি।'

সে তার সায়েণ্টিফিক স্টাফের দিকে ফিরল। 'তোমাদের সংগৃহীত নমুনাগুলো নিয়ে এই ফাঁকে গবেষণা শুরু করে দাও। এতটা সময় ভবিষ্যতে না-ও পেতে পার।'

ঘণ্টা দুই পরে কামরানের ইন্টারকম 'বিপবিপ' শব্দে বেজে উঠল। ভিডিস্ক্রিনে ফুটল ডাক্তারের ছাইবর্ণ মুখ।

'বিপদ, মি. কামরান! জলদি এখানে একবার আসুন!'

স্প্রিংয়ের মত লাফ মেরে খাড়া হলো ফার্স্ট অফিসার। 'আমার সঙ্গে এসো, ইয়াতসুন।'

বেঁটে চিনা-মানুষটিকে সঙ্গে নিয়ে সে ব্রিজ ধরে ছুটল। শিপের ঠিক মধ্যভাগে মেডিকেল বে'র অবস্থান, টুইনডেক এলিভেটর থেকে বেরিয়ে

গ্যাংওয়ে পার হতে হয়। দুই মিনিট পরেই মেডিকেল বে'র এণ্ট্রি ট্র্যাকের সামনে চলে এল কামরান, টোকা দিতেই খুলে গেল দরজা।

সামনের দৃশ্যটা দেখে দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে পড়ল ফার্স্ট অফিসার, বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে মুখ।

ডা. মুখার্জী অটোমেটেড অপারেশন টেবিলের এক কোনায়–গুটিসুটি মেরে বসে আছেন। টেবিলের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ক্যাপ্টেন অরিন্দম চৌধুরী। সম্পূর্ণ নগ্ন তিনি, তাঁর সারা গা ফুঁড়ে বেরিয়েছে অসংখ্য কালো কালো ফোসকা, গোটা শরীরজুড়ে যেন ফোঁড়ার নকশা। তাঁর চোখ বিস্ফারিত, বেরিয়ে এসেছে কোটর ছেড়ে, মুখ থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত এবং লালা তাঁর চিবুক ভিজিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত দেহে। মেডিকেল বাংক থেকে ছুটিয়ে আনা লম্বা, ধাতব একটা টুকরো শক্ত করে ধরে রেখেছেন হাতে।

'এসো, সাদা খরগোশ,' চড়াসুরে উন্মাদের গলায় বলছেন তিনি, 'অ্যালিসের কাছে এসো...'

তাঁর কথা প্রায় বোঝাই যায় না, কারণ মুখের ফোসকাটা আয়তনে এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে ওজনের ভারে ঠোঁট বেঁকে থুতনির দিকে নেমে গেছে। তিনি কথা বলতে বলতে হাতের ধাতব খণ্ডটি দিয়ে অপারেশন টেবিল কণ্ট্রোলে বারবার বাড়ি মারছেন।

মেডিকেল বে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। স্ক্যানালাইজার এমন ভাবে ভাঙা হয়েছে ও আর মেরামত করা সম্ভব নয়, ডাটা কনসোল ভেঙে চুরমার। মেঝেয় গড়াচ্ছে ভাঙা বোতল আর শিশি, বাতাসে ওষুধের ঝাঁঝাল, কটু গন্ধ।

ক্যাপ্টেনের পা কেটে মাংস বেরিয়ে পড়েছে। রক্ত ঝরছে। ভাঙা কাচের টুকরো এখনও লেগে আছে পায়ের পাতায়। তবে এসবের দিকে তাঁর কোন খেয়ালই নেই।

তিনি কামরান ও তাঁর সঙ্গীর দিকে ফিরলেন। 'বেশ, বেশ, বেশ,' সুর করে বললেন ক্যাপ্টেন। 'এসো, বন্ধুগণ, যুদ্ধে যোগ দাও।'

অপারেশন টেবিলের পেছনে লুকিয়ে থাকা ডা. মুখার্জী চেঁচিয়ে উঠলেন: 'সাবধান! উনি কিন্তু পুরো পাগল হয়ে গেছেন!'

নেকড়ের মত হুংকার ছেড়ে, হাতের ধাতব বারটা বিপজ্জনক ভঙ্গিতে এক পাক ঘুরিয়ে কামরানের দিকে ছুটে গেলেন ক্যাপ্টেন। সহজাত প্রবৃত্তিতে

মাথা নিচু করে ফেলল ফার্স্ট অফিসার, তারপরই প্রবল মুষ্ট্যাঘাত করে বসল ক্যাপ্টেনের পেটে।

ঘুসি খেয়ে ছিটকে গেলেন ক্যাপ্টেন, নিঃশ্বাসের জন্য হাঁসফাঁস করছেন, কামরান ছুটে গিয়ে গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে ভয়ানক এক কারাতে চপ মারল তাঁর ঘাড়ে। বিনাবাক্যব্যয়ে জ্ঞান হারালেন অরিন্দম চৌধুরী।

'ওঁকে টেবিলে তুলে জলদি বেঁধে ফেলো,' চীনার দিকে তাকিয়ে ঘাউ করে উঠল কামরান। তিনজন মিলে ভয়ংকরদর্শন শরীরটা টেবিলে তুলে ফেলল। তারপর স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে ফেলল ক্যাপ্টেনকে। ভয় এবং বিবমিষা নিয়ে তাকিয়ে থাকল তাঁর দিকে।

ফোসকাগুলো এখন চার সেন্টিমিটার লম্বা, চওড়াতেও তাই। ফোসকা ফেটে লাল পুঁজ বেরোচ্ছে। বিকট গন্ধ। নাক কুঁচকে এল কামরানের।

'ইস্, ওনার অবস্থা দেখছি কেরোসিন!' বাংলায় মন্তব্য করল সে।

'রক্তনালী বেয়ে বিষ সম্ভবত ওঁর মস্তিষ্কে পৌঁছে গেছে,' ব্যাখ্যা দিলেন মুখার্জী। 'এ কারণেই অমন উন্মাদের মত আচরণ।'

'পরীক্ষা করে কিছু পেলেন?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ডা. অশোক। 'এখনও পাইনি। আরেকটু যদি সময় পেতাম...'

থমথমে মুখে অসুস্থ ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল কামরান। 'উনিও খুব বেশি সময় পাবেন বলে মনে হচ্ছে না। আপনি গবেষণা চালিয়ে যান। ইয়াতসুন–ও ঘরটা পরিষ্কার করো। আমি গ্রিগরের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি। আমাদের মিশন বন্ধ করে দেয়াই ভাল হবে।'

ফ্লাইট ডেকে চলে এল কামরান। চারজন বৈজ্ঞানিক এ মুহূর্তে শিপের স্টাডিরুমের কম্পিউটারে কাজে ব্যস্ত। কামরান ইণ্টারকমে কথা বলল।

'গ্রিগর! তোমার দলবল নিয়ে এক্ষুনি আমার ঘরে চলে এসো।'

'ক্যাপ্টেনের কিছু হয়নি তো?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল রুশ বিজ্ঞানী।

'হ্যাঁ,' কামরানের কণ্ঠ কেমন ভাঙা শোনাল। 'মনে হয় না উনি আর বেশিক্ষণ আমাদের সঙ্গে আছেন।'

গ্রিগর মাথা ঝাঁকিয়ে ইণ্টারকমের সুইচ অফ করে দিল। ফিরল শারমিন নিপার দিকে। 'ভেরা পেত্রোভ তার কোয়ার্টার্সে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ওকে ঘুম থেকে তোলো।'

মেডিকেল রুমে ইয়াতসুন আবর্জনা পরিষ্কার করছে। ভাঙাচোরা যন্ত্রপাতি, ভাঙা কাচ ইত্যাদি প্লাস্টিন বস্তায় ভরে করিডরের বাইরে রাখছে। ময়লা তুলছে বটে তবে একটু পরপরই চোখ চলে যাচ্ছে অপারেশন টেবিলে শোয়ানো, স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা বীভৎস চেহারার মানুষটার দিকে। ফোসকাগুলো আকারে ক্রমে বড় হয়েই চলেছে। ক্যাপ্টেনের ঠোঁটের ওপরের ফোসকাটা ফুলে এখন বেলুনের চেহারা পেয়েছে। বিকট চেহারার ফোসকাটা নড়ছে! মনে হচ্ছে, ফোসকার ভেতরে কিছু একটা কিলবিল করে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। 'আরে, দূর, ফোসকা আবার জ্যান্ত হয় নাকি!' ভুল দেখেছে ভেবে আবার কাজে মনোযোগ ফেরাল ইয়াতসুন।

মেডিকেল বে'র দূর প্রান্তে, কাচঘেরা ছোট, আইসোলেশন চেম্বারে বসে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ফোসকার পুঁজে ভরা রক্ত থেকে আলাদা করা ক্ষুদ্র বিন্দুটাকে পরীক্ষা করে দেখছিলেন ডা. মুখার্জী। বিন্দু বা ফুটকিটার গা চামড়ার মত তেলতেলে, শক্ত, গোলাকার গঠন, দেখতে অনেকটা ডিমের মত।

মাকসুদ, উইনস্লো এবং ম্যাকলিন ফ্লাইট ডেকে ঢুকে দেখল, অন্ধকার চেহারা নিয়ে বসে আছে তাদের বস্ কামরান।

'অন্য দু'জন কোথায়?' খেঁকিয়ে উঠল সে।

'আসছে,' জানাল মাকসুদ। 'ক্যাপ্টেনের সর্বশেষ অবস্থা কী?'

'জানি না। তবে মনে হয় না দু'এক ঘণ্টার বেশি তাঁর আয়ু আছে।'

থমথমে নীরবতা নেমে এল ঘরে। নীরবতা ভঙ্গ হলো ফার্স্ট অফিসারের কর্কশ কণ্ঠস্বরে: 'আমার মতে এ মিশন এখনই বাদ দিয়ে পৃথিবীর উদ্দেশে আমাদের যাত্রা করা উচিত। তবু তোমার টিম কী বলছে শুনতে আমি প্রস্তুত আছি, মাকসুদ।'

এদিকে মেডিকেল বে'তে ইয়াতসুন আবার ক্যাপ্টেনের দিকে ঔৎসুক্য নিয়ে তাকিয়েছে। না, সে কল্পনা করছে না। কিংবা ভুল দেখছে না। ফোসকার উপরিভাগে সত্যি কী যেন একটা নড়াচড়া করছে। সে ভালভাবে দেখার জন্য ঝুঁকল।

ক্যাপ্টেনের ঠোঁটের ওপরের বিপুল আকারের ফোসকাটা সবচেয়ে সক্রিয়– ছন্দায়িত ভঙ্গিতে ওখানে যেন ঢেউ খেলছে; যেন জ্যান্ত কিছু একটা আছে জায়গাটায়। ইয়াতসুন দেখছে, ফোসকার উপরদিককার চামড়া ফেটে

যেতে শুরু করল।

ভয়ানক চমকে উঠে ঝট করে সিধে হলো ইয়াতসুন, পাঁই করে ঘুরল। ‘ডা. মুখার্জী!’ গলা ফাটিয়ে ডাকল সে। ঠিক তখন অগ্নিগিরির বিস্ফোরণের মত বিস্ফোরিত হলো ফোসকা, ছিটকে বেরুল দুর্গন্ধযুক্ত তরল...সঙ্গে আরও কী যেন।

‘ওরে বাবারে!’ ভীষণ আঁতকে উঠল ইয়াতসুন। ‘বো-বোলতা!’

ক্যাপ্টেনের শরীরে দ্বিতীয় ফোসকাটি ফেটে গেল এবং কুৎসিত জিনিসগুলো সেই সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হলো শূন্যে। যেখানে ছিটকে পড়েছে বোলতাগুলো সেখানেই পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে রইল, পিঠের ওপর প্রসারিত হলো পাখা, দ্রুত ঝাপটাতে লাগল শরীরে লেগে থাকা ভেজা জিনিসটা শুকিয়ে নিতে। তৃতীয় ফোসকাটির বিস্ফোরণ ঘটল, তারপর চতুর্থটি...

ক্যাপ্টেনের চারপাশটা হঠাৎ ভরে গেল ছোট ছোট ডানা ঝাপটানোর শব্দে আর শতশত লাল টকটকে, ডোরাকাটা শরীরে। ইয়াতসুন দ্রুত পেছনে হটতে লাগল, হাত জোড়া ক্রমাগত নাড়ছে তাকে ঘিরে ফেলতে-থাকা বোলতার ঝাঁক সরিয়ে দিতে।

আইসোলেশন রুমে দাঁড়িয়ে প্রবল অবিশ্বাস নিয়ে ডা. মুখার্জী দেখছিলেন কীভাবে ক্যাপ্টেনের গায়ের ফোসকাগুলো ফেটে যাচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বোলতা দখল করে ফেলছে ঘর, ইয়াতসুনকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলছে। প্রথম হুলটার দংশন খেতেই জন্মদাতাকে সজোরে এবং যন্ত্রণাকাতর শব্দে স্মরণ করল বেঁটে চীনা মানুষটি।

নিজের অজান্তেই আইসোলেশন রুমের ডোর কন্ট্রোলের দিকে হাত চলে গেল ডা. মুখার্জীর। পরক্ষণে হাতটা সরিয়ে নিলেন। কোনও লাভ হবে না। তিনি চীনামানবটির জন্য এ মুহূর্তে কিছুই করতে পারবেন না।

অন্ধের মত নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে নেভিগেটর, তার শরীরের ইঞ্চি পরিমাণ জায়গাও খালি নেই। বোলতার লাল একটা চাদর মুড়ে ফেলেছে তাকে। ভয়ংকর পতঙ্গগুলো নির্দয়ভাবে কামড়ে চলেছে তাকে। ডা. মুখার্জীর কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে যে প্লেক্সি-গ্লাস পার্টিশনটি তার গায়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে।

বোলতার মেঝের আড়াল থেকে ইয়াতসুনের একটি মাত্র চোখ দেখা যাচ্ছে। ভয়ার্ত, যন্ত্রণাকাতর চাউনি। চিৎকার দিতে মুখ হাঁ করল সে। তার

মুখের ভেতরে একটা বোলতা দেখতে পেলেন ডা. মুখার্জী। সুইয়ের মত সরু আর ধারাল হুল ঢুকে আছে জিভের ভেতরে। ওটা কেবল হুল নয়, মুখার্জী জানেন এখন। ওটা ওভিপজিটর। ওই প্রত্যঙ্গটি দিয়ে ডিম পাড়ে বোলতা।

ক্যাপ্টেনের মত ইয়াতসুনও 'শীঘ্রি পরিণত হবে জ্যান্ত নার্সারীতে, স্ট্রনটিও গ্রহের বোলতাদের ডিম পাড়ার 'ব্রিডিং গ্রাউণ্ড' হয়ে উঠবে সে!

কাচের পার্টিশনের গা থেকে আস্তে আস্তে খসে গেল ইয়াতসুন, বোলতার কামড়ে লাল হয়ে ফুলে ওঠা হাতের থাবা দিয়ে পার্টিশন খামচে ধরার বৃথা চেষ্টা করল। মেঝেতে পড়ে গেল সে। তারপর আর নড়াচড়া করল না।

গোটা মেডিকেল বে জুড়ে এখন বোলতার ঝাঁক। ডা. মুখার্জী উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগ নিয়ে দেখলেন ওগুলো গুঞ্জন তুলে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে উড়তে উড়তে চলেছে গ্যাংওয়ে অভিমুখে। অন্য ক্রুদেরকে এখুনি সাবধান করে দেয়া দরকার। কিন্তু কীভাবে? মেডিকেল বে'র ওপাশে ইণ্টারকম। তিনি ইণ্টারকমে পৌঁছার আগেই শত শত বোলতা তাঁকে ছেঁকে ধরবে, গায়ে ফুটিয়ে দেবে মরণ হুল।

বোঁ ওওওও! বোঁ ওওওও! শারমিন এবং ভেরা ক্রু-কোয়ার্টার্স থেকে বেরিয়ে গ্যাংওয়ে ধরে লেভেল তিন-এর দিকে যাচ্ছিল। শব্দটা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিস্মিত।

'বৈদ্যুতিক কোনও গোলযোগ কি?' ইতস্তত গলায় জিজ্ঞেস করল ভেরা।

ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে শারমিনের চেহারা। 'বৈদ্যুতিক গোলযোগ না ছাই! জলদি ভাগো!'

মেডিকেল বে'র দিকের খোলা হ্যাচ থেকে বোলতার বিরাট একটা ঝাঁক পিলপিল করে বেরিয়ে এসেছে, আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ছুটে আসছে দুই নারীর দিকে।

'এলিভেটর!' চেঁচাল ভেরা। 'ওদিকে চলো!'

প্রথম বোলতাটা ঘাড়ে কামড় দিতেই চিৎকার দিয়ে উঠল সে। এলিভেটরের দরজা খুলতে খুলতে অসংখ্য কামড় খেল ওরা দু'জন। টলতে টলতে ভেতরে ঢুকল শারমিন, ভেরাকে সঙ্গে নিয়ে। উন্মত্তের মত চেপে ধরল কণ্ট্রোল প্যানেল। এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল মূল ঝাঁকটা ভেতরে ঢোকার সুযোগ পাবার আগেই।

গোঙাতে গোঙাতে মেঝেতে পড়ে গেল ভেরা পেত্রভ। গালে বসা একটা

বোলতা দু'আঙুলের চাপে ভর্তা বানিয়ে ফেলল শারমিন। টান মেরে জ্যাকেট খুলে তার চারপাশে উড়তে থাকা লাল রঙের মূর্তিমান শয়তানগুলোকে তাড়াতে লাগল সে, ভয় আর আতংকে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে।

'ওভাবে স্রেফ শুয়ে থেকো না, ভেরা!' চেঁচাচ্ছে শারমিন। 'কিছু একটা করো!'

ফ্লাইট ডেকের বাসিন্দারা অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান। ডেক সিল করে দেয়ার আগেই হাজারখানেক বোলতা ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। কামরান তার লেসার-গান দিয়ে সবক'টাকে মেরে ফেলেছে। তবে অক্ষত থাকতে পারেনি কেউ-ই। কম-বেশি কামড় খেয়েছে সবাই। সবচেয়ে কম হামলার শিকার হয়েছে উইনস্লো। তার চামড়ায় ডজনখানেক কামড়ের দাগ লাল হয়ে ফুটে আছে। গ্রিগরের চোখে কামড় বসিয়েছিল বোলতার দল। ইতোমধ্যে চোখ ফুলে ঢোল। লেসার-গান হাতে থাকলেও কামরানও কামড়ের কবল থেকে বাঁচতে পারেনি। অন্তত গোটা বিশেক দংশনের দাগ তার শরীর জুড়ে।

'এই হারামজাদাগুলো এল কোত্থেকে?' কাতরে উঠল ম্যাকলিন। 'এর ব্যাখ্যা একটাই হতে পারে–ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে!' কামরান মেডিকেল বে'র ইন্টারকমে থাবড়া বসাল। পর্দায় ফুটল হাজার হাজার বোলতা, তবু ঝাঁকগুলোর মাঝ দিয়ে অপারেশন টেবিলে পড়ে থাকা ক্যাপ্টেনের ক্ষত-বিক্ষত শরীরটা নজরে এল ওর। দেখেই বোঝা যায় মারা গেছেন অরিন্দম চৌধুরী। তাঁর গা ভর্তি বড় বড়, রক্তাক্ত গর্ত।

'ওগুলো স্রেফ হুল নয়,' ভাবলেশহীন গলায় বলল ফার্স্ট অফিসার। 'ওগুলো বোলতাদের ডিমের থলি।'

মনিটর ক্যামেরা ঘুরিয়ে দেখছে কামরান, স্থির হলো ইয়াতসুনের চিত হয়ে পড়ে-থাকা দেহের ওপর। তার গোটা শরীরে ক্ষতচিহ্ন, ফেটে গেছে চামড়া। চীনার পেছনে, আইসোলেশন রুমের জানালায় দেখা গেল স্তম্ভিত এবং বিমূঢ় চেহারার ডা. মুখার্জীকে। তিনি অক্ষতই আছেন।

টুইনডেক এলিভেটরে দুই নারীকে দেখা গেল। ভেরা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। শারমিন এখনও খাড়া হয়ে রয়েছে। যদিও সারা মুখে মারাত্মক দংশনের চিহ্ন। ইন্টারকমের মাধ্যমে শারমিনকে সাবধান করে দিল কামরান, সে যেন কোনও ভাবেই এলিভেটর থেকে বের না হয়।

এদিকে যে এতসব ঘটনা ঘটে গেছে তার কিছুই জানে না ইঞ্জিনিয়ার মাকসুদ। সে ইঞ্জিন রুমে বসে মাসুদ রানা পড়ছিল। পর্দায় ফার্স্ট অফিসারের চেহারা ভেসে উঠতেই সহাস্যে জানতে চাইল, 'কী খবর, মি. কামরান?'

খবর শুনে চোয়াল ঝুলে পড়ল মাকসুদের। 'আপনি বলছেন ওই জিনিসগুলো এখন জাহাজ জুড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে?'

মাথা ঝাঁকাল কামরান। 'এ মুহূর্তে আমরা সবাই সিল করা এয়ারটাইট কমপার্টমেন্টে রয়েছি। তুমি শিপ থেকে সমস্ত বাতাস বের করে দাও। অক্সিজেনের অভাবে মারা যাবে বোলতাগুলো। এখুনি করো!'

'কিন্তু ইয়াতসুনের কী হবে?' ইন্টারকম বন্ধ হওয়ার পরে জিজ্ঞেস করল উইনস্লো। 'ও বেঁচে আছে, নাকি মারা গেছে জানি না তো!'

'আমাদের কোনও বিকল্প নেই,' পাথুরে শোনাল কামরানের কণ্ঠ। 'কাউকে না কাউকে স্যাক্রিফাইস করতেই হয়।'

ইন্টারকমের পর্দায় ওরা দেখল হিসহিস শব্দে শিপ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বাতাস। বাতাসের টানে বেশ কিছু বোলতা মহাশূন্যে ভেসে গেল। বাকিগুলো পড়ে রইল ডেক-এ এবং মারা গেল সেখানেই।

নিরাপত্তার খাতিরে আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করল কামরান, তারপর মাকসুদকে নির্দেশ দিল রিজার্ভ ট্যাংক থেকে অক্সিজেন সরবরাহ করতে। একটা বোলতাও নড়ছে না। সবক'টা মরে ভূত।

ঘণ্টাখানেক পরে শিপের ভুক্তভোগী সবাই জমায়েত হলো ফ্লাইট ডেক-এ।

'আমি অটো-পাইলট চালিয়ে দিয়েছি,' কামরান জানাল ওদেরকে। 'শিপ এখন পৃথিবীর পথে হাইপার-ড্রাইভে রওনা হয়ে গেছে। কাজেই এখন আমাদের প্রধান সমস্যাটির প্রতি নজর দেয়া যাক—কীভাবে আমরা বেঁচে থাকব।'

সবার চাউনি নিবদ্ধ হলো ডা. অশোক মুখার্জীর ওপর।

'আমি সরাসরিই বলি,' বললেন ডা. মুখার্জী। 'এই হুলগুলোর চিকিৎসার দুটো রাস্তা আছে। এক নম্বর—যে জায়গায় দংশন হয়েছে সে জায়গায় অপারেশন করতে হবে। দুই—বিষ ব্যবহার করতে হবে।'

'যা করার জলদি করুন!' আর্তনাদ করে উঠল গ্রিগর। ফোসকাগুলো ভীষণ ফুলে উঠে তাকে পুরোপুরি অন্ধ করে দিয়েছে। সে একদমই তাকাতে

পারছে না।

ডেক-এ নিশ্চল শুয়ে থাকা ভেরার দিকে ইঙ্গিত করলেন ডাক্তার। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সামান্যতম জায়গা বাকি নেই, যেখানে বেঢপ চেহারার ফোসকাগুলো গজায়নি। ভয়ংকর! 'ওর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। ওকে দিয়েই শুরু করি।'

মেডিকেল বে'তে নিয়ে যাওয়া হলো ভেরা পেত্রভকে। ভেরার হাতে বেলুনের মত ফুলে থাকা একটা ফোসকায় লেসার-স্ক্যালপেল চালালেন ডা. মুখার্জী। স্ক্যালপেল রশ্মি ডিমের থলে কাটতেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছিটকে পড়ল শূন্যে। ঝর্নার মত শোণিত ধারা বেরুতেই থাকল।

'যাশ্‌শালা!' ডা. মুখার্জী লেসার দিয়ে দ্রুত জায়গাটা পুড়িয়ে দিলেন যাতে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। তিনি অন্যদের দিকে ফিরে বললেন, 'কোনও লাভ হবে না। ডিমের থলেগুলো শিরার মধ্যে ঢুকে রয়েছে। একটা দুটো শিরা হয়তো আমি কাটতে পারব। কিন্তু বেশি শিরা কাটলে রোগী এমনিতেই মারা যাবে।'

'আর বিষ প্রয়োগের ব্যাপারটা?' কাতরে উঠল উইনস্লো।

'একই ঘটনা ঘটবে। বিষ প্রয়োগে রোগীর রক্তে বিষ মিশে যাবে—বোলতা মারা যাওয়ার আগে রোগীই পটল তুলবে।'

কামড় খাওয়া, ফোলা মুখগুলোয় বেজায় হতাশার ছাপ ফুটল। 'তা হলে কি...কোন আশাই নেই?' হাহাকার ধ্বনিত হলো গ্রিগরের কণ্ঠে।

'একটা হালকা আশা আছে,' সাবধানে শব্দ বাছাই করলেন ডা. মুখার্জী। 'ডিসপেনসারিতে হাজারখানেক নানান রকম ওষুধ আছে—হয়তো ওর মধ্যে একটা দু'টো ওষুধ কাজে লেগেও যেতে পারে। আবার না-ও লাগতে পারে। তবু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী!'

ডাক্তার তাঁর ওষুধ রাখার কনসোলে ঢুকে কয়েকটা শিশি-বোতল নিয়ে এলেন। 'আপনাদের সবাইকে আলাদা আলাদা ওষুধ দিলাম,' তিনি ওদেরকে বড়িগুলো বিলোতে বিলোতে বললেন। 'কারও যেমনও শারীরিক উন্নতি হলে বলবেন।'

ওরা মেডিকেল বে থেকে শেষ ভরসা ওষুধের বড়িগুলো নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরে ডা. মুখার্জী ইঞ্জিনিয়ার মাকসুদকে একদিকে টেনে নিয়ে গেলেন। 'তোমার কাছে সত্য লুকাব না, মাকসুদ। আমার ধারণা, এসব

ওষুধে আসলে কোনও কাজ হবে না।'

'তার মানে আপনি বেহুদাই ওদেরকে সান্ত্বনা দিলেন?'

'ঠিক তাই। তোমাকে আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, নিজেদের প্রাণ রক্ষার তাগিদে একটা সময় হয়তো ওদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে লড়াই করতে হবে। কাজেই প্রস্তুত থেকো।'

মাকসুদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তবে সে কিছু না বলে শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল।

ওষুধে সত্যি কোনও কাজ হলো না। বোলতার কামড় খাওয়া লোকগুলোর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগল। প্রথমেই তাদের মধ্যে দেখা গেল পাগলামির লক্ষণ। গ্রিগরের ফোলা চোখের পাতার নীচ থেকে অঝোরে জল পড়ছে। সে শিপের চারপাশে অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে, হাঁটতে হাঁটতে গান গাইতে লাগল। আমাদের দেশের 'মাঝি বাইয়া যাও রে' ধরনের ভাটিয়ালি সুরের গান। যখনই সে কোনও কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেল, সে 'মাঝি ভাই'-এর কাছে কর জোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল। ম্যাকলিন শিপের সফটড্রিংক ডিসপেনসারের তার-টার ছিঁড়ে, গুটিসুটি মেরে ভেতরে ঢুকে হাউমাউ কান্না জুড়ে দিল।

উইনস্লো যখন অচেতন ভেরা পেত্রভের মাথায় জুতো দিয়ে লাথি মারতে শুরু করল, ডা. মুখার্জী ওই সময় ইণ্টারকমে মাকসুদকে বললেন, 'এখন সময় হয়েছে।'

'আমরা এখন কী করব, ডাক্তার?'

'ওদের শরীর ফুঁড়ে যখন বোলতা বেরুতে শুরু করবে তখন ওগুলো আবার তাড়িয়ে দেয়ার জন্য শিপের অক্সিজেন খালি করার মত যথেষ্ট বাতাস আমাদের নেই। ভিক্টিমদের আটকে রাখতে হবে। আমরা ক্রু-কোয়ার্টার্সের আইসোলেশন চেম্বারে আশ্রয় নেব। তুমি সাপ্লাই রুম থেকে কিছু রশি নিয়ে এসো। আমি ক্রু-কোয়ার্টার্সে যাচ্ছি।'

ক্রু-কোয়ার্টার্সে মাকসুদের সঙ্গে মিলিত হলেন তিনি। দু'জনে মিলে বাংকে প্রচুর রশি নিয়ে এলেন। কাজ শেষ করে ঘড়ি দেখলেন মুখার্জী।

'ক্যাপ্টেনের শরীরে বোলতার ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার সময়ের হিসেবে ওদের সবাইকে বেঁধে ফেলার জন্য মাত্র এক ঘণ্টা হাতে পাব আমরা।'

ওরা সবার আগে শারমিন নিপাকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলল। সে কোনও প্রতিবাদই করল না। ভারী শরীরের, অচেতন ভেরাকে কোয়ার্টার্সে বয়ে নিয়ে আসতে ওদের ঘাম ছুটে গেল।

ওরা ক্রু-কোয়ার্টার্স থেকে বেরিয়ে এসে দেখে গ্রিগর গ্যাংওয়েতে হাঁটু গেড়ে বসে কাল্পনিক বৈঠা বাইছে আর 'মাঝি বাইয়া যাও রে' গাইছে। ওরা গ্রিগরকে টেনে তুলল, তারপর ধাক্কাতে ধাক্কাতে কোয়ার্টার্সে নিয়ে গিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলল।

ড্রিংক ডিসপেন্সার থেকে অনিচ্ছুক ম্যাকলিনকে টেনে বের করতে ওদের পুরো পাঁচ মিনিট সময় ব্যয় হলো। গ্যাংওয়ে ধরে ওকে নিয়ে যাচ্ছে, পথে দেখা হয়ে গেল উইনস্লোর সঙ্গে।

'তোমরা কোথায় যাচ্ছ গো, সুন্দরী?' জিজ্ঞেস করল বোটানিস্ট।

'লণ্ডন যাচ্ছি,' দ্রুত জবাব দিলেন ডা. মুখার্জী। 'রানির সঙ্গে দেখা করতে। যাবে নাকি?'

উৎসাহের সাথে ওদের পিছু নিল উইনস্লো। ম্যাকলিনকে যখন রশি দিয়ে বাঁধা হচ্ছে এবং প্রতিবাদে সে তারস্বরে চিৎকার করছে, উইনস্লো মন্তব্য করল, 'আহ্, ওকে একটু থামতে বলো না। কানে বড্ড লাগছে তো।'

মুখার্জী ম্যাকলিনকে ধমক দিলেন, 'এই, তুমি থামো তো!' কিন্তু ধমক খেয়ে ম্যাকলিন কান্না জুড়ে দিল।

ওরা উইনস্লোকে নিয়ে তার কিউবিকলে ঢুকল। বাংকের সঙ্গে রশি দিয়ে ঝটপট বেঁধে ফেলল। ঘর থেকে বেরুবার সময় শুনল উইনস্লো নাকি সুরে বলছে, 'আমি রানির কাছে যাব! আমি রানির কাছে যাব!'

ফার্স্ট অফিসার কামরানকে পাওয়া গেল রিক্রিয়েশন চেম্বারে। সে হাতে একটা কাঠের গদা নিয়ে অ্যান্টি-গ্রাভিটি বার-এর মাথায় উঠে বসে কাকে উদ্দেশ্য করে যেন অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করছে। ওকে বহু ডাকাডাকি, অনুরোধ করেও নীচে নামানো গেল না।

'আমাদের হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই,' জরুরি গলায় বললেন মুখার্জী। 'অস্ত্র রাখার লকার থেকে একটা ব্লাস্টার নিয়ে এসো!'

মাকসুদ দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলল, 'উনি আমাদের ফার্স্ট অফিসার। ওঁকে কি ব্লাস্টার দিয়ে...'

'আরে, উনি এখন পুরো পাগল হয়ে গেছেন,' ওর কথা শেষ করতে

দিলেন না মুখার্জী। 'আর আধঘণ্টা পরে তোমার ফার্স্ট অফিসারের গা ফুঁড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বোলতা বেরিয়ে আসবে। ওগুলো শিপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়লে আমাদের অবস্থাও ওর মতই হবে।' তার কণ্ঠ নির্মম এবং শীতল শোনাল। 'যা বলছি করো। এটা জীবন-মরণের প্রশ্ন।'

ঢোক গিলল মাকসুদ। তারপর এক ছুটে চলে গেল অস্ত্র রাখার লকারে। একটু পরেই ফিরে এল ব্লাস্টার নিয়ে। ডা. মুখার্জী কামরানকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন।

কামরানের ঠিক বুক বরাবর আঘাতটা লাগল। সে হাত-পা ছড়িয়ে ধপাস করে ডেক-এর ওপর, ওদের পাশে পড়ে গেল।

'চলো, ওকে ক্রু-কোয়ার্টার্সে নিয়ে যাই,' বললেন ডা. অশোক।

ওরা দু'জন অসাড় দেহটি তুলে নিতে ঝুঁকেছেন, নির্জলা আতংক ফুটল মাকসুদের চোখে-মুখে।

'দ-দেখুন, ডাক্তার!'

কামরানের গায়ের ফোসকাগুলো ফেটে যেতে শুরু করেছে, বেরিয়ে আসছে ভেতরকার ভয়ংকর জিনিসগুলো। পরমুহূর্তে লাল মৃত্যুর ভীষণ গুঞ্জনে মুখরিত হলো বাতাস।

'হা, ভগবান!' আঁতকে উঠলেন ডা. মুখার্জী। 'আমরা গুলি করে সর্বনাশ করেছি। কামরানের মৃত্যুর কারণে বোলতাদের ডিম আগেই ফুটে গেছে!'

লাল ঝাঁকটার কবল থেকে ছুটে পালাবার চেষ্টা করল ওরা। কিন্তু দরজার কাছে পৌছনোর আগেই লাল চাদরটা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর, চোখের পলকে ঢেকে ফেলল দু'জনের শরীর...

একমাস পরের ঘটনা। এক্সপ্লোরার মঙ্গল গ্রহ পার হয়ে এসেছে, ঢুকে পড়েছে পৃথিবীর কক্ষপথে। আবহমণ্ডলে একটি শাটল ক্রাফট ওটাকে স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছিল। শাটল ক্রাফটে আছেন পৃথিবীর সেরা কয়েকজন বিজ্ঞানী। পৃথিবী থেকে একশো মাইল উঁচুতে এ মুহূর্তে অবস্থান করছে এক্সপ্লোরার। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে আসা শাটল ক্রাফটটি এক্সপ্লোরার-এর কাছাকাছি নোঙর করেছে। ডিপ স্পেস যানটির ডকিংহ্যাচের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন সিনিয়র প্রশাসনিক কর্মকর্তা জেমস রবসন। তাঁকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। কারণ এক্সপ্লোরার নির্ধারিত সময়ের আগেই অভিযান থেকে ফিরে এসেছে।

এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ওদের সঙ্গে কোনও রেডিও যোগাযোগ নেই। এর রহস্য অবশ্য এখুনি উদ্‌ঘাটিত হবে।

এক্সপ্লোরার-এর এণ্ট্রি হ্যাচ-এ একটি লিমপেট-মাইক বসিয়ে দিয়েছে কমিউনিকেশন টেকনিশিয়ান। অনেকক্ষণ কান পেতে শুনল সে। তারপর বিমূঢ় দৃষ্টি নিয়ে মুখ তুলে তাকাল।

'একটা কেমন বোঁওওও গুঞ্জনের শব্দ শুধু শুনলাম, স্যর।'

কাঁধ ঝাঁকালেন রবসন। তারপর হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রবেশ পথের হ্যাচ-এর দরজা খোলার জন্য...

অনীশ দাস অপু

থাংগি

কী ভয়ংকর উত্তাপ! খরতাপে বিশাল নদীটি শুকিয়ে খরখর করছে। নদীর তীরের গ্রামের অবস্থা আরও ভয়াবহ। নিস্তেজ, ধুলোময় এবং বিরান। ঘাসগুলো সব পুড়ে গেছে, গত ঋতুতে জন্মানো কাটা ধানের মুড়া ছাড়া আর কিছু নেই মাঠে। তীব্র রোদে ওগুলো পুড়ে ঝলসে রয়েছে। বড়-বড় তেঁতুল আর বটগাছগুলোর পাতা নেই, ছাল ছাড়ানো কংকালের মত লাগছে।

এরকম ভীতিকর পরিবেশে রিভার বেড বা নদীগর্ভের বালুগুলো আরও প্রকট হয়ে ফুটে আছে। উত্তপ্ত সারফেস শীতল করতে কোথাও ছায়ামাত্র নেই। অথচ একটা সময় কত মনোরম ছিল গ্রামের দৃশ্যাবলী। কল্লোলিনী কাবেরী নদী কলকল ছলছল শব্দে গা-ভরা যৌবন নিয়ে বয়ে চলত, নদী তীরের মাঠে প্রচুর পরিমাণে জন্মাত ধান, ভুট্টা, বাজরা আর সব্জি।

নদীর কুমবাকোনাম তীরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল থাংগি। একটা জরুরি কাজে তাকে নদীর ওপাড়ে যেতে হবে। তার বাম কোলে তার বাচ্চা। এখনও পুরোয়নি বছর। যদিও বয়সের তুলনায় শিশুটিকে বড়সড়ই দেখায়। থাংগি হাঁটার সময় বাচ্চাটা সারাক্ষণ সামনের দিকে ঝুঁকে মায়ের বাম স্তনটি মুখে পুরে চোষার চেষ্টা করছে। থাংগির পরনে শুধু শাড়ি। লাল পেড়ে সাদা শাড়িটা সে এক প্যাঁচ দিয়ে পরেছে। আঁচলটা বুকের ওপর। গরমের সময় দক্ষিণের কর্মজীবী মহিলারা এভাবেই শাড়ি পরে। শাড়ি সরিয়ে দুধ খেতে বাচ্চার কোনই অসুবিধে হচ্ছে না।

থাংগি যাচ্ছে তার স্বামীর চাচার বাড়ি। তার স্বামীর মত এ চাচাও পেশায় একজন ক্ষুদ্র কৃষক, থাকে নদীর ওই পাড়ে। চাচা কিছু ধানের বীজ দেবে বলেছিল। থাংগির স্বামীর জমানো বীজ এক রাতের মধ্যে সব খেয়ে সাফ করে ফেলেছে রাক্ষুসে ইঁদুরের দল। কিছুদিন পরে বর্ষা নামবে। মাটিতে বীজ পুঁততে হবে। থাংগির স্বামীর এক টুকরো জমি আছে, ওখানে সে অমানুষিক পরিশ্রম করে ধান এবং সব্জি ফলায়। গত কয়েকদিন ধরে আকাশ জুড়ে বজ্রমেঘের আনাগোনা চললেও ভয়াল উত্তাপের লৌহ বলয় ভেঙে ফেলতে

পারেনি। তবে এরকম অবস্থা চিরদিন নিশ্চয় চলবে না। বৃষ্টি আসবেই।

মগজ গলানো, চামড়া পোড়ানো এই ভয়ংকর রোদে থাংগিকে চাচার বাড়ি পাঠাতে চায়নি তার স্বামী। কারণ ঝাড়া ছয় মাইল রাস্তা পার হয়ে তাকে নদীতে পৌছাতে হবে, তারপর নদীর অপর পাড় থেকে আরও ছয় মাইল হাঁটতে হবে। হাঁটতে তারা ভয় পায় না। কারণ জন্মের পর থেকেই হণ্টনে তারা অভ্যস্ত। কিন্তু এই উত্তাপ! তবু এ গরম সয়েই ভূমি কর্ষণ করতে হবে থাংগির স্বামীকে। এক বলদে টানা লাঙল দিয়েই সে জমি চাষ করবে। কিন্তু লাঙল দিয়ে মাটি ফাড়লেই তো হবে না, ওতে বীজ রোপণ করতে হবে। না হলে সব খাটাখাটনি বৃথা। চাচা বেশ কিছুদিন ধরেই 'দিচ্ছি দেব' করেও বীজ দিচ্ছে না। শেষে থাংগিই প্রস্তাব দেয় সে নিজেই চাচার বাড়ি যাবে। তাকে দেখলে চক্ষুলজ্জার খাতিরে হলেও বীজ না দিয়ে পারবে না চাচা। থাংগির স্বামী তার বউকে মানা করেছিল বেরুতে। কিন্তু সময়মত বীজ না পুঁতলে সবাইকে যে না খেয়ে মরতে হবে, এ কথা থাংগি মুখ ঝামটা দিয়ে মনে করিয়ে দিলে নিরীহ স্বামী যুক্তি খণ্ডন করতে না পেরে চুপ হয়ে থেকেছে। সে নিজেই হয়তো এই দুঃসাহসী অভিযানে যেত (অভিযানই তো! এমন ভীষণ রোদে একটা শকুন বা চিল পর্যন্ত উড়ছে না আকাশে। কুকুরগুলো সব জিভ বের করে হ্যা হ্যা করছে ক্লান্তিতে!)। কিন্তু মাত্র সেদিনই জ্বর থেকে উঠেছে থাংগির স্বামী থিরুঙ্গা। বেজায় দুর্বল শরীর। কাজেই তার যাওয়ার প্রশ্নই নেই। থাংগি বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কারণ ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা গড়াতে পারে। দুধের বাচ্চাটা ততক্ষণে দুধ না পেলে খিদের চোটেই হয়তো পটল তুলবে।

এ বছর গরমও পড়েছে! অন্য সব বছর ফেল। গত কয়েক দিন ধরে উত্তাপ বেড়েই চলেছে। গরমের চোটে অনেক গবাদী পশু মারা গেছে, নেড়ি কুত্তাগুলো গেছে পাগল হয়ে, আর কত শত পাখি যে মারা গেছে তার হিসেব নেই। এমনই গরম, পোকামাকড়ের দল পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেছে গাঁ থেকে। রাস্তা এবং মাঠে পড়ে থাকে মৃত জানোয়ার। সূর্যাস্তের অনেক পরে, তখনও বাতাস গরম, তবে চামড়ায় ফোস্কা পড়ার মত নয়, গ্রামবাসী মরা জানোয়ারের লাশগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে।

মধ্যাহ্নে তারা কেউ মাঠে কাজ করে না, জানে কখন বিরতি দিতে হবে কর্মে, ফিরে আসে মাটির ঘরে, টিউবওয়েল থেকে স্ত্রীদের সংগ্রহ করে আনা

তেতো স্বাদের পানি ঢকঢক করে পান করে। জলতেষ্টা আর পানি শূন্যতায় গাঁয়ের লোক হয়তো বেশিরভাগই অনন্ত যাত্রা করত যদি না বছর তিনেক আগে সদাশয় সরকার তাদের গাঁয়ে দুটো টিউবওয়েল বসানোর ব্যবস্থা করত। যতই গরম পড়ুক, টিউবওয়েলে পানি থাকেই, এমনকী বিরাট নদীটি শুকিয়ে কংকাল হয়ে যাওয়ার পরেও।

নদীর তীরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে থাংগি। তাকায়। সে নদীর তীর ধরে দু'মাইল রাস্তা হেঁটে এসেছে, পার হয়েছে বেড়ীবাঁধ। এ বাঁধটা একজন হৃদয়বান তামিল রাজা একশো বছর আগে তৈরি করেছিলেন। বাঁধটি এ পর্যন্ত শতাধিকবার সংস্কার এবং মেরামত করা হয়েছে। এবং এখনও নিরাপদে এবং মজবুতভাবেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাঁধের কাজ অতিবৃষ্টির কারণে সৃষ্ট জলরাশি গাঁয়ে ঢুকতে বাধা প্রদান। বাঁধের পেছনে রিজারভয়ার বা জলাধার রয়েছে। ওখানে খাল কেটে জলাধারের জল খালে প্রবেশ করানো হয়, এগুলোর সঙ্গে ইরিগেশন চ্যানেলের সংযোগ ঘটিয়ে গোটা গাঁ জুড়ে কৃষি জমিতে সরবরাহ করা হয় পানি।

তবে এ বছর একদমই বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণে এবং খর-উত্তাপে খালবিল সব শুকিয়ে গেছে। বাঁধের পেছনের জলাধারটিও জলশূন্য। থকথকে কিছু কাদামাখা জল ছিল। ভীষণ দহনে তাও বাষ্প হয়ে উবে গেছে। এখন খটখটে শুকনো মাটি।

থাংগি ঠিক করল এখান থেকেই সে নদীর কোলে নেমে পড়বে। তা হলে কিছুটা সময় বাঁচবে। সাঁঝের আগেই বাড়ি ফিরতে চায় থাংগি; কে জানে ঝড়ো মেঘ থেকে যদি বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়, তা হলে সে এবং বাচ্চা দু'জনেই ভিজে একসা হবে। নদীতে তখন পানি জমে যাবে। আর নদী পার হতে পারবে না সে। বেড়ীবাঁধ ঘুরে তখন যেতে হবে তাকে। অতিরিক্ত চার মাইল রাস্তা হাঁটতে হবে।

থাংগি নদীগর্ভের দিকে তাকাল। থেমে থেমে বাতাস বইছে। তীব্র আঁচ তাতে। গনগনে হাওয়া তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলছে শরীরে। নীচে, নদীর কোলে বাতাসে উড়ছে বালু, প্রতিটি দমকা হাওয়ায় বালুর ছোট ছোট ঢেউ তৈরি হচ্ছে। এ ছাড়া আর সবকিছু নিশ্চল, স্থির। চারদিকে কোথাও প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই।

গনগনে রোদে পুড়তে পুড়তে গাঁ থেকে ছ'মাইল রাস্তা ইতোমধ্যে পাড়ি

দিয়েছে থাংগি। মাঝে মাঝে দানবাকৃতির গাছগুলোর সামান্য ছায়া পেয়েছে। অবশ্য আগে এ বৃক্ষরাজি ছিল পত্রশোভিত, এখন ভয়াল দাবদাহে পাতাগুলো পুড়ে প্রায় ন্যাড়া হয়ে গেছে। তবু যৎসামান্য যেটুকু ছায়া বিলোচ্ছে, তার নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় প্রখর উত্তাপ থেকে স্বল্প হলেও রেহাই মিলেছে। নগ্নপদে হাঁটছে থাংগি, গাঁয়ের মানুষ খালি পায়ে হেঁটেই অভ্যস্ত, তার পায়ের পাতা খরখরে, শক্ত; পাথর কিংবা কঠিন জমিনে হাঁটার উপযুক্ত। কিন্তু মাটি এমন তেতে আছে, তাপ প্রবাহ ঢুকে যাচ্ছে শক্ত পায়ের তালু ভেদ করে। ঘুরল থাংগি। যে পথ দিয়ে হেঁটে এসেছে, তাকাল সেদিকে। গাছপালা ছাড়া যেদিকে চোখ যায় পুরোটাই ছাল ছাড়ানো ঊষর ভূমি।

ওদিক থেকে ছয় মাইল রাস্তা হেঁটে এসেছে সে, ভাবছে থাংগি। নদীর বালু এখন খুব গরম হয়ে আছে জানে সে। হয়তো দু'একটা ফোস্কাও পড়ে যাবে বালুর ওপর দিয়ে হাঁটার সময়। তবু দ্রুত হাঁটলে খুব বেশি ফোস্কা পড়ার আগেই নদীর ওপাড়ে পৌছে যেতে পারবে আশা করছে থাংগি।

রেডিয়োতে সন্ধ্যার খবরে ঘোষণা করা হবে আজ ১২০ ডিগ্রি তাপমাত্রা ছিল, তবে উত্তাপের মাত্রা কীভাবে মাপা হয় জানে না থাংগি। আর তাদের গাঁয়ে কোন রেডিয়োও নেই। মাঝে মাঝে সে তার স্বামীর সঙ্গে যখন কুমবাকোনামের বড় বাজারে আসে নিজেদের জমিতে উৎপাদিত গাছ আলু, কুমড়ো, শশা, বেগুন ইত্যাদি বিক্রি করতে তখন রেডিয়ো শুনেছে থাংগি। তবে দাঁড়িয়ে থেকে মজা করে রেডিয়োর গান শোনার সময় কোথায় তাদের? পণ্য বিক্রি হলেই সে টাকা দিয়ে প্রয়োজনীয় চাল, ডাল, তেল, নুন কিনে তাড়াতাড়ি বাড়ির পথ ধরতে হয়। রেডিয়োর মানুষদের সম্পর্কে ওদের আগ্রহও বিশেষ নেই। তাই রেডিয়োর খবরও শোনে না। তারা আবহাওয়া বদলের খবরের জন্য ভরসা করে গাঁয়ের বয়োবৃদ্ধদের ওপর। এই বয়সী মানুষগুলো অভিজ্ঞতা থেকেই বাতাসের গতিবিধি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। তবে সবসময়ই যে তাদের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যায় তা-ও নয়। দেবতারা যদি তাঁদের মর্জিমাফিক বাতাসের গতি পাল্টে দেন, ঝড়-বৃষ্টি ঘটান, তীব্র রোদ বাড়ান, সাধারণ মানুষের কী-ই বা করার আছে।

থাংগি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্যদেব হিংস্র আক্রোশে মেয়েটার ঘোমটা ছাড়া মাথাটি চোখ ধাঁধানো রশ্মির ছটায় পুড়িয়ে দিচ্ছেন, এ নিয়ে অন্তত; শ'খানেকবার হলো তীব্র দাবদাহ থেকে সন্তানের মস্তক রক্ষা করতে

তাকে আঁচল দিয়ে ঢেকে দিল তার মা।

কিন্তু প্রতিবারই হাত দিয়ে শাড়ি সরিয়ে দিচ্ছে শিশু দুগ্ধপানে অসুবিধে হচ্ছিল বলে। ছেলের দিকে সস্নেহে তাকিয়ে হাসল থাংগি। চুকচুক করে তার বাদামী স্তন চুষছে ছেলে। ছেলেকে সে জান দিয়ে ভালবাসে।

সামনের দৃশ্যপটে আবার চোখ ফেরাল থাংগি। গত কয়েক বছর শুকনোর সময় বহুবার এ নদীর কোল পায়ে হেঁটে পার হয়েছে সে। ওই সময় কখনও নদী আংশিক শুষ্ক ছিল কখনও পুরোটাই। বালুর ওপর দিয়ে হেঁটে গেছে, কোথাও গোড়ালি সমান, আবার কোথাও উরু পর্যন্ত ডুবে থাকা সরু খালের মত পানির ধারা পার হয়েছে। কিন্তু নদীগর্ভের এমন ভয়ংকর চেহারা কোনদিন দেখেনি সে। বালুকণাগুলো এমন ঝকঝক করছে, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। ভয়ানক উত্তাপে জ্বলন্ত কয়লার মতই জ্বলছে। তবু নদীগর্ভের এ চেহারা উদ্বিগ্ন করল না থাংগিকে।

বাচ্চাকে শক্ত করে কাঁখে চেপে ধরে নদীর তীর বেয়ে নামতে শুরু করল সে। পায়ের নীচের মাটি ধুলোর মত লাগছে, তবে একটু আগে হেঁটে আসা শক্ত জমিনের সমান উত্তাপ ছড়াচ্ছে না। নদীর তীর সাধারণত নানান ঝোপঝাড়, ঘাস, শ্যাওলা ইত্যাদিতে ঢাকা থাকে। কিন্তু সেগুলো এখন পুড়ে বাদামি স্তূপে পরিণত হয়েছে। থাংগির পা পড়ামাত্র ওগুলো গুঁড়িয়ে গিয়ে ধুলোয় রূপ নিচ্ছে।

বালুর কিনারে এসে দাঁড়াল থাংগি। তাপপ্রবাহের ঢেউয়ে এমনভাবে উড়ছে বালুকণা, যেন জ্যান্ত। বালুর উপরিভাগ উত্তাপ বিকিরণ করছে, তবে কেমন ঝাপসা লাগছে। বালুর ওপরে বয়ে যাওয়া বাতাস্ যেন গলিত কাঁচ।

সামনে কদম বাড়াল থাংগি। হাঁটা ধরল। বালু অসহ্য গরম। পদক্ষেপ দ্রুত করল ও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওপাড়ে পৌছাতে চায়। কিন্তু যত দ্রুত এগোতে চাইল সে, ততই বালুতে গভীরভাবে দেবে গেল পা, গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গেল। থাংগির মনে হলো সে তার বাড়ির জ্বলন্ত চুল্লিতে পা ফেলছে। বেগে হাঁটার চেষ্টা করল বটে, আসলে দ্রুত এগোতে পারল না থাংগি। এবার সে ছোট ছোট কদমে তড়িৎ পদক্ষেপ ফেলার চেষ্টা করল। তবে ফল হলো আরও খারাপ। তার মনে হচ্ছে নরকের বুকে হেঁটে বেড়াচ্ছে, যেন জ্বলন্ত কয়লার ওপর পা ফেলছে। সে গ্রামের মেলায় ফকির এবং সন্ন্যাসীদের লাল টকটকে গনগনে কয়লার ওপর খালি পায়ে স্বচ্ছন্দে হাঁটতে দেখেছে। অবাক

হয়ে ভেবেছে এটা কী করে সম্ভব! জ্বলন্ত কয়লার ওপর তাঁদের হাঁটতে মোটেই কষ্ট হয়নি; পায়ের পাতা পুড়ে যাওয়া দূরে থাক, ফোস্কা পর্যন্ত পড়েনি! ফকিররা বলেছেন পুরোটাই নাকি সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাসের কারণে ঘটেছে। থাংগি দেবতাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। কিন্তু দেবতারা তখন নিশ্চয় শীতল তৃণভূমিতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। থাংগির কাতর আবেদন শুনতে পেলেও তাতে কর্ণপাত করলেন না। কাজেই দেবতাদের ওপর ভরসা না করে হেঁটে চলল থাংগি। কখনও সজোর পদক্ষেপে, কখনও মন্থর গতিতে। কারণ বুঝতে পারছিল না কী করবে। দ্রুত কিংবা ধীর, যে গতিতেই হাঁটুক না কেন থাংগি, প্রতিটি কদমেই উত্তপ্ত বালু তার পা পুড়িয়ে দিচ্ছিল।

থাংগির নদীগর্ভে নেমে পড়াটাকে কেউ দোষ দিতে পারবে না। সে বয়সে তরুণী আর অভিজ্ঞ পর্যটকদের তুলনায় তার ভবিতব্য কী হবে তা নিয়তিই বলতে পারে। অনেকেই পরোয়া না করে দূর যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে যেখানে সাহায্য না পেলে তীব্র ঠাণ্ডায় কিংবা ভীষণ গরমে কত কী অঘটন ঘটে যেতে পারে। যাত্রার শুরুতে সবাই ভাবে একটু-আধটু সমস্যা হতেই পারে এবং তা মেনে নেয়ার মানসিক প্রস্তুতিও তাদের থাকে। কিন্তু যত সময় যায়, ঠাণ্ডা, উত্তাপ কিংবা ঝড়ো বাতাসের বেগ যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে, অভিযাত্রীর মনে ভীতির সঞ্চার হয়, এক পর্যায়ে তীব্র আতংক গ্রাস করে ফেলে তাকে। দুর্গম এ যাত্রা থেকে প্রাণে বেঁচে গেলেও দেখা যায় ভয়াল তুষার ঝড়ের কষাঘাতে ফ্রস্টবাইটে আক্রান্ত হয়ে সে হাত বা পায়ের আঙুল হারিয়েছে কিংবা ভয়ংকর উত্তাপ তাকে চরম অবসাদের সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছে। থাংগির আত্মবিশ্বাস ছিল সে নদীগর্ভ পার হয়ে যেতে পারবে, মনে ক্ষীণ সন্দেহ যদি জন্মেও থাকে তা সে পাত্তা দিতে চায়নি তারুণ্যের জোয়ারের শক্তিতে। এবং সে মোটেই সময় নষ্ট করতে চাইছিল না।

কিছুক্ষণ আগে নেমে আসা নদীর তীরের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল থাংগি। অনুমান করল প্রায় সিকি মাইল রাস্তা পার হয়েছে। এক মুহূর্তের জন্য দোটানায় ভুগল ফিরে যাবে কি না। তা হলে নদীর তীর ঘেঁষে, বেড়ীবাঁধ ঘুরে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। দূরের আকাশে মুখ তুলে চাইল থাংগি। অশুভ চেহারার কালো কালো মেঘ জমেছে। নাহ্, সামনেই এগোবে থাংগি।

ওর পায়ে এখন ফোস্কা পড়তে শুরু করেছে, ফেটে যাওয়া চামড়া জ্বলছে। কোলের বাচ্চাটা অস্থিরভাবে নড়াচড়া করছে। তার মাথা এবং

কাঁধের চামড়া ইতোমধ্যে ঝলসে গিয়ে লালচে হয়ে গেছে। কুঁইকুঁই করে কাঁদতে শুরু করেছে বাচ্চা।

হেঁটে চলল থাংগি। ফোস্কা পড়া, ভয়ানক জ্বলতে থাকা পা ফেলে হেঁটে চলেছে সে। সামনে নিষ্করুণ বালুর সমুদ্র। এই নদী জীবনদায়িনী, ভাবছে থাংগি, আবার বর্ষার সময় দু'কূল ছাপিয়ে যখন হুহুংকারে গাঁয়ে ঢুকে পড়ে তখন সে পরিণত হয় জীবনহরণকারীতে। বানের জলে সে সামনে যা পায়—মানুষ, গরু, ছাগল, বাড়ি-ঘর সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তবে এসবই প্রকৃতির অমোঘ বিধান বলে মেনে নিয়েছে সবাই। তাই তো কাবেরী নদী তাদের পূজ্য দেবী। কিন্তু বন্যার সময় ছাড়াও কাবেরী যে কত ভয়ংকর হতে পারে তা চাক্ষুষ করেনি থাংগি।

নদীগর্ভের মাঝামাঝি জায়গায় এসে পড়েছে ও। এখন আর ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাকে সামনেই এগোতে হবে। প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছে, গলা শুকিয়ে কাঠ।

কোথাও কোন কিছুর সাড়াশব্দ নেই। শুধু থাংগি নিজের হৃদস্পন্দন আর নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ পাচ্ছে। এমন সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে লাগল। টের পেল কোথাও স্থির দৃষ্টিতে তাকাতে পারছে না সে, পা-জোড়ার ওপরেও নিয়ন্ত্রণ নেই, ওগুলো যেন নিজেদের ইচ্ছে মাফিক চলছে। আর সবচেয়ে বাজে ব্যাপার, থাংগির মনে হচ্ছে তার মাথাটা আর তার দেহের সঙ্গে নেই, উড়ে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ কীসে যেন হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল ও। তবে সহজাত প্রবৃত্তির বশে সন্তানকে সে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকল। উত্তপ্ত বালুর ওপর পড়ল শরীর। ভয়ানক ছ্যাঁকা খেল থাংগি, সারা শরীরে যেন জ্বলন্ত কয়লা চেপে ধরেছে। যন্ত্রণায় চিৎকার দিল সে, মুক্ত হাতটা মাটিতে ঠেকিয়ে উঁচু করল শরীর, তারপর সিধে হলো।

আর পারছে না থাংগি। পায়ের ফোস্কা ফেটে রক্ত পড়ছে। কী যে ভয়ংকর জ্বলুনি! তবু ইচ্ছাশক্তির সবটুকু জড় করে সে আবার হাঁটতে থাকল। শরীরের ঊর্ধ্বাংশের শাড়িটুকু সে টান মেরে ছিঁড়ে ফেলল, তারপর ওটা ছুঁড়ে দিল পায়ের সামনে। তারপর লাফিয়ে খণ্ডিত শাড়ির ওপর এসে দাঁড়াল। ওখানে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। পাতলা শাড়ি ভেদ করে উত্তাপ ক্ষতবিক্ষত পায়ের পাতায় কামড় বসাচ্ছে বটে, তবে জ্বলন্ত কয়লাসম তাপ খানিকটা হলেও কম অনুভূত হচ্ছে। সামনে কদম বাড়াল থাংগি, ঘুরল,

কাপড়ের টুকরোটা তুলে নিল জমিন থেকে তারপর আবার ওটা ছুঁড়ে দিল সামনে। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এল, বস্ত্রখণ্ডটি উড়িয়ে নিয়ে গেল বেশ কয়েক হাত দূরে। উন্মাদের মত ছেঁড়া শাড়িটির দিকে ছুটল থাংগি। কিন্তু ওটা আবার ঝলক হাওয়ায় আরও দূরে উড়ে চলে গেল। ভয়-আতংকে অস্থির থাংগি আবার দৌড়াল বস্ত্রখণ্ডটি লক্ষ্য করে।

অকস্মাৎ শরীরের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে গেল থাংগির। তার মাথাটা যেন সত্যি ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হলো। থাংগি যেন দেখছে মাথাটা ভেসে আছে শূন্যে, জ্বলন্ত সূর্যের নিষ্ঠুর কিরণে ভাজাভাজা হচ্ছে। গোটা শরীর কেঁপে উঠল থাংগির, কাতরে উঠল সে, তারপর সে যে কাণ্ড করল কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

কেউ যদি নদীর অপর পাড়ে থাকত, সে গা শিউরানো একটি দৃশ্য দেখতে পেত এবং দৃশ্যটির কথা পরে সে কাউকে বললেও কেউ তার কথা বিশ্বাস করত না। অবশ্য অনেক দূর থেকে দৃশ্যটা দেখছে বলে সে পুরোপুরি বুঝতেও পারত না কী নারকীয় ঘটনা ঘটে চলেছে উত্তপ্ত নদীগর্ভে। সে শুধু উত্তাপের ঢেউয়ের মধ্যে দেখতে পেত একটি নারী তার কোল থেকে কী যেন একটা জিনিস মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এবং ওটার ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। দর্শকটি যদি বেশ কাছে থাকত তা হলে শুনতে পেত কারও প্রাণঘাতী আর্তনাদে কেঁপে উঠেছে বাতাস। তারপর শ্বাস রোধ হওয়ার ঘরঘরে শব্দ। তারপর আবার আগের মত সব সুনসান। দর্শক কাছে থাকলে বুঝতে পারত মৃত্যু ক্রন্দনটি করেছে বালুতে পড়ে থাকা জিনিসটা, যেটি এখন কুঁকড়ে-মুকড়ে স্থির হয়ে পড়ে আছে খর-জমিনে। ওটার গায়ের চামড়া ঝলসানো, ভারী পায়ের চাপে দলামোচড়া দেহ।

দর্শক যদি তাকিয়ে থাকত, দেখতে পেত মহিলা ওই জিনিসটার ওপর থেকে নেমে পড়েছে, ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং ঝুঁকে ওটাকে আবার তুলে নিয়েছে, সে দু'এক কদম এগোনোর পরে ওটাকে আবার ছুঁড়ে দিল সামনে, তারপর দ্বিতীয়বার ওটার গায়ের ওপর উঠে দাঁড়াল। এভাবে এক ডজনবার বা তারচেয়েও বেশি সময় ধরে কাণ্ডটির পুনরাবৃত্তি করল মহিলা। এভাবে সে নদীর অপর তীর লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল। তবে দর্শক যদি তখনও নদীর তীরে থাকত মহিলা আসলে বারবার কী ছুঁড়ে দিচ্ছে এবং পরক্ষণে তার ওপর পা তুলে দাঁড়াচ্ছে দেখার জন্য, মহিলা কাছিয়ে এলে তার হাতে ধরা বিকট,

বীভৎস জিনিসটা দেখার পরে সে (দর্শক) এমন জোরে চিৎকার দিত অমন চিৎকার সে জীবনেও দেয়নি এবং মহিলা নদী তীরে পৌছানোর আগেই বমি করতে করতে সে ছুটে পালাত।

রাত হওয়ার পরেও থাংগি ফিরল না দেখে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল তার স্বামী। অশুভ সব চিন্তায় ভীত হয়ে উঠল সে। বারবারই মনে হচ্ছিল, থাংগির কোন দুর্ঘটনা হয়েছে কিংবা সাপখোপের কামড় খেয়েছে। গাঁয়ে বিষাক্ত গোক্ষুর আর কেউটে সাপের অভাব নেই। অনেকেই সাপের কামড়ে মারাও যায়। সে পড়শীদের বাড়ি গেল। এতক্ষণেও বউকে খুঁজতে বেরোয়নি বলে পড়শীরা প্রথমে থিরুঙ্গাকে একচোট বকা দিল, তারপর লণ্ঠন জ্বেলে থাংগির সন্ধানে নদীর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল।

থাংগিকে খুব বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। বালু এখন দুপুরের মত উত্তপ্তও নয়। থাংগিকে পাওয়া গেল নদীর ধারে, একটা গর্তের মধ্যে শুয়ে আছে। তার পাশে পড়ে আছে ঝলসে কালো হয়ে যাওয়া, নাড়িভুঁড়ি বেরুনো, দলাপাকানো বিকট দর্শন মাংসের একটা দলা।

বেঁচে আছে থাংগি। তার স্বামী তাকে কোলে তুলে নিল। এক গ্রামবাসী মাংসের দলাটা কাঁধের কাপড় খুলে তাতে পেঁচিয়ে নিল। তারপর তারা ফিরে এল গাঁয়ে আলোচনা করতে করতে কী ঘটেছে। আসলে কী ঘটেছে তারা কেউই বুঝতে পারছিল না, অনুমান করতেও পারছিল না। সবাই কথা বললেও শুধু নিশ্চুপ ছিল থাংগির স্বামী। সে থাংগির মতই পাথর বনে গিয়েছিল।

থাংগি আজও বেঁচে আছে। দক্ষিণ ভারতের ওই গাঁয়ে গেলে আপনারা ওকে এখনও দেখতে পাবেন। তবে তার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। কারণ পাগল হয়ে গেছে থাংগি। তবে নির্বাক পাগল। ওই ঘটনার পর থেকে সে বাক্‌হারা হয়ে গেছে চিরতরে। আর সেই ভয়ংকর দিনটির বিভীষিকাময় স্মৃতি আজও তাড়িয়ে বেড়ায় গ্রামবাসীদের।

[গল্পটি বিশেষাদ্রির Riverbed অবলম্বনে লেখা। তবে কাহিনিটি অধিকতর রোমাঞ্চকর করে তুলতে কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের স্বাধীনতা আমি নিয়েছি–লেখক]

অনীশ দাস অপু

ফেরা

দরজার এপারে একজন, ওপারে অন্যজন; নীরবে দাঁড়িয়ে দু'জন পরস্পরকে কিছুক্ষণ দেখে নিল। বাইরে শরতের সন্ধ্যা মাত্র নেমেছে, দুরন্ত গতিতে বইছে বাতাস। কেয়ারটেকার মিসেস পার্ক মোমবাতি হাতে অপেক্ষা করছে আগন্তুকের বক্তব্য শোনার জন্যে। তার কাঁধের পাশ থেকে আকাশের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। বিক্ষিপ্তভাবে ভেসে বেড়ানো কৃষ্ণবর্ণের টুকরো টুকরো মেঘগুলো দ্রুত শুষে নিচ্ছে দিনের শেষ ধূসর আলোটুকুও। ওদের মাঝে মোমের শিখা থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল। যেন একটা হলুদ পতাকা রুদ্ধ আক্রোশে হলরুমের অন্ধকার দেয়ালে মাথা কুটে মরতে চাইছে।

আগন্তুক দীর্ঘদেহী। প্রশস্ত, চওড়া কাঁধ। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়স। মুখভর্তি ধূসর দাড়িগোঁফ পরিপাটি করে ছাঁটা। মাথার ওপর কালো টুপিটা সামনে ঝুঁকে থাকায় চওড়া কপালের অনেকখানি ঢেকে গেছে। পরনের কোটটার বয়স নিশ্চয়ই তার মালিকের বয়সের চেয়ে কোন অংশে কম হবে না। এ ধরনের সেলাই আজকাল খুব একটা দেখা যায় না।

দরজা খোলার শব্দ কানে যেতেই ডান হাতটা পকেটে ঢুকে গিয়েছিল, একটা মুখবন্ধ খাম বের করে মিসেস পার্কের হাতে ধরিয়ে দিল আগন্তুক।

'মেসার্স ফ্লেক অ্যাণ্ড লিম্পেনি থেকে অর্ডার নিয়ে এসেছি,' বলল সে। 'বাড়িটা দেখব। জানি, বড় অসময়ে আসা হলো...কিন্তু কী আর করার ছিল–সময়মত ট্রেনটা ধরতে পারলাম না, পরের ট্রেনও দেরি করে পৌঁছল। আশা করি এসময় বাড়িটা দেখতে চাইলে কিছু মনে নেবেন না আপনি।'

নিচু সুরে, নার্ভাস ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল লোকটা, যেন অনেক সময় ধরে প্র্যাকটিস করা সংলাপ আউড়ে গেল। খানিকটা পিছিয়ে এল মিসেস পার্ক।

'ভেতরে আসুন, স্যর,' বলল মহিলা। 'ভয় হচ্ছে ভাল করে বাড়িটা দেখতে পারবেন কিনা...এই মোমবাতিটা-ই যা ভরসা। কারেন্ট, গ্যাস কোনটার বালাই নেই এখানে।'

আগন্তুক ভেতরে প্রবেশ করল। পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে তাকাল কেয়ারটেকারের দিকে। মহিলা লম্বা, ক্ষীণকায়, মধ্যবয়স্কা; হাসপাতালের মেট্রন হিসেবেই বোধহয় মানানসই হত। চোখ-মুখের ভাব পুরোপুরি নমনীয় নয়–যদিও বুঝতে অসুবিধা হয় না মহিলা এ বয়সেও যথেষ্ট কর্মঠ এবং নিজের পেশার প্রতি আক্ষরিক অর্থেই সৎ আর নিবেদিত প্রাণ।

মিসেস পার্ক নিস্পৃহ সুরে বলল, 'দেখাদেখির কাজটা এই আবছা আলোতেই আপনাকে সারতে হবে। আজ অবশ্য কাউকে আশা করিনি আমি। খুব কম লোকই ইদানীং এখানে আসে। আর যা অবস্থা ঘরদোরের। বুঝতেই পারছেন এত বড় বাড়ি পরিষ্কার রাখতে এক জোড়া হাতে কুলোয় না...'

'অনেকদিন ধরে খালি পড়ে আছে বাড়িটা?' লোকটা সতর্ক সুরে জানতে চাইল।

'সেই যখন–'মহিলা থেমে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার শুরু করল, 'তা বিশ বছর তো হবেই।' ঘুরে দাঁড়াল, উঁচু হলো মোমবাতি ধরা হাতটা। 'এটা হলরুম। প্রকাণ্ড-তাই না? সিঁড়ির দিকে তাকান, ধাপগুলো দেখুন। যে দেখে সেই প্রশংসা করে। শুনেছি বাড়িটার উপযুক্ত ক্রেতা না পাওয়া গেলে সিঁড়িটা আলাদা করে বেচা হবে। ওক কাঠের মজবুত প্যানেলিংও রয়েছে। আর লাইব্রেরিটা...'

লোকটা তার কথা শুনছে কিনা দেখার জন্যে মহিলা ঘাড় ফেরাল। স্থির, শান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে, লম্বা হাতদুটো বুকের ওপর পরস্পরের সাথে বাঁধা।

'মাফ করবেন,' বলল সে। 'দীর্ঘ ট্রেন জার্নিতে দারুণ ধকল গেছে। এক কাপ চা হলে দারুণ হত।'

'অসুবিধা নেই,' মহিলা জবাব দিল। 'চুলো জ্বালানোই আছে। আমারও এক কাপ খাওয়া হবে। আগুনের পাশে বসে খানিকটা আঁচ পোহানো হবে।'

মহিলার পিছু নিয়ে দীর্ঘ হলরুমটার শেষ মাথায় দরজা পর্যন্ত এগোল লোকটা। দরজার গায়ে বিচিত্র নকশা করা। লোকটা ঠিকমত তাকে অনুসরণ করছে কিনা তা দেখার জন্যে একবার পিছন ফিরে তাকাল মিসেস পার্ক। লোকটাকে ঈষৎ খোঁড়াতে দেখে বিস্মিত হলো সে। দরজা খুলতে

সরু প্যাসেজে পড়ল ওরা। প্যাসেজের শেষ মাথায় কিচেন; সেখানে দাঁড়াল না। কিচেনের উল্টো দিকের দরজাটা পার হতেই আরও একটা সংকীর্ণ প্যাসেজ দেখা গেল। মিসেস পার্কের থামার কোন লক্ষণ নেই। তাকে অনুসরণ করে নাতিদীর্ঘ পার্লারে এসে পৌঁছল লোকটা। বোঝাই যাচ্ছে মিসেস পার্কের ব্যক্তিগত কামরা এটা। ঘরটা উষ্ণ এবং আরামদায়ক। অতিরিক্ত কোন আসবাবপত্র নেই; ছিমছাম পরিপাটি ঘর। কোণের ছোট টেবিলটা লাল রঙের টেবিল ক্লথ দিয়ে ঢাকা। একটা প্যারাফিন ল্যাম্প জ্বলতে দেখা গেল ওটার ওপর। চেয়ার টেবিল ছাড়া আসবাব বলতে রয়েছে একটা ডাবল বেড আর কাবার্ড। কাবার্ডটা অতিকায়, প্রাচীন আমলের। একদিকের দেয়ালে বড় সাইজের কতগুলো তৈলচিত্র টাঙানো। গুমোট হলরুম আর স্যাঁতস্যাঁতে প্যাসেজ পার হয়ে এখানে আসতে পেরে বেশ আরাম বোধ করতে লাগল লোকটা।

'একটা চেয়ার টেনে আরাম করে বসুন, স্যর। চা খান। এই ফাঁকে আমি বরং কিচেনে গিয়ে আমার ভাগটা শেষ করে নিই,' কেয়ারটেকার বলল। হাতের মোমবাতিটা এক ফুৎকারে নিভিয়ে টেবিলের ওপর রাখল সে।

'ছি, ছি, তা কেন করবেন? আসুন, একসাথে চা পর্বটা শেষ করি আমরা। তা ছাড়া আলাপ করতেও বেশ লাগছে আমার। ভাল কথা, আমি রয়েড। ষ্টেফান রয়েড। আর আপনার হাতের খামটাতেই অর্ডারের কপিটা রয়েছে।'

খামের মুখ ছিঁড়ে টাইপ করা কাগজটা বের করল মিসেস পার্ক, দ্রুত একবার চোখ বুলাল তাতে। লেখাগুলোর চেয়ে রয়েড লোকটাই তাকে বেশিমাত্রায় কৌতূহলী করে তুলছে। মাথা থেকে হ্যাট নামাল সে। বেরিয়ে পড়ল কটা রঙের চুল। কথাবার্তা তো ভদ্রলোকের মতই, কিন্তু চেহারা দেখে কই, তেমন ঐশ্বর্যশালী বলে মনে হচ্ছে না। ক্রেতা কিংবা ভাড়াটিয়া–কোনভাবে মেলানো যাচ্ছে না তাকে। যদিও খদ্দের হিসেবে ঠিক কোন ধরনের ক্রেতা এলে মানানসই হত, আন্দাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলো মিসেস পার্ক।

কাবার্ড খুলে চায়ের কাপ নামিয়ে সাজাতে লাগল মহিলা। হঠাৎ বলে উঠল লোকটা, 'পরনের কোটটা খুললে কিছু মনে করবেন আপনি? বেশ

গরম ঘরটা।' গা থেকে কোট সরিয়ে চেয়ারের পেছনে ঝুলিয়ে রাখল সে। 'গোটা বাড়িতে কি আপনি একাই থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'নার্ভাস লাগে না?'

তার দিকে ঝট করে তাকাল মহিলা।

'নার্ভাস! নার্ভাস হবার মত কি আছে এখানে?'

'জানি না। অনেক লোক আছে যাদের আবার নির্জনতা সহ্য হয় না। দয়া করে বলবেন কি এতদিন ধরে বাড়িটা খালি পড়ে আছে কেন?'

মিসেস পার্কের চোখ মুখ শক্ত হয়ে উঠল। 'উত্তরটা খুব সোজা। এটা মালিকবিহীন বাড়ি।'

'সেটাই তো জানতে চাইছি, মালিকবিহীন কেন?'

'এত বড় বাড়ি কেনার সামর্থ্য যারা রাখে, স্বভাবতই বাড়ির আশপাশে পর্যাপ্ত জমিও তারা আশা করে। গণ্ডগোলটা বাধে এখানেই। খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই, সেরকম কোন জমিজমা এখানে নেই। আর যারা জমি চায় না স্বাভাবিকভাবেই এত বড় বাড়ি কেনার ক্ষমতা তারা রাখে না। অনেক আগে মেজর স্কাটিং কিনেছিলেন এস্টেটটা। ভদ্রলোকের নিজস্ব বাড়ি ছিল। আশপাশের সমস্ত জমি-ই বিক্রি করে দিলেন তিনি। এরপর ফ্লেক অ্যাণ্ড লিম্পেনি-ই বাড়িটা বিক্রির ভার নিয়েছে। আপনার আগে কম করেও একশোজন এসে দেখে গেছে, দ্বিতীয়বার ভুলেও কেউ আর এমুখো হয়নি।'

'আশ্চর্য! এত বড় বাড়ি অথচ জমির অভাবে কিনা...হুম, বুঝতে পেরেছি আপনার বক্তব্য। মেজর স্কাটিং বাড়িটা কিনেছিলেন কার কাছ থেকে?'

'ভদ্রলোকের নাম ছিল হারবয়েজ, একেবারে পানির দরে বিক্রি হয়েছিল বাড়িটা,' মিসেস পার্ক জবাবে বলল। অকস্মাৎ চেয়ার ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। একদিকে সামান্য কাৎ হলো তার মাথা, কী যেন শোনার চেষ্টা করছে সে এখন।

'কিছু শুনতে পাচ্ছেন?' রয়েড তীক্ষ্ণ সুরে জিজ্ঞেস করল।

'না, মানে-ঠিক আছে...আমি চা বানাচ্ছি।' বিব্রত দেখাচ্ছে মহিলাকে।

'মনে হচ্ছে প্রায়ই অদ্ভুত কিছু শুনতে পান আপনি, তাই না?'

কোন উত্তর এল না। চায়ের কেতলি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মিসেস

পার্ক। টিপটটা পুরো ভরে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রয়েড। এরপর প্রশ্নটা আবার করল।

'শুনি মানে?' মহিলা পাল্টা জিজ্ঞেস করল। কণ্ঠে রুক্ষতা। 'নাহ, কেন শুনবে?'

'মানে এরকম প্রকাণ্ড, শূন্য বাড়িতে...'

'আমি কল্পনাপ্রবণ নই, স্যর...দয়া করে চায়ে দুধ চিনি মেশাবেন কি?'

বোঝা গেল আলাপের গতি প্রকৃতি তার মনঃপূত হচ্ছে না। অথচ তার চোখ-মুখের শুকনো ভাবটুকু রয়েডের নজর এড়াল না। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। এই নির্জন পরিবেশের সঙ্গে মেয়েলোকটা নিশ্চয়ই এখনও নিজেকে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারেনি। মেজাজ দেখিয়ে তাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছে ঠিকই-তবুও পরিষ্কার আন্দাজ করা যায় ভয় পেয়েছে মিসেস পার্ক। মনে মনে লড়াই করছে একটা ভীতি বোধটুকুর বিরুদ্ধে।

'ধন্যবাদ,' হাত বাড়িয়ে ধূমায়িত চায়ের কাপ নিয়ে বলল রয়েড।' 'এই হারবয়েজটা কে? এখনও বেঁচে আছে?'

'বলতে পারব না।' রয়েডের পাশের চেয়ারটা টেনে বসল মিসেস পার্ক। চেহারা এখনও কাঠ হয়ে রয়েছে।

'বাড়িটাকে কেন্দ্র করে কোন রকম গল্প চালু নেই?'

'জানি না।'

'মাফ করবেন, কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি জানেন।'

'না হয় আছেই গুজব...কিন্তু তা বোধহয় আপনাকে শোনানো ঠিক হবে না।'

বলতে বলতে গলা কেঁপে উঠল মহিলার, মুহূর্তের জন্যে তার চোখ জোড়ায় চঞ্চল ভাব ফুটে উঠেই মিলিয়ে যেতে দেখল রয়েড। 'আমি শুনতে চাই,' আবেদনের ভঙ্গিতে সে বলল।

'পারব না, স্যর। মেজর স্কাটিং-এর কানে গেলে আমার চাকরি খাবেন উনি। কোম্পানিকে বোঝাবেন আমি লোকজনকে বাড়িটা না কেনার জন্যে বাগড়া দিচ্ছি।'

'আমাকে অন্তত বিরত রাখতে পারবে না...শুনেছি এই হারবয়েজ লোকটা নাকি গুলি করেছিল তার...'

'আহ্!' হাতের কাপটা ঠক করে টেবিলের ওপর রাখল মিসেস পার্ক।

খানিকটা ছলকে পড়ল। 'আপনি স্যর তাহলে অনেক কিছু জেনেই এসেছেন এখানে?'

'সামান্যই। আপনি আমাকে ভেঙে বলুন। আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন, সম্ভাব্য ক্রেতা হিসেবে এতটুকু প্রভাবিত হব না।'

মিসেস পার্ক সশব্দে কপাল চাপড়াল। 'এ নিয়ে কথা বলতে মন সায় দিচ্ছে না, স্যর। গরিব মানুষ আমি, বুঝতেই পারছেন চাকরির দায়ে একাকী পড়ে আছি এই ভূতুড়ে বাড়িতে...' সহসা নিজেকে সংবরণ করল সে। বেফাঁস কিছু আগন্তুককে বলে বসতে যাচ্ছিল, যা কিনা নিজের কাছেও স্বীকার করতে রাজি নয় মহিলা।

রয়েড নরম সুরে বলল, 'থামলেন কেন? প্রায়ই নানারকম শব্দ শুনতে পান, তাই না? কী ধরনের শব্দ?'

'ওহ্, সবই আমার কল্পনা! কিংবা বাতাস হবে হয়তো। কখনও কখনও বাতাসও পদধ্বনি কিংবা কণ্ঠস্বরের জন্ম দেয়। আবার যেন শুনি...দরজার পাল্লা দড়াম করে বাড়ি খেল দেয়ালের সাথে...বিকট শব্দে...যেন...'

অনেকখানি ঝুঁকে এল আগন্তুক। জ্বলজ্বল করে জ্বলছে চোখ জোড়া। এক অদ্ভুত উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে তার চোখ-মুখ।

'যেন বুলেটের শব্দ! ঠিক বলিনি?' হিসহিস করে উঠল সে।

'হয়তো তাই হবে। ওহ্, বিশ্বাস করতে মন চায় না...'

লোকটা ব্যস্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে লোকে যে বলে বাড়িটা ভূতুড়ে, ঠিকই বলে?'

'লোকে বলে...বলবেই বা না কেন? এরকম বাড়িতে কোন ট্রাজেডি ঘটলে নানা কথা তো রটবেই।'

'লোকে কি বলে না বলে অতশত বুঝতে চাই না, আমি জানতে চাইছি আপনি কি বলেন?'

অকস্মাৎ বদলে গেল কণ্ঠস্বর, উত্তেজনার ভাবটুকু ছাপিয়ে অদ্ভুত শক্ত শোনাচ্ছে এখন। আরও এক পর্দা চড়ল তার গলা, 'বাড়িটা কি ভুতুড়ে?'

প্রতিরোধের শেষ বর্মটুকুও গুঁড়িয়ে গেল, অসহায়, বিষন্ন কণ্ঠে জবাব দিল মিসেস পার্ক, 'ভুতুড়ে কি না জানি না, তবে প্রায়ই শুনতে পাই শব্দগুলো। নিজেকে প্রবোধ দিই-ও কিছু না। সবই মনের ভুল। কল্পনা।'

'কখনও দেখেননি কিছু?' গম্ভীর ভাবটা বজায় রেখে কণ্ঠস্বর খানিকটা

নিচু করে রয়েড জিজ্ঞেস করল।

'নান্-না-ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! রাতে ভুলেও লাইব্রেরিতে যাই না আমি।'

'লাইব্রেরি? সব রহস্য তাহলে ওখানেই? আমাকে খুলে বলুন।'

কাপটা তুলে নিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে আরও খানিকটা চা ঢালল মিসেস পার্ক। ছোট একটা চুমুক দিয়ে নিচু, উদাস সুরে বলতে লাগল সে, 'বিশ বছর আগের কথা। বাড়ির মালিক ছিলেন মি. জেরাল্ড হারবয়েজ। যুবা বয়স। ত্রিশের বেশি হবে না। অসম্ভব জনপ্রিয় ছিলেন ভদ্রলোক। কেউ কেউ তাঁকে খেপাটে বলে জানত। শিকার নিয়ে পড়ে থাকতেন, এলাকার সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী হিসেবেও সুনাম ছিল তাঁর। মি. হারবয়েজের আস্তাবলের আয়তন দেখলেও মাথা ঘুরে যাবে আপনার।

'হর্নফিল্ড ম্যানরের সুন্দরী তরুণী মিস প্রেসকে বিয়ে করেন তিনি। স্বামীর মত মহিলাও ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে ভালবাসতেন। প্রায়ই দুজনে একত্রে ঘোড়া দাবড়ে বেরিয়ে পড়তেন। আর প্রায়ই ব্রিঙ্কচার্চের মি. পিটার মার্শও তাঁদের সঙ্গ দিতেন। হারবয়েজ আর মার্শ ছিলেন বাল্যবন্ধু। ছেলেবেলায় ওঁদের প্রথম সাক্ষাৎপর্বটিও নাকি ঘটেছিল ঘোড়ার পিঠে চড়া অবস্থায়। পরবর্তীতে মার্শের সাথে মিসেস হারবয়েজের কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কিনা তা সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত না হলে এ সম্পর্কিত একটা গুজব বহুদিন পর্যন্ত চালু ছিল। আজ এঁরা দুজনেই মৃত। আসল সত্যটা কোনদিন জানা হবে না।

'সেদিন ছিল ক্রিসমাস। শিকারে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে আহত হলেন মি. হারবয়েজ। পা ভেঙে গিয়েছিল তাঁর। আরোগ্যকালীন সময়েই খেপাটে ভাবটা ধীরে ধীরে গ্রাস করতে থাকে তাঁকে। শিকার করা বন্ধ হয়ে যাওয়াতেই এমনটা হচ্ছিল কিনা-কে বলবে? তাঁর পায়ের জখম শুকাতেও অস্বাভাবিক সময় নিচ্ছিল। জানুয়ারির শেষের দিকে লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটাহাঁটি শুরু করলেন। এদিকে স্বামীকে ছেড়েই মিসেস হারবয়েজ ঘোড়া হাঁকিয়ে শিকারী কুকুরগুলোকে তাড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন। প্রতিবারই প্রতিবেশী মার্শের সাথে সাক্ষাৎ হত তাঁর। স্বামীর অসুস্থতার সুযোগে মিসেস হারবয়েজের সাথে ঘন ঘন দেখা হচ্ছিল মার্শের। মি. হারবয়েজের ঈর্ষা হত কিংবা তিনি সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন-এ ধরনের কোন তথ্য নিশ্চিত ভাবে কখনও জানা যায়নি।

'জানুয়ারির শেষ দিন। যথারীতি শিকারে বেরিয়েছেন মিসেস হারবয়েজ। আর তাঁর স্বামী গোটা দিন লাইব্রেরিতে ফায়ার প্লেসের পাশে গুম হয়ে বসেছিলেন। দুপুর পার হলে শখের রিভলভারটা পরিষ্কার করতে লেগে গেলেন। কাজ শেষ হলে ফায়ারপ্লেসের তাকের ওপর অস্ত্রটা রাখলেন তিনি, যেন প্রয়োজনে হাত বাড়ালেই নাগাল পান। মিসেস হারবয়েজ সন্ধ্যা পার করে বাড়িতে ফিরলেন। সাথে পিটার মার্শও ছিলেন। তাঁকে চায়ের আমন্ত্রণ জানালেন মহিলা। বাবুর্চি চা নাস্তার ব্যবস্থা করছে, এই ফাঁকে তিনি পিটার মার্শকে এক ঢোক হুইস্কি পান করার জন্যে লাইব্রেরিতে পাঠালেন। তাঁকে আরও অনুরোধ করলেন সারা দিনের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প মি. হারবয়েজকে বর্ণনা করে শোনানোর জন্যে। তাঁর লাইব্রেরিতে ঢোকার পর একটা মিনিটও পার হয়নি, ভেতর থেকে ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে এল। পরক্ষণেই শোনা গেল একটা গুলির শব্দ। দ্রুত রুমে ঢুকল বাটলার। পিটার মার্শ মেঝেতে মৃত পড়ে আছে। ফায়ারপ্লেসের পাশে চেয়ারে বসে আছেন মি. হারবয়েজ। বন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন পড়ে থাকা লাশটার দিকে। রিভলভারটা তখনও ধরা হাতের মুঠোয়।'

বিরতি দেয়ার জন্যে থামল মিসেস পার্ক। লক্ষ করল জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে বয়েডের। চিবুক ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না তার মুখ।

'মি. হারবয়েজ,' আবার আরম্ভ করল মহিলা। 'শুনানিতে নির্দোষ দাবি করলেন নিজেকে। উনি বলেন, ফায়ারিঙের সময় বোধ হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। পিটার মার্শের রুমে প্রবেশ করার পর থেকে গুলির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ঠিক কী ঘটেছিল তা তিনি স্মরণ করতে পারছেন না। তাঁর উকিল তাঁকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানোর জন্যে আর্জি জানান, কিন্তু জুরিরা আমল দেয়নি। রায়ে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। পরে মার্সিপিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়।'

থামল মিসেস পার্ক। চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে তাকে। কুঁচকে এক হয়ে গেছে ভুরু জোড়া। 'বিশ বছর পার হয়ে গেছে, শুনেছি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদও নাকি তাই,' বলল সে। 'অ্যাদ্দিনে হয়তো মুক্ত হয়েছেন তিনি। কিংবা শিগগিরই হবেন হয়তো-আদৌ যদি বেঁচে থাকেন আর কী।'

রয়েড ধীরে ধীরে মাথা তুলল। তার চোখের রং লাল দেখাচ্ছে।

জবাবদিহির ভঙ্গিতে জানতে চাইল, 'আপনি নিজে বিশ্বাস করেন কাজটা হারবয়েজেরই?'

'অবশ্যই! কেন নয়? অন্য আর কীভাবে বা ঘটতে পারত হত্যাকাণ্ডটা? ঘটনার সময় ওঁরা দু'জনেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আর কারও পক্ষে তো গুলি করার সম্ভাবনা ছিল না।'

রয়েড ঝট করে উঠে দাঁড়াল। ঘামে লেপ্টে গেছে মুখ, চোখ জোড়া তার লাল দেখাচ্ছে। 'ঈশ্বরের দিব্যি!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আমি বিশ্বাস করি না কাজটা হারবয়েজের। ওঁকে চিনতাম আমি...'

অস্ফুট শব্দ বের হলো মিসেস পার্কের মুখ থেকে, চোখে বিমূঢ় দৃষ্টি।

'ওর শৈশব, কৈশোর, যৌবনের সমস্ত ঘটনাই আমার মুখস্থ। একই স্কুলে পড়তাম আমরা। এই আপনাকে বলছি, খুন করার মত যোগ্যতা তাঁর ছিল না। তাঁকে খেপাটে ভাবত কেউ কেউ–আরও একটা নির্জলা মিথ্যা! তবে পাগলাটে কিংবা খেপাটে যাই বলুক না কেন, কাজটা সে করেনি। স্ত্রীকে ভালবাসত ও-পছন্দ করত বেচারা পিটার মার্শকেও। মার্শও ওঁদেরকে সৃষ্টির সেরা দম্পতি বলে স্বীকার করেছিল। আমি বলতে চাই...'

গলাটা বুজে এল তার, নিজেকে সামলে নিয়ে আবার শুরু করল, 'আপনাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি আমি। আসলে আমি তা চাইনি। বিশ্বাস করুন, গত বিশটা বছর ধরে জেলখানার ছোট্ট কুঠুরিতে পায়চারি করে কাটিয়েছে হারবয়েজ। মনে করতে চেষ্টা করেছে সত্যিই কি ঘটেছিল ওই ভয়ঙ্কর রাতে। তাঁর মানসিক অবস্থার কথা ভাবুন। আজও সে জানে না আদৌ খুনটা সে-ই করেছিল নাকি করেনি?'

সাদা, রক্তশূন্য হয়ে পড়েছে মিসেস পার্কের মুখ। নড়ছে ঠোঁটজোড়া, থর থর করে কেঁপে উঠল তার সর্বাঙ্গ।

'কেন এসেছেন আপনি?' চিৎকার করে জানতে চাইল সে। কণ্ঠে ভীতি আর অনুযোগ। 'পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি বাড়িটা আপনি চান না! কেনার কোন রকম ইচ্ছেও বোধহয় আপনার নেই...'

'না,' বলল রয়েড। 'আমি মাটি খুঁড়তে এসেছি।'

'কী?'

'শুনেছি অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটে লাইব্রেরিতে। অনেক গল্পই কানে এসেছে আমার। আপনিও তো স্বীকার করেছেন-পায়ের আওয়াজ, গুলির

শব্দ শুনতে পান। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন বিশ বছর আগে ওই ঘরটাতে সত্যিই কী ঘটেছিল। আমি কী বলতে চাই বুঝেছেন? সমস্ত রহস্য লুকিয়ে আছে ওখানে। আর সেটা জানার একমাত্র উপায় হলো...উপায় হলো...'

অকস্মাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল মিসেস পার্ক, দরজা আর লোকটার মাঝখানে প্রাচীর হয়ে রয়েছে তার শীর্ণ শরীরটা। তীক্ষ্ণ সুরে বলে উঠল সে, 'অসম্ভব! আপনাকে আমি লাইব্রেরিতে যেতে দিতে পারি না...'

'যেতে আমাকে হবেই। আজকের রাতটা ওঘরেই কাটাব, অপেক্ষা করব যতক্ষণ না...'

'আমি আপনাকে যেতে দেব না,' মহিলা অটল তার বক্তব্যে।

'অবশ্যই দেবেন। কেন বুঝতে পারছেন না একজন অজ্ঞ মানুষের জীবন মরণ প্রশ্ন এটা।'

মহিলার পিঠ ঠেকল দরজায়।

'এটা স্রেফ পাগলামি! ভুলেও কেউ রাতের বেলা ওঘরে ঢোকে না।'

'কিন্তু আমি ঢুকব।'

'ঘটনা জানাজানি হলে আমার চাকরি যাবে।'

'জানাজানি হবে না। আর, ঈশ্বর না করুক, সেরকম কিছু ঘটলে আমি আপনাকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেব। আপনার কাছ থেকে সুবিধা পাব ভেবে প্রস্তুত হয়েই এসেছি আমি।' ব্রেস্ট পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করল রয়েড, রাখল টেবিলের ওপর। 'কত দরকার আপনার? পাঁচ পাউণ্ড? দশ, পনেরো?'

মিসেস পার্ক বোবা দৃষ্টিতে তাকাল সেদিকে। টাকাগুলোর মূল্য সে বোঝে। আরও বোঝে, এই বিশাল বাড়িতে এই মুহূর্তে এমন একজনের মুখোমুখি সে হয়েছে যে কিনা বিনা নোটিশে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

'দেখুন,' রয়েড আবার বলল। 'সবই পাঁচ পাউণ্ডের নোট। এখন লক্ষ্মী মেয়ের মত আমার কথা শুনুন। লাইব্রেরিতে যাচ্ছি আমি। আসবাবপত্র কী আছে সেখানে?'

'কিস্যু নেই,' মহিলা বিড় বিড় করে বলল, টাকাগুলোর ওপর থেকে এখনও নড়ছে না দৃষ্টি।

'তাহলে, যদি অনুমতি দেন তো, চেয়ারটা সাথে নিই আমি।'

টাকাগুলো তুলল সে, পাঁচটা নোট আলাদা করে বাকিগুলো পুনরায়

পকেটে পুরে রাখল। নোটগুলো জোর করে গুঁজে দিল মহিলার হাতে।

'আমি ভুল করছি,' অস্ফুট সুরে বলল মিসেস পার্ক।

'আপনি ঠিকই করছেন। আজ রাতেই সত্য উদঘাটিত হবে। প্রয়োজনে শয়তানের সাহায্য লাগলে তাও চাইব আমি। আপনি বরং লাইব্রেরিতে আগুনের ব্যবস্থা করুন।'

আর কথা বাড়াল না মহিলা, ঘুরে এগুলো কাবার্ডের দিকে। সবচেয়ে নীচের তাক থেকে এক বাণ্ডিল ফায়ারউড বের করল সে। আধাআধি কয়লায় ভরা একটা ধাতব পাত্রে কাঠগুলো বিছাল। সবশেষে, এক হাতে ধাতব পাত্র আর অন্য হাতে সদ্য জ্বালানো মোমবাতি নিয়ে রয়েডকে ইশারা করল তার পিছু নেয়ার জন্যে। চেয়ারটা তুলে নিয়ে রয়েডও অনুসরণ করে চলল মিসেস পার্ককে।

চারদিকে সুনসান নীরবতা। কিচেন আর প্যাসেজ পার হয়ে হলরুমে এল ওরা। কার্পেটবিহীন মেঝের ওপর তাদের পায়ের শব্দ শক্ত দেয়ালে গম্ভীর পদধ্বনি তুলছে।

লাইব্রেরির কাছাকাছি হতেই গতি বেড়ে গেল রয়েডের, আচ্ছন্ন প্রায় মিসেস পার্ককে ছাড়িয়ে সামনে চলে এল সে। সোজা দাঁড়াল লাইব্রেরির সামনে। নিজ হাতে ঠেলে খুলল বন্ধ দরজা। বিশাল আয়তন লাইব্রেরি ঘরটা আবছা ভাবে ফুটে উঠল মোমের আলোয়।

দরজা বরাবর উল্টোদিকের দেয়ালে দুটো জানালা, আর একটা প্রশস্ত জানালা রয়েছে ফায়ারপ্লেস বরাবর। পাল্লাগুলো সব বন্ধ। দেয়াল জুড়ে ওক কাঠের প্যানেল, মেহগনির রঙে রাঙানো। যদিও আবছা আলোতে কালো দেখাচ্ছে এখন। অদ্ভুত এক অনুভূতিতে ছেয়ে গেল রয়েডের হৃদয়। যেন কারও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নিতে ওরা হাজির হয়েছে এখানে।

দরজা আর দরজা বরাবর জানালাগুলোর ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এসে দাঁড়াল রয়েড। মিসেস পার্ক পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল ফায়ারপ্লেসের পাশে। তার চোখ জোড়া আধবোজা। এদিকে রয়েডের চঞ্চল দৃষ্টি ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী যেন খুঁজছে সে, অবশেষে পেয়েও গেল।

'এদিককার প্যানেলের গায়ে একটা ছোট গর্ত দেখা যাচ্ছে,' ঘোষণা করল সে। যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ল মহিলার বুকে।

'হ্যাঁ,' কোনমতে বলতে পারল মিসেস পার্ক। 'ওটা-ওটা বোধহয়

বুলেটের গর্ত। সম্ভবত সে রাতে...'

'বুঝেছি,' শান্ত সুরে রয়েড বাধা দিল। এগিয়ে ফায়ার প্লেসের এক কোণে হাতের চেয়ারটা রেখে বসল সে-এমনভাবে, যাতে দরজা আর ক্ষতিগ্রস্ত প্যানেল দুই-ই ঠিক তার চোখ বরাবর থাকে।

'এবং সেদিন সন্ধ্যায়, বিশ বছর আগে, এভাবেই বসেছিলাম আমি...!'

মিসেস পার্কের এক হাতে মোমবাতি ঠিকই ধরা রইল, অপর হাত থেকে খসে পড়ল ধাতব পাত্রটা। বদ্ধ ঘরে বজ্রপাত হলো যেন। পরক্ষণেই আতঙ্ক, বিস্ময় আর অবিশ্বাস-সবই একত্রে ধ্বনিত হলো মিসেস পার্কের তীক্ষ্ণ আর্তনাদের মধ্য দিয়ে। 'আপনি বসেছিলেন! আপনি! জেরাল্ড হারবয়েজ? খুনী হারবয়েজ!

শান্ত সুরে জবাব এল, 'জেরাল্ড হারবয়েজ কিংবা স্টেফান রয়েড-এতদিন পরে আজ তাতে কী বা এসে যায়? একমাত্র ঈশ্বরই জানেন আদৌ খুনটা সেই করেছিল কিনা। তবে আজ আমি তা জানব। আজ রাতেই জানব। এখন কাঠগুলোতে আগুন ধরিয়ে বিদায় হও তুমি। একা থাকতে দাও আমাকে।'

কোনমতে নির্দেশ পালন করে মিসেস পার্ক এক ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, শরীরের সমস্ত সত্তা তার নিরাপদ পার্লারে ফিরে যেতে চাইছে-মাঝপথে ব্রেক কষল সে। শেষ পর্যন্ত ভয়ের চেয়ে কৌতূহলের জয় হওয়াতে ফিরতি পথ ধরল মিসেস পার্ক, সন্তর্পণে এসে দাঁড়াল ভেজানো দরজাটার পাশে। উত্তেজনায় কাঁপছে সে। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে কিছু একটা শোনার...

স্থির ঋজু, ভঙ্গিতে বসে আছে হারবয়েজ। ফায়ারপ্লেসের আগুন পুরোপুরি জ্বলে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে, এরপর কোটের পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করল। ফায়ার প্লেসের তাকের ওপর এমনভাবে রাখল যেন হাতের নাগালের ভেতরেই থাকে অস্ত্রটা। সবশেষে স্থির দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল সোজা নাক বরাবর।

সময় গড়াতে লাগল। হারবয়েজ নিজেও জানে না কীসের অপেক্ষায় আছে সে। কোনরকম জানান না দিয়েই হঠাৎ ভরাট, শান্ত এবং স্পষ্ট সুরে কথা বলে উঠল ও। সেই আকস্মিক কণ্ঠস্বর কানে যেতেই দরজার ওপারে

রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়ানো মহিলা আঁতকে উঠে একহাতে নিজের মুখ চেপে ধরল।

'পিটার, পিটার!' কণ্ঠস্বরটা যেন কাউকে প্রলুব্ধ করতে চাইছে। 'আমার ডাক শুনতে পাচ্ছ? সেই সন্ধ্যায় যেভাবে বসেছিলাম, আজও ঠিক একই ভঙ্গিতে-খোঁড়া পা নিয়ে-সেই একই জায়গায় বসে রয়েছি আছি। আমি আর আমার রিভলভার...পিটার, তুমি কী দেখা দেবে না? লোকে বলে তোমার অশান্ত আত্মা নাকি এখানেই আছে...আজও চিরবিশ্রাম পায়নি, কারণ তোমার প্রিয় বন্ধুই নাকি তোমাকে গুলি করেছিল! সত্যিই কি আমি গুলিটা করেছিলাম? ওহ্, ফাঁকা-পুরো ফাঁকা হয়ে আছে মনটা। গত বিশটা বছর ধরে মনে করার চেষ্টা করছি...বিশ বছর...দিনে রাতে মুহূর্তের জন্যেও বুঝতে পারিনি সুখ কী জিনিস? ওহ্, এসো পিটার, আমাকে বলো! আমি সত্য জানতে চাই। কোথাও নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়েছিল...পিটার, আমি ওরকম করতে পারি না। কীভাবে আমি বন্ধুর বুকে গুলি করি, বলো?'

থামল হারবয়েজ। সে থামতেই জমাট নিস্তব্ধতা থেমে এল ঘরে। তার দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যেও দরজার ওপর থেকে নড়েনি। নীরবে দীর্ঘ সময় পার করে দিয়ে ভাঙা, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আবার কথা শুরু করল সে।

'আমাকে ঘৃণা কর, তাই দেখা দিতে চাইছ না, পিটার? আমি কি পাগল ছিলাম? আমি-ই কি খুনী? আমাকে ঘৃণা কোরো না, পিটার। অনেক ভুগেছি আমি। যেকোন উপায়েই হোক, আমি এই বিভীষিকা থেকে মুক্তি চাই। আজ রাতেই চাই...ওহ্ ঈশ্বর! পিটার যেন সদয় হয় আমার ওপর। পিটার, আমরা তো বন্ধু ছিলাম। অনেক দিনের বন্ধুত্ব...স্কুল থেকেই...তোমার মনে নেই? গ্রীষ্মের রাতে লাইমগাছের নিচে আড্ডা...একসাথে ঘোড়া দাবড়িয়ে শিকার করা...'

শিশুসুলভ অসংলগ্ন, ছাড়া ছাড়া কথা...তার মানসপটে ভেসে উঠছিল অতীতের রঙিন, সুখদ স্মৃতিগুলো। ঠাণ্ডা, শিশির ভেজা সকাল, ওরা এগারো জন তরুণ ক্রিকেটার মাঠে ফিল্ডিং প্র্যাকটিস করছে; গুমোট ক্লাসরুমে সুশৃঙ্খল আর সারিবদ্ধভাবে ছাত্ররা বসে আছে, দাঁত দিয়ে পেন্সিল কামড়াচ্ছে কেউ কেউ; উজ্জ্বল সোনালী দিন সবুজ চত্বরে জমে উঠেছে রাগবি খেলা, টাচলাইন বরাবর দর্শকের ভীড়...খণ্ড খণ্ড প্রতিটি দৃশ্যেই দূরে বিলীয়মান বিষন্ন পিটার মার্শকে আবছাভাবে দেখতে পেল সে।

'পিটার!' আকুল আর্তনাদে ভেঙে পড়ল ও। 'শুনতে পাও না? আমার

কাছে আসবে না? তুমি তো ফিরবেই। সবাই তাই বলে। ওই কেয়ারটেকার মহিলাও টের পায়...মনে আছে সেদিন সন্ধ্যায় তুমি এসেছিলে...স্কারলেট রঙের কোটটা পরে...মনে পড়ছে মুরিয়েলের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি...ঠিক এখানে, এভাবে বসে...শুনলাম তোমরা দুজনে ফিরলে... সহিসের সাথে কি যেন কথা হলো তোমাদের...হাসছিল মুরিয়েল...হলরুমে এলে তোমরা, মুরিয়েল চায়ের অর্ডার দিয়ে দোতলায় চলে গেল। আর আমি ভাবছিলাম, "ও আমাকে দেখতে এল না...আমি আর এখন ওর কেউ না...অকেজো, অথর্ব...এখন পিটার-ই সব! ওহ্ ঈশ্বর! তবে পঙ্গুত্বের পাশাপাশি আমি কি অন্ধ-ও হয়ে গেছি? ওদের আচরণের যতটুকু দেখতে পাই সবই যেন ভান...আর যা দেখতে পাই না, কেবল অনুভব করতে পারছি..." মুহূর্তে মাথার ভেতরে আগুন ধরে গেল। "জাহান্নামে যাও!" আমি বললাম। "একজন পঙ্গু, অসহায় মানুষকে অসতী স্ত্রীর স্বামীত্বে পরিণত করার শাস্তি যে তোমাকে পেতেই হবে..." তার পরপরই...তুমি ভেতরে এলে।'

শরীরের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই মিসেস পার্কের। হিস্টিরিয়া রোগীর মত থর থর করে কাঁপছে সে। ভেতর থেকে ভয়াবহ কর্কশ চিৎকার ভেসে এল।

'পিটার! পিটার! ওহ্, ঈশ্বর! আমার মনে পড়ছে! তুমি দাঁড়িয়েছিলে, ঠিক এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, একহাতে দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে...ঠিক আছে! এরপর তুমি বললে—মনে পড়ছে—"একটা পেগ্ দাও তো, জেরি। একেবারে জমে গেছি, পুবের বাতাস যা কনকনে ঠাণ্ডা।" পিটার! পিটার! ওভাবে তাকিয়ো না! আমার মনে পড়ছে...মনে পড়ছে...ওহ্ ঈশ্বর! দয়া করো...দয়া করো...'

তীব্র, গা শিউরানো বীভৎস চিৎকার প্রতিধ্বনি তুলল দেয়ালে। চেয়ার উল্টে পড়ার শব্দ শুনতে পেল মিসেস পার্ক। কানে তালা লেগে গেল ভেসে আসা উন্মত্ত আর্তনাদে।

'আমার মনে পড়ছে...মনে পড়ছে...জাহান্নামে যাও! যখন তুমি ওভাবে ঘুরে দাঁড়ালে, আমাকে পিঠ দেখিয়ে...ঠিক ওভাবে...'

গুলির শব্দ হলো। পরপর দুবার। অকস্মাৎ নেমে এল ভুতুড়ে নীরবতা।

প্রায় মূর্ছা যাবার মত অবস্থা মিসেস পার্কের...খসে পড়ে নিভে গেছে

মোমবাতি...দুহাতে একটা থাম আঁকড়ে ধরে পতন ঠেকিয়ে রেখেছে সে।

আধঘণ্টা পর। নিজের সাথে অনেক যুদ্ধ করে অবশেষে লাইব্রেরিতে ঢুকল মিসেস পার্ক। আগুনের শিখা তখনও মাথা তুলে হেলে দুলে নাচছে...গর্বিত ভঙ্গিতে। মহিলা ভয়ে ভয়ে তাকাল।

বিদঘুটে, তোবড়ানো ভঙ্গিতে ফায়ার প্লেসের পাশে উপুড় হয়ে পড়ে আছে হারবয়েজ। মাথা ঘিরে বৃত্ত তৈরি করেছে রক্তের পুরু স্তর। উপুড় হয়ে থাকায় প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে কপালের একপাশের কুৎসিত ক্ষতটা। হাতের মুঠোয় তখনও ধরে রেখেছে রিভলভারটা। শেষ পর্যন্ত কতটুকু জেনে যেতে পারল সে?

প্যানেলের গায়ে যেখানে বুলেটের একটা গর্ত ছিল, পরদিন পুলিশ এসে সেখানে দুটো আবিষ্কার করল। দুটো গর্তই পাশাপাশি-মাঝখানে মাত্র এক ইঞ্চি ফারাক।

(A.M. BURRAGE-এর NOBODY'S HOUSE গল্পের ছায়া অনুসরণে)

রূপান্তরঃ মাহবুবুর রহমান শিশির

কীভাবে সবাই তাকিয়েছিলাম আমরা চোখ বড় বড় করে, কেমন ভয়ে আঁতকে উঠেছিলাম সবাই, একের পর এক দিয়ে যাচ্ছিলাম নিজ নিজ মতামত, সেই সকালে যখন গুস্তাভ হারবুকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখা গেল তার বেডরুমের কড়িকাঠ থেকে! পুরো ফবুর্গ, এমনকী থুত্থুড়ে যে বুড়োরা বছরের পর বছর রাস্তায় পা রাখেনি, তারা পর্যন্ত বেরিয়ে এসে হাঁ করে তাকিয়ে রইল বাড়িটার দিকে আর মাঝেসাঝে চালাতে লাগল সশব্দ অনুমান। এত মানুষ থাকতে গুস্তাভ হারবু কেন গলায় দড়ি দেবে? মাত্র গত সপ্তাহে উত্তরাধিকারসূত্রে সে পেয়েছে তার খালা মাদাম জানের সমস্ত টাকা, বাড়ি আর পাঁচজন সহকারীসহ দোকান, এককথায় তার দিকে চেয়ে হেসে উঠেছিল জীবন। না; আত্মহত্যা করাটা গুস্তাভের মোটেই বুদ্ধিমানের মত কাজ হয়নি!

তা ছাড়া, তার খালা যখন মারা যায়, গুস্তাভ তখন টাকার অভাবে হাঁসফাঁস করছিল। সে অবশ্য ব্যাঙ্ক থেকে মাইনে পায়; কিন্তু সামান্য ওই টাকায় কী হয় যখন ছুটি হওয়ামাত্র কেরানির অভ্যেস পেছনে ফেলে, দামি পোশাক পরে গুস্তাভ প্রবেশ করে অভিজাত আর ফুর্তির জীবনে; যখন সে তার চামচা বন্ধুদের বলে এক রুশ যুবরাজের অস্পষ্ট কিন্তু পরিতৃপ্তিকর গল্প যে কিনা ছিল তার চাচা, আর বলে দারুণ সম্পদশালী এক ইংরেজ মহিলার কথা যার মৃত্যুর দিন গুনছে সে বিরাট আশা নিয়ে। হায়! কেরানির মাইনে নিয়ে কারও পক্ষে প্যারিসে দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব নয়। আপন খ্যাতি আর স্বর্গীয় নাচ জানা হলুদ-চুলো একটি মেয়েকে ধরে রাখতেই তার খরচ হয়ে গেল মাইনের চেয়ে বেশি। ফলে বাধ্য হয়ে তাকে নির্ভর করতে হলো তার খালা মাদাম জানের মাঝেসাঝে দেওয়া উপহারের উপর, এবং তার বিনিময়ে করতে হলো খালার চূড়ান্ত যত্নবান আর মহাবিরক্তিকর এক দেখাশোনা। কখনও কখনও কাফে আর থিয়েটারের জগৎ যখন তাকে আকুল করে তুলত, তখন হয়তো দোকানের পেছনের বাড়িটাতে বসে তার

সঙ্গে সেকেলে নৈশভোজ খেতে খেতে খালা জানতে চাইত শেষ কবে সে কনফেশন করেছে, কিংবা শোনাত তার মৃত বাবা-মার দীর্ঘ নিরানন্দ গল্প। কাঁটায় কাঁটায় নয়টায়, মাদাম জানের বাড়ির অন্য একমাত্র বাসিন্দা, বধির ভৃত্যটা ভেতরে নিয়ে আসত ডোমিনো খেলার জন্যে উপস্থিত মোটা বুড়ো যাজককে। তারপর শুরু হত ডোমিনো আর সেইসঙ্গে গুস্তাভের সুপরিচিত বুড়োর বকবকানি: আজ সে কী করল না করল, এবং পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুই তুচ্ছ আর অসার, এবং সুখ আছে একমাত্র স্বর্গরাজ্যে; আধুনিক একজন মানুষের স্বাভাবিক অবজ্ঞা নিয়ে গুস্তাভ তখন লক্ষ করত যে স্বর্গসুখের কথা বলতে বলতে বুড়ো ভীষণ দুশ্চিন্তায় ভুগছে নিজের সাধারণ সর্দি-কাশি নিয়ে। যাই হোক, মুখে কপট এক টুকরো হাসি ঝুলিয়ে বসে বসে রাগে ফুলত গুস্তাভ, যতক্ষণ না বাজত রাত এগারোটা। তখন উঠত মাদাম জান, আর বোনপোর ওপর সন্তুষ্ট হলে, রাইটিং-ডেস্কের কাছে গিয়ে, যাজকের দৃষ্টি এড়ানোর ভঙ্গি করে তাকে দিত হয়তো পঞ্চাশ বা একশো ফ্রাঁ। সঙ্গে সঙ্গে আবেগময় এক দেখনশুভরাত্রি জানিয়ে গুস্তাভ বেরিয়ে পড়ত যাজকের পিছু পিছু। বুড়োকে ভাগাতে পারা মাত্র গুস্তাভ ছুটত তার প্রিয় কাফেতে, কিন্তু অপেক্ষা করতে করতে সবাই সেই কখন চলে গেছে নিজ নিজ কাজে! টাকা অবশ্য এক ধরনের সান্ত্বনা; কিন্তু এমন রাতও আসে যখন সে একটা পাঁচ পয়সার মুদ্রাও পায় না। আহা! মানুষ কতই না আমোদ-প্রমোদ করছে প্যারিসে, কিন্তু তার মত করে নয়–একে আমোদ-প্রমোদ বলা চলে না।

কেবল কেরানির মাইনে আর কালেভদ্রে পঞ্চাশ বা একশো ফ্রাঁর উপহারের ওপর নির্ভর করে একজন মানুষ যথাযথ জীবন যাপন করতে পারে না। এটা একে-তাকে বলা কোনও মজার বিষয় নয় যে তার চাচা পড়ে পড়ে মস্কোতে মরছে, বিশেষ করে যাদের বলা হচ্ছে তারা যদি আবার হয় পাওনাদার। এদিকে যথারীতি ফুল আর বনবন পায়নি বলে অতি সুন্দর ভঙ্গিতে রাগ দেখিয়েছে হলুদ-চুলো সেই সুন্দরী। এসব বিষণ্ন ঘটনা ঘটে চলায় গুস্তাভ গেল শ্যানটিলিতে রেস খেলতে। প্রথম সপ্তাহে সে অনেক জিতল যেমনটা কখনও কখনও অনভিজ্ঞ লোকের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, সেই সপ্তাহে সুন্দরীও খুশিতে বাগবাগ হলো ফুলের তোড়া আর বাক্স ভর্তি বনবন পেয়ে। কিন্তু পরবর্তী সপ্তাহে গুস্তাভ অনেক হারল যেমনটা প্রায়ই অনভিজ্ঞ

লোকের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, এবং সেই সপ্তাহে সে হতাশায় পুড়ল যখন তার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে হাসতে হাসতে সুন্দরী চলে গেল সম্ভবত এক জার্মান লোকের হাত ধরে।

ঘটনাটা ঘটার পর সন্ধেয় প্লেস দ্য লা মাদেলেনে দাঁড়িয়ে, আঙুলে ফুঁ দিতে দিতে সে যখন পরবর্তী পদক্ষেপের পরিকল্পনা আঁটছে, পরিচিত একটা স্বর ডাকল তার নাম ধরে আর ঘুরতেই দেখতে পেল খালার পরামর্শদাতা সেই যাজককে।

'গুস্তাভ, বন্ধু আমার, এখানে এসেছিলাম এক সহকর্মীর সঙ্গে দেখা করতে!' চেঁচাল বুড়ো, বড় গির্জাটার দিকে হাত তুলে। 'তুমি কি তোমার খালার কাছে যাচ্ছ আজ রাতে?' বাঁকা চোখে তাকাল বুড়ো তার পরিপাটি পোশাকের দিকে।

যাজক তাকে এরকম পোশাকে আবিষ্কার করায় মনে মনে রেগে গেল গুস্তাভ, কারণ, মাদাম জানের বাড়িতে যায় সে রাশভারী কালো পোশাক পরে; কিন্তু জবাব দিল সে যথেষ্ট নরম স্বরে:

'না, ফাদার, আজ রাতে যেতে পারব না। অফিসের কিছু কাজ বাকি আছে, সেগুলো সারার জন্যে বাড়িতেই থাকতে হবে।'

'বেশ, বেশ!' বলল যাজক, চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, 'যুবকেরা চিরকাল যুবকই থাকবে মনে হয়। আমি নয়টা পর্যন্ত তার সঙ্গে থাকতে পারব, অসুস্থ এক প্যারিশনারকে দেখতে যেতেই হবে। তোমাকে একটা উপদেশ দিই, বন্ধু,' বলে চলল সে, গুস্তাভের কোটের একটা বোতাম চেপে ধরে: 'তোমার খালাকে অবহেলা কোরো না; কারণ, মনে রেখো, একদিন মাদাম জানের সবকিছু তোমারই হবে!' যেটার অপেক্ষায় সে ছিল সেই অমনিবাস এসে পড়ায়, একটা কথাও আর না বাড়িয়ে যাজক সেটায় উঠে পড়ল ঝটপট।

ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে গুস্তাভ ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল বুলভারদেস কাপুচিনি ধরে। হ্যাঁ; এটা নিশ্চিত যে ওই বাড়ি, পাঁচজন সহকারী সহ দোকান একদিন তারই হবে; খালার সব কথাই যাজক জানে। কিন্তু ওগুলো তার হবে কত দিনে? মাদাম জানের বয়েস এখন বড়জোর ষাট; তার মা বেঁচেছিল নব্বই বছর; মাদামের বয়েস নব্বই হতে হতে সে নিজে হবে–ইতিমধ্যে কী করবে পাওনাদারের দল; কী হবে (সর্বোপরি) সেই

হলুদ-চুলো মেয়েটির? থেমে এত জোরে পা ঠুকল সে পেভমেণ্টে, একে অপরকে গুঁতো মেরে হেসে উঠল দুজন পথচারী। তারপর সে কয়েকটা কেনাকাটা সেরে সময় নষ্ট করতে লাগল নয়টা বাজার অপেক্ষায়।

নয়টায় যখন রওনা দিল তখন গুস্তাভ পরিষ্কার জানে যে সে কী করতে চলেছে, তবু যাজক তার দামি পোশাকের কথা খালাকে বলে দিয়েছে ভেবে কেমন যেন অস্বস্তি লাগল তার। কিন্তু নির্জন ফবুর্গের ভেতর দিয়ে সে যখন গিয়ে উপস্থিত হলো দোকানের পেছনের বাড়িটায়, তাকে দেখে খুব খুশি হলো খালা, আর সামান্য অবাক। সুতরাং বসে বসে শুনল সে তার শান্ত, পারিবারিক গল্প, আর শোনাল তার জীবনাচরণের মিথ্যে কথা, যতক্ষণ না বাজল রাত এগারোটা। তারপর সে উঠল, মাদাম জানও উঠে রাইটিং-ডেস্কের কাছে গিয়ে খুলল ছোট্ট একটা ড্রয়ার।

'একাকী একজন বুড়ির প্রতি খুব দয়া দেখালে তুমি আজ রাতে,' বলে হাসল মাদাম জান।

'তোমার কথা শুনে কী যে ভাল লাগল, প্রিয়তমা খালা!' বলল গুস্তাভ। কাছে গিয়ে আদর করার ভঙ্গিতে সে একটা হাত রাখল খালার কাঁধের ওপর, আর পরমুহূর্তেই ছুরি চালাল হৃৎপিণ্ড বরাবর।

হত্যাকাণ্ডের পর ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে পুরো পাঁচ মিনিট। তারপর হ্যাটটা তুলে নিয়ে রওনা দিল দরজার দিকে। কিন্তু তখনই প্রথমবারের মত সে বুঝতে পারল তার অপরাধের গুরুত্ব, তাই ফিরে এল রুমে। মাদাম জানের বেডরুমে মোমবাতিটা ছিল টেবিলের ওপর, সেটা জ্বেলে এগোল সে একটা দরজা দিয়ে যেটা বাড়ি থেকে চলে গেছে দোকানে। উবু হয়ে বসল সে সাদা কাপড়ে ঢাকা কাউন্টারের পেছনে যেন আলোর একটা রেখাও জানালার ওপর খেলা করে কোনও পথচারীর দৃষ্টি না কাড়ে। দোকানের পাশের একটা প্রবেশপথ ব্যবহার করে, দরজার খিল আর তালা খুলে চাবিটা সে রেখে দিল পকেটে। তারপর উবু হয়েই রুমে ফিরে এসে, বিধ্বস্ত করল ছোট্ট ড্রয়ারটা। নোটগুলো সে ছড়িয়ে ফেলল মেঝেতে, কিন্তু মুদ্রার দুটো ছোট্ট থলে ঢুকিয়ে ফেলল কোটের ভেতরে। তারপর মোমবাতিটা তুলে নিয়ে খানিকটা মোম সে ঝরাল লাশের মুখ, হাত আর পোশাকের ওপর; কার্পেটের ওপরও ঝরাল সে মোম, তারপর মোমবাতিটা ভেঙে পিষে ফেলল পায়ের তলায়। কাঁপা কাঁপা হাতে মৃতা মহিলার বডিসও

ছিঁড়ে ফেলল সে, ফলে বেরিয়ে পড়ল তার স্তন; এবার মহিলার এক মুঠো চুল উপড়ে নিয়ে মেঝেতে ফেলতেই সেগুলো লেপটে গেল মোমের সঙ্গে। এসব সেরে কান পাতল সে বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে। রাত বারোটার দিকে ফবুর্গ সাধারণত একদম নীরব হয়ে যায়, তখন একটা পদশব্দও কানে অনেক জোরে এসে বাজে। কোনও শব্দ শুনতে পেল না সে, তাই ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে হালকা পায়ে দৌড়ে পৌঁছুল গিয়ে এক মোড়ে। সেখান থেকে সে হাঁটতে লাগল অলসভাবে, আর চলন্ত একটা ঘোড়ার গাড়ি থামিয়ে, যেতে বলল সেটাকে পঁত সেইন্টমিচেলে। নামল সে ব্রিজের ওপর, আর কেউ তাকে লক্ষ করছে না দেখে, দোকানের চাবিটা ছুঁড়ে ফেলল নদীতে। তারপর একটা আধামাতালের ভান করে গিয়ে ঢুকল কাফে দ্য হাঁকুরতে।

সাধারণত যেমন থাকে আজও তেমনই জায়গাটা ল্যাটিন কোয়ার্টারের নারী-পুরুষে ভরা। তাকাল গুস্তাভ চারপাশে, আর তরুণ এক ছাত্রকে উত্তেজিতভাবে মানুষের অধিকার সম্বন্ধে ভাষণ দিতে দেখে, বসে পড়ল তার পাশে। এখন যা কিছু করার তাকে করতে হবে শিগ্‌গির, সুতরাং ছাত্রটাকে সে দিয়ে বসল মিথ্যেভাষণের অভিযোগ। ছাত্রটা তৎক্ষণাৎ লড়াইয়ে না নেমে তর্ক জুড়ে দিল বলে, এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি তুলে নিয়ে গুস্তাভ ছুঁড়ে মারল তার মুখে। তারপর অবশ্যই শুরু হয়ে গেল হইচই, অবশেষে মিলিটারি পুলিশ এসে গুস্তাভকে ধরে নিয়ে গেল স্টেশনে। সেখানে নিজের অপকর্ম নিয়ে বিলাপ করতে লাগল সে করুণভাবে, বলল এই অপকর্মের জন্যে বাড়তি এক গ্লাস আবসাঁতই (Absinthe) দায়ী, আর কর্তৃপক্ষকে হাতে-পায়ে ধরল তার ভালমানুষ খালা, ফবুর্গের মাদাম জানকে তার এই দুর্দশার সংবাদ দিতে। সুতরাং গেল তারা দোকানের পেছনের সেই বাড়িতে, আর পেল তাকে–বসে আছে, ঝুলন্ত দুই স্তন, জীর্ণশীর্ণ মাথাটায় জমাট বেঁধে আছে রক্ত, হৃৎপিণ্ডে আমূল ঢোকানো এক ছুরি।

পরদিন সকালে গুস্তাভকে ছেড়ে দেয়া হলো। এক পুরুষ আর এক নারী, দোকানের পাঁচ সহকারীর মধ্যে এই দুজনের বিরুদ্ধে আনা হলো হত্যার অভিযোগ। ঘটনার আগের দিন মেয়েটিকে ভীষণ বকাবকি করেছিল মাদাম জান, আর লোকটা নাকি মেয়েটির প্রণয়ী। রাতে মূল প্রবেশপথ ছাড়া আর সব প্রবেশপথ বন্ধ করার দায়িত্ব এই লোকটার, মূল প্রবেশপথ বন্ধ করত মাদাম জান আর তার বধির ভৃত্য। পুলিশ একটা তত্ত্ব দাঁড়

করাল (বিস্ময়কর এই উদ্দীপনা আর দক্ষতা নিয়ে কাজ করার ফলেই প্যারিসের পুলিশ অহরহ তাদের অতিবুদ্ধির কাছে নিজেরাই পরাজিত হয়!) যে লোকটা পাশের দরজাগুলোর একটা বন্ধ করেনি, চাবিটা হস্তগত করেছে সূক্ষ্ম বুদ্ধি খাটিয়ে, তারপর দুষ্কর্মের সহযোগী মেয়েটিকে নিয়ে এখানে এসেছে মাঝরাতের দিকে। এই তত্ত্ব অনুসারে পুলিশ এই দুই হতভাগাকে ঘিরে বুনল এমন এক ইস্পাতের জাল যে গিলোটিনের নীচে মাথা পেতে দেয়া ছাড়া তাদের আর উপায় রইল না বললেই চলে, আর পুলিশের এই তত্ত্বকে পূর্ণ সমর্থন জানাল সাংবাদিক আর জনসাধারণ। অন্তত, এমনটাই ঘটেছে বলে মত দিয়েছে গুস্তাভ; আর এখন ফবুর্গে গুস্তাভের মতের অনেক মূল্য। অল্প কয়েকজন অবশ্য ফিসফাস করল যে বেচারি মাদাম জানের সৌভাগ্য বোনপোকে মাতাল অবস্থায় ঝগড়া করে গ্রেফতার হওয়াটা তাকে দেখতে হয়নি; কিন্তু বাড়ি আর দোকানটার মালিক কে হবে এটা মাথায় রেখে বেশিরভাগই যাজকের সুরে সুর মেলাল: সাহসী গুস্তাভ তার খালার সঙ্গে থাকলে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটা কোনওদিনই ঘটত না। আর, কে না দেখেছে তার সান্ত্বনাতীত শোক? অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন কফিনের ঢাকনার ওপর মাটি পড়ার শব্দ শুনে সে তো মূর্ছাই গেল, শেষমেশ তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হলো শোককারীদের মাঝ দিয়ে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর রাতে মাদাম জানের রুমে ফায়ারপ্লেসের সামনে একাকী বসে, ধূমপান করতে করতে পরিকল্পনা আঁটছিল গুস্তাভ। এসব বাজে নকল শোক আর ভদ্রতার ভান শেষ হয়ে গেলেই আবার যাবে সে কাফেতে, আবার হলুদ-চুলো সেই সুন্দরী তার দিকে সম্ভ্রমের চোখে তাকিয়ে ঝিকমিকিয়ে না হেসে পারবে না। এসব ভাবতে ভাবতেই ম্যান্টেলপিসের ওপরে রাখা ঘড়িটাতে এগারোটা বাজল, আর সেই মুহূর্তেই ঘটল অতি অদ্ভুত এক ঘটনা। হঠাৎ খুলে গেল দরজা, একটি মেয়ে ভেতরে ঢুকে, সোজা রাইটিং-ডেস্কের কাছে গিয়ে, খুলে ফেলল ছোট্ট ড্রয়ারটা, তারপর বসে বসে তার দিকে তাকিয়ে রইল অপলকে। মেয়েটি অপরূপ সুন্দর; যদিও তার আজব সিল্কের পোশাক আর চুল বাঁধার মধ্যে কেমন যেন একটা সেকেলে ভাব আছে। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গুস্তাভের একবারও মনে হলো না যে সে কোনও জীবিত মেয়ে দেখছে; সমস্ত দরজা এমনভাবে বন্ধ যে কারও পক্ষে ভেতরে ঢোকা সম্ভব

নয়, পাশাপাশি অনুপ্রবেশকারীর চেহারায় কোথায় [illegible]
মত একটা সাদৃশ্য আছে। সম্ভবত এক ঘণ্টা সে [illegible]
তারপর নীরবতা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতেই, চূড়ান্ত [illegible]
রুম থেকে ছুটে বেরিয়ে, ওপরতলায় গেল হ্যাট আনতে। সেখানে, [illegible]
নিহত খালার বেডরুমে, দেয়াল থেকে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে [illegible]
সেই চেহারার প্রতিমূর্তি–মাদাম জানের যৌবনকালের একটা পোর্ট্রেট।
রাস্তায় নেমে সোজা হাঁটা দিল সে, সম্ভবত মাইল দুই, তারপর আবার ভাবতে পারল। কিন্তু চিন্তাশক্তি ফিরতেই সে লক্ষ করল, ইচ্ছের বিরুদ্ধে কে যেন তাকে টেনে নিয়ে চলেছে বাড়িতে, দেখতে যে জিনিসটা এখনও সেখানে আছে কি না–ঠিক যেমন পুলিশ বিশ্বাস করে যে একজন হত্যাকারী মর্গে যায় তার শিকারের লাশটা একনজর দেখতে। হ্যাঁ; মেয়েটি এখনও সেখানে আছে, এবং সারাটা রাত নীরব গুস্তাভ খেপাটে চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে। ভোরে চোখের পাতায় নামল অস্বস্তিকর এক তন্দ্রা; চিৎকার দিয়ে তন্দ্রা ভেঙে জাগতেই মেয়েটিকে সে আর দেখতে পেল না।

পরদিন দুপুরে বেশ কয়েক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি গিলে আর সূর্যালোক গায়ে মেখে গুস্তাভ বিষয়টাকে হালকাভাবে উড়িয়ে দিতে চাইল। বাড়িটাতে কখনওই আর ফিরে না যাবার ব্যবস্থা সে খুশিমনেই করতে পারে, কিন্তু তাতে লোকজন নানারকম কথা বলবে, আর দোকানটার ব্যবসা নষ্ট করা তার পোষাবে না। সবচেয়ে বড় কথা; পুরো ব্যাপারটাই স্রেফ তার চোখের ভুল–ক্লান্ত স্নায়ুর কারসাজি। পেট পুরে খেয়ে, সে গেল একটা মিউজিকাল কমেডি দেখতে, আর বাড়ি ফিরতে ফিরতে পার করে দিল রাত দুটো। আজও কে যেন ছোট্ট ড্রয়ারটা খুলে ডেস্কের কাছে তার জন্যে বসে আছে অপেক্ষায়; গতরাতের মেয়েটি নয়, অপেক্ষাকৃত বেশি বয়েসী একজন, তবে চোখে একই ধরনের শান্ত দৃষ্টি। এমন মোহিনী শক্তি সেই দৃষ্টির যে যদিও লৌহদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সে তৎক্ষণাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল যে এখানে আর জীবনে ফিরবে না, কিছুক্ষণের মধ্যেই পানি হয়ে গেল তার সঙ্কল্পের লোহা, ফলে কখন যেন ফিরে এল সে আবার, গতরাতের মতই নীরবে সারাটা রাত গুস্তাভ কাটিয়ে দিল তার দিকে খেপাটে চোখে তাকিয়ে। তারপর সারাটা দিন কাঁপতে কাঁপতে কাটাল সে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে; অবশেষে সন্ধে পেরিয়ে বাজল একসময় রাত এগারোটা; আর তখন আবার এল তার খালা,

বয়েস আরেকটু বেড়েছে, শরীর হয়েছে অপেক্ষাকৃত জীর্ণ। এভাবে চলল পর পর পাঁচ দিন, প্রত্যেক রাতে এল তার খালা, প্রত্যেক রাতে খানিকটা করে বাড়ল তার বয়েস, প্রত্যেক রাতেই গুস্তাভ তাকিয়ে রইল খেপাটে চোখ মেলে। এই রাতগুলোতে কখনও কখনও সে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়, শপথ নিল ফিরবে না আর জীবনে, কিন্তু সবসময়ই তাকে টেনে নিয়ে এল মোহিনী সেই চোখজোড়া। তার এই রাতের পায়চারি লক্ষ করল পুলিশ, জনসাধারণ লক্ষ করল তার খেপাটে চাহনি; তারা বলল যে শোকে-দুঃখে এমন চেহারা হতে পারে না, এখন সে নিশ্চয় যাপন করছে বন্য এক জীবন।

সপ্তম রাতে এগারোটা বাজার পর খালার আসতে পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেল। তারপর যথারীতি খুলে গেল দরজা—আর তখন—হায় ঈশ্বর! রুমে এসে উপস্থিত হলো মহিলা, পরনে তার কবরের পোশাক, যেন তাকে বহন করে এনেছে অদৃশ্য একদল মানুষ; লাশটা শুয়ে পড়ল রাইটিং-ডেস্কের ওপরের শূন্যে, আপনাআপনি খুলে গেল ছোট্ট ড্রয়ারটা। হ্যাঁ; ওই তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শবাচ্ছাদন, বাদামি স্ক্যাপুলার, বাহুল্যবর্জিত সাদা ক্যাপ, হাতদুটো ভাঁজ হয়ে আছে বুকের ওপর। মহাআতঙ্কে অস্থির গুস্তাভ অজান্তেই সামনে এগোল চোখজোড়া দেখতে। দুটো চোখই বন্ধ করে রাখা আছে একটা করে পেনি চাপা দিয়ে। শিউরে উঠে পেছনে সরে এল সে, বমি করে দিল হড়হড় করে, তারপর অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে আর হোঁচট খেতে খেতে চলে গেল ওপরতলায়।

কিন্তু মাদাম জানের বেডরুম পেরোনোর সময় লাশটা এসে দাঁড়াল তার সামনে, দুটো চোখই বন্ধ করে রাখা পেনি চাপা দিয়ে। অবশেষে ঘামে গোসল করা শরীর, দাড়িতে মাখামাখি থুতু, আর ঝুলে পড়া জিভ নিয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে গুস্তাভ জানতে চাইল:

'তুমি কি বেঁচে আছ?'

'না, না!' আর্তনাদ করে উঠল জিনিসটা, পরক্ষণেই ভেঙে পড়ল বীভৎস কান্নায়; 'মারা গেছি আমি অনেক দিন আগেই।'

মূল: ভিনসেণ্ট ও' সুলিভান
রূপান্তর: খসরু চৌধুরী

অপ্রাকৃত

প্রকৃতির কোলজুড়ে খেলা করে চলেছে বিকালের শান্ত রোদ। চেম্বারে বসে রোগী দেখছেন ষাটোর্ধ্ব বয়সী ডা. ইউসুফ আলী। সে সময় হঠাৎ দরজা দিয়ে ঢুকল টুকটুকে লাল শাড়ি পরা এক কিশোরী, খিল-খিল শব্দে হাসতে হাসতে সে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই বুইড়া (বুড়া), মাঝে মাঝে আমার মাথার মধ্যে জানি কেমন লাগে! তুমি আমারে অষুধ দেও।' কিশোরীর কথা বলার ধরন দেখে চেম্বারে বসা ভিন গ্রামের দু'জন রোগী বেশ বিব্রত বোধ করলেও ডাক্তারকে দেখা গেল খুবই স্বাভাবিক। কারণ তিনি জানেন, এই কিশোরীটি মানসিকভাবে কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ; বয়সের সাথে তাল মিলিয়ে যার মানসিক বৃদ্ধি ঘটেনি। মুক্ত বিহঙ্গের মত যে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে, কথা বলে শীতলক্ষ্যার জলের সঙ্গে, মেঠো পথের সাদা ধুলো নিয়ত যার চরণ ছুঁয়ে যায়, সন্ধ্যার পথে চলতে গিয়ে বাঁশ ঝাড়ের মাথায় বসা বকের ঝাঁকের দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে যায় সে; বন্ধুত্ব করতে চায় সাদা বকেদের সাথে। নিঃস্বাধীন কথার বালা তার মুখের সাথী; চলায় মিশে আছে প্লাবনের ধাবমান স্রোত, হাসির দমকে ক্ষণে-ক্ষণে তার শরীর দোলে। আর নামটিও তার সার্থক–খুশী। ডাক্তার কিছুক্ষণ খুশীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে স্মিত হেসে বললেন, 'তোমার তো কোন অসুখ নেই, কী অষুধ দেব আমি? কথা শুনে সে বলে উঠল, 'তুমি ডাক্তার না ছাই! মাইনষের অসুখ ধরতে পার না, খালি বড় বড় কথা কও।' খিল-খিল শব্দের ঢেউ তুলে চলে গেল খুশী। কে জানে, এখন গিয়ে আবার কার উপর ভর করবে সে!

খুব সকালে নদীর তীর থেকে কয়েকটা পেইন্টেড স্নাইপ শিকার করে বাড়ি ফিরে চলেছি। নদীর পার ছেড়ে রাস্তায় ওঠার পরই দেখলাম খুশী এগিয়ে আসছে আমার দিকে। তার হাঁটার ভঙ্গি দেখে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম আমি। আমার ঠিক সামনে এসে সে বলে উঠল, 'তুই একটা নিষ্ঠুর মানুষ। খালি-খালি জীব-জানোয়ার আর পক্ষী মারস, আমি তোরে বলতাছি,

আর এইসব করিস না, ভাল হইয়া যা।' আমি তখন দুরন্ত শিকারী, শিকার ছাড়া কিছুই বুঝি না, শিকারে যে বাধা দিতে আসে তাকে মনে হয় জানের শত্রু। তাই ইচ্ছে করছিল খুশীকে কড়া একটা ধমক দেই, কিন্তু তা দিতে পারিনি কোন এক অজ্ঞাত কারণে। শুধু দ্রুত পাশ কাটিয়ে চলে এসেছিলাম। এই শিকারের কারণে খুশী আমাকে দু'চোখে দেখতে পারত না, বলতে গেলে আমাকে দেখলেই সে তেড়ে আসত।

১৯৮৮ সালের এক অবনত সন্ধ্যায় খুশীর সাথে আমার শেষ কথা হয়েছিল। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল সে। আমি তাকে বলেছিলাম, 'এই খুশী, রাত হয়ে আসছে, বাড়ি যা।' 'হেই ছেড়া, বাড়ি যামু না কই যামু হেইডা কী তোর চিন্তা করন লাগব?' এই ছিল খুশীর উত্তর। এরপর হন হন করে চলে গিয়েছিল সে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই খবর পেলাম, ছপ্পার মার কবরস্থান (কবরস্থানটা এই নামেই পরিচিত)-এর পাশে একটা মেয়ের লাশ পড়ে আছে। বিছানা ছেড়ে উঠে প্রায় দৌড়ে গিয়ে হাজির হলাম ঘটনাস্থলে। গোরস্থানের ঠিক পুবে গ্রামের একজন একটা পুকুর কাটাচ্ছিল, তখন-ও পর্যন্ত গর্ত করা হয়েছিল মাত্র আড়াই হাত। এলাকাটা লাল মাটির। দেখলাম সেই অসম্পূর্ণ পুকুরের উত্তর-পশ্চিম কোণে জমা হয়েছে বহু মানুষ। ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে নীচের দিকে তাকাতেই দেখলাম, লাল মাটির বুকে নীল শাড়ি পরা খুশী পড়ে আছে লাশ হয়ে। ঠিক যেভাবে চেপে ধরে গরু জবাই করা হয়, ঠিক সেভাবে হত্যা করা হয়েছে তাকে। লাশের দু'পাশের মাটিতে স্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে খুশীর নখের আঁচড়ের দাগ, তার দু'হাতের নখগুলোর অনেক গভীর পর্যন্ত ঢুকে গেছে লাল মাটি; বেঁচে থাকার আকুতি যেন আগুন-চিহ্ন হয়ে ফুটে আছে খুশীর দশটি নখে। লম্বা হয়ে পড়ে থাকা লাশের মাথাটা কাত হয়ে আছে পশ্চিম দিকে। লাল মাটির সঙ্গে লাল রক্ত মিশে অতি ভয়ঙ্কর এক দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে; যেন অমিততেজী সূর্যের একটা অংশ আকাশ থেকে নেমে এসে ঠাঁই নিয়েছে খুশীর গলার পাশে। শুধু গলা কেটে-ই ক্ষান্ত হয়নি ঘাতকরা, তারা খুশীর হাত-পায়ের রগ কেটেছে, রগ কাটা জায়গাগুলো ফাঁক হয়ে সাদা মাংস বেরিয়ে এসেছে বীভৎসরূপে।

এরপর এক সময় পুলিশ এল, তারা খুশীর নিথর-রক্তাক্ত দেহটাকে

চাটাই-বন্দী করে থানায় নিয়ে গেল।

এই নির্মম হত্যাকাণ্ড সুলতানপুর গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষকে স্তম্ভিত করে দিল। মেঘের মত এলোমেলো আর কচি পাতার মত কোমল এই কিশোরীকে কে বা কারা হত্যা করল?—এই প্রশ্ন ঘুরতে লাগল মানুষের মনে মনে। সে সময় সুলতানপুর ও এর পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে চরমপন্থী সর্বহারাদের দৌরাত্ম্য বেড়ে গিয়েছিল মারাত্মকভাবে। বেশ কয়েকজন নারী-ও খুন হয়েছিল তাদের হাতে। তাই কেউ কেউ ভাবল খুশীকে হত্যা করেছে সর্বহারারা। কিন্তু অনেকেই এ কথা মানতে পারল না। কারণ যেসব নারী সর্বহারাদের হাতে খুন হয়েছিল, তাদের প্রায় সবাই ছিল কুখ্যাত মক্ষিরাণী অথবা পুলিশের সোর্স। তাই সর্বহারাদের হাতে যে খুশীর মৃত্যু হয়নি, এটা অনেকাংশে সত্যি। বরং বলা যায় ঘাতকরা নিজেদের আড়াল করার জন্য খুশীকে হত্যা করেছে। সর্বহারাদের স্টাইলে; গলা ও হাত পায়ের রগ কেটে। অনেকে বলল, আসলে খুশী গ্যাং রেপের শিকার হয়েছিল, সে প্রায়ই সন্ধ্যার পর গ্রামের পথে একা একা ঘুরে বেড়াত। আর এভাবেই সে গ্রামের কিছু উচ্ছৃঙ্খল মদ্যপ্ যুবকের টার্গেটে পরিণত হয়। এরপর সুযোগ বুঝে খুশীকে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রথমে ধর্ষণ ও পরে হত্যা করে তারা। এসব কথা ও ধারণার পাশাপাশি মানুষের মধ্যে আর-ও একটি গুঞ্জন চলতে লাগল। গ্রামের গরীব-ধনী সবার বাড়িতেই খুশীর অবাধ যাতায়াত ছিল। অনেকের মতে এই অবাধ যাতায়াতের ফলে এসব বাড়ির কোন একজনের সঙ্গে খুশীর দৈহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং এক পর্যায়ে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। লোকটি ছিল প্রভাবশালী। আধাপাগল হলেও খুশী ঠিক-ই তার দৈহিক পরিবর্তন টের পেয়ে যায়। সে ওই লোকটিকে সব খুলে বলে। তার কথা শুনে লোকটি দিশেহারা হয়ে পড়ে, সে ভাল করেই জানে খুশীর মুখের কোন বাছ-বিচার নেই, অচিরেই সে এই কথা সবাইকে বলে দেবে, তখন তাকে বিয়ে করা ছাড়া তার কোন উপায় থাকবে না। তাই খুশীকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় সে এবং খুব তাড়াতাড়ি প্রচুর টাকা খরচ করে ভাড়াটে খুনী দিয়ে কাজ হাসিল করে।

সাধারণ মানুষের এসব ধারণার পেছনে কোন সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল না, এমনকী খুশীর বাড়ির লোকজনও সুনির্দিষ্ট কাউকে আসামী করে মামলা দায়ের করতে পারেনি। অনেকে বলে, তারা আসলে অদৃশ্য এক শক্তির

চাপের শিকারে পরিণত হয়েছিল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত খুশী হত্যাকাণ্ডের কোন সুরাহা হয়নি। যে হিংস্র বুনো কুকুরেরা অথবা যে মানুষরূপী কালকেউটে খুশীর কুসুম কোমল দেহটাকে বীভৎস এক মরদেহে পরিণত করেছিল, তাদের বা তার কোন বিচার হয়নি।

কালের ধুলোর ধূসর স্রোত বেয়ে পার হয়ে গেল পাঁচটি বছর। ১৯৯৩-এর সেপ্টেম্বর মাস। সে রাতে জোছনার প্লাবনে নেয়ে উঠেছিল চরাচর প্রকৃতি। রাত এগারোটার কিছু সময় পর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিল ফুরাদ। শান্ত গ্রামের শীতল বুক ধরে সে এগিয়ে চলছিল সামনের দিকে। খোলা মাঠ পেরিয়ে ফুরাদ এক সময় প্রবেশ করল ছোট-বড় বৃক্ষে পরিপূর্ণ একটা স্থানে। এটাই ছপ্পার মার গোরস্থান। প্রায় প্রতি রাতে-ই সে এ পথ দিয়ে যাতায়াত করে। গোরস্থানের ঠিক পুবে ছোট্ট একটা পুকুর। অতি অপরূপ চন্দ্রালোকের খেলা চলছে পুকুরের বুকে। পুকুর থেকে কিছুটা দক্ষিণে প্রাচীন এক চূড়ুল গাছ। পুকুরের পাশ দিয়ে কিছুটা সামনে এগিয়ে যেতেই ফুরাদের দৃষ্টি আটকে গেল চূড়ুল গাছের গোড়ায়, অদ্ভুত সুন্দর পোশাক পরা এক নারী মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। পরে, ফুরাদকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী ধরনের পোশাক পরা ছিল তার গায়ে?' উত্তরে সে বলেছিল, 'সেই পোশাকের বর্ণনা দেয়ার ভাষা আমার জানা নেই, শুধু এটুকু বলতে পারব, পোশাকের জরির কাজগুলো অন্ধকার ভেদ করে অতি তীব্র আলোকবিন্দুর মত জ্বলছিল।' গভীর রাতে গোরস্থানের পাশে অদ্ভুত পোশাক পরা নারী মূর্তি দেখে তার ভয় পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সে ভয় পেল না; যেন অতি অপরূপ এক সৌন্দর্য তার সব ভয়কে শুষে নিল। সে সোজা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল নারী মূর্তির সামনে, বলল, 'কে তুমি? এই গভীর রাতে এখানে কী করছ?' আবছা অন্ধকারে ঢাকা একটা মুখ থেকে বেরিয়ে এল কিছু শব্দ, 'আমারে যে তুমি দেখছ, এই কথা কাউরে বলবা না, আগামীকাল রাতে-ও ঠিক এইখানে তুমি আমার দেখা পাইবা।' ফুরাদ এরপর নারীমূর্তিকে আর-ও অনেকগুলো প্রশ্ন করল, কিন্তু কোন উত্তর পেল না। কিছু স্তম্ভিত সময় কেটে গেল, এবার নারী মূর্তি চূড়ুল গাছের গুঁড়ি ছেড়ে হাঁটতে শুরু করল পুকুরের দিকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তীব্র ভয়ে কেঁপে উঠল ফুরাদের শরীর, সোজা বাড়ির দিকে দৌড়াতে লাগল সে। বাড়ির উঠানে এসেই চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। মাথায়

অনেক পানি ঢালার পর জ্ঞান ফিরল তার এবং সে সবাইকে খুলে বলল ঘটনাটা।

গ্রামের অনেকেই দেলোয়ারকে সাহসী যুবক হিসাবে জানে। আসলেই সে সাহসী। বিশেষ করে রাতের বেলা নির্ভয়ে একা একা পথ চলায় তার কোন জুড়ি নেই। এই দেলোয়ার এক গভীর রাতে, নদী থেকে মাছ ধরে ছিপ হাতে বাড়ি ফিরছিল। তাকেও বাড়ি যেতে হয় গোরস্থানের পাশ দিয়ে। যতবারই সে এ পথ দিয়ে যায় ততবার-ই মনে মনে হাসে আর বলে, গ্রামের মানুষ গভীর রাতের গোরস্থানকে কত-ই না ভয় পায়! অথচ কী নির্ভয় চিত্তে হেঁটে চলেছে সে। সেই নক্ষত্র নিয়ন্ত্রিত রাতে কোটি তারার দীপ জ্বলছিল আকাশে, মাঠ প্রান্তর তাদের ছোঁয়ার উজ্জ্বলতা পেলে-ও গোরস্থানের বুক বরাবরের মতই তারকালোক থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে রইল। বোয়াল ধরার ছিপ হাতে খোলা প্রান্তর পেরিয়ে হন হন করে গোরস্থানের কালিগোলা অন্ধকারে প্রবেশ করল দেলোয়ার। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে পুকুরটাকে পাশ কাটিয়ে প্রায় বিশগজ সামনে এগিয়ে যাওয়ার পরই থমকে দাঁড়াতে হলো তাকে। চূড়ুল গাছের নীচে সাদামত একটা কী যেন দেখা যাচ্ছে! জীবনে প্রথম দেলোয়ার তার মনের গহীনে অন্য ধরনের এক অনুভূতির স্পর্শ টের পেল। কিন্তু পিছু হটার পাত্র নয় সে, আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। গাছের ঠিক পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে ঝকঝক করে জ্বলছে একটা সাদা শাড়ি, পরিহিতার অবয়ব মিশে আছে ঘোর অন্ধকারে। দেলোয়ার জীবনে বহু সাহসী ঘটনা ঘটিয়েছে, দেখেছে বাস্তব জীবনে ঘটে যাওয়া অনেক ভয়ঙ্কর ঘটনা। কিন্তু এমন দৃশ্য দেখার কথা কোনদিন সে কল্পনা-ও করেনি। তার মাথার ভিতর চিন্তার ঝড় বয়ে চলল, মনটাকে বেঁধে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারল না সে, ভয়ের নদীর দিকে ধাবিত হতে লাগল তার সমস্ত সত্তা। পা দু'টো যখন তার ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করল, ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকারের সুর হয়ে বেজে উঠল নারী কণ্ঠের ঝংকার, 'এই দেলোয়ার, তোমার ত জানি অনেক সাহস, আর একটু কাছে আস না, আমি দুইডা কথা কমু তোমার লগে।' তীব্র ভয়ে শিউরে উঠল দেলোয়ারের সমস্ত শরীর, ভাবল কাছে গেলে-ই গোরস্থানের এই প্রেত তার ঘাড় মটকে দেবে। তাই সামনে এগিয়ে যাওয়া মানে ঘোর বিপদে ঝাঁপ

দেওয়া। এখন বাঁচার একটাই উপায়, পিছু ফিরে দৌড় দেওয়া, তা-ই করল সে এবং দৌড় দেওয়ার ঠিক আগে শুনতে পেল তীব্র হাসির শব্দ; স্পষ্ট তিরস্কারের সুর মিশে আছে যাতে। সে রাতে দেলোয়ার দৌড়ে গিয়ে হাজির হয়েছিল বাজারে তার এক আত্মীয়ের দোকানে, বাকী রাতটা সেখানে কাটিয়ে বাড়ি ফিরেছিল পরদিন সকালে।

অসুস্থ মেয়ের জামাইকে দেখে বাড়ি ফিরছিল দুখাই মণ্ডল। তিন গ্রাম পার হয়ে তিনি পা রাখলেন নিজের বাড়ির রাস্তায়, রাত তখন দশটা। এই রাস্তা ধরে চলতে গেলে-ই তার মনে পড়ে যায় বহু আগের একটা রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা। তখন সে যুবক। এক রাতে বাজার থেকে এ পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছিল দুখাই, তার এক হাতে ছিল টর্চ অন্যহাতে কাঠের হাতলওয়ালা একটা ছাতা। চলতি পথে হঠাৎ একটা কালো গোখরো তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। দুখাই তৎক্ষণাৎ পাথরের মত স্থির হয়ে আলো ফেলল সামনের দিকে, জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠল পলকহীন দু'টো ভয়ঙ্কর চোখ। বিপদে সাহস না হারানো দুখাই-এর পুরনো অভ্যাস, বরং বিপদকে মোকাবেলা করতেই অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। তাই সাপ তাকে আঘাত করার আগেই তিনি ছাতার হাতল দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন গোখরোর উদ্যত ফণায়, আঘাতের তীব্রতায় সাপের ফণা মাটিতে লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুখাই লাফিয়ে পড়ে তার শক্ত রাবারের তৈরি নাগরা জুতো দিয়ে সাপের মাথা চেপে ধরল, সাপ-ও প্রচণ্ড শক্তিতে তার পায়ে পেঁচিয়ে গেল; যেন তীব্র পেষণে সে ভেঙে ফেলতে চাইল দুখাই-এর পায়ের হাড়। কিন্তু মাথায় একজন তরতাজা যুবকের শরীরের সমস্ত ভার নিয়ে গোখরো বেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে পারল না, তার শিথিল দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। দুখাই মরা সাপটাকে পা থেকে খুলে রাস্তার পাশে রেখে আবার যখন বাড়ির পথ ধরল ঠিক তখনই তার কানে ভেসে এল ভয়ঙ্কর ফোঁস ফোঁস শব্দ। সে বুঝতে পারল, মরা সাপটার সঙ্গী তাকে আক্রমণ করতে আসছে। এবার-ও রুখে দাঁড়াল সে এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে শুধুমাত্র ছাতা দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলল ভয়ঙ্কর মৃত্যুরূপী প্রতিহিংসাপরায়ণ সরীসৃপটাকে। এবার দুখাই বাড়ি ফেরার চিন্তা বাদ দিয়ে মৃত গোখরো দু'টোকে নিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলো চেয়ারম্যানের বাড়ি। চেয়ারম্যান বিরাট দুই মৃত গোখরো দেখে এবং দুখাই মণ্ডলের মুখে সমস্ত ঘটনার বিবরণ শুনে, সাহসিকতার

পুরস্কার স্বরূপ তাকে দশটি টাকা দিলেন। সে আমলে দশ টাকার অনেক দাম। এরপর থেকে দুখাই যতবারই রাতের বেলা এ পথ দিয়ে চলেছে ততবারই নিজেকে তার এই রাস্তার রাজা মনে হয়েছে। আজ এই বৃদ্ধ বয়সেও সেই একই মনোভাব নিয়ে হাঁটছে সে। চলতি পথে হঠাৎ টিপ টিপ বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। আষাঢ় মাস, তাই ছাতা সঙ্গে নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। ছাতা মেলে জোর কদমে হাঁটা ধরল সে। একটু পর পর আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, হঠাৎ তীব্র শব্দে বাজ পড়ল কাছে কোথাও। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুষলধারে বৃষ্টি নামবে, হাঁটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল সে। গোরস্থান সংলগ্ন পুকুরের পাশ দিয়ে হেঁটে চূড়ল গাছের নীচে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন অন্ধকারের হাহাকার হয়ে নারীকণ্ঠের বিলাপসুর ভেসে এল তার কানে, থমকে দাঁড়াল রাস্তার রাজা। বিদ্যুতের চমকে একটু পর পর চারদিক দিনের মত ফর্সা হয়ে যাচ্ছে। সে আলোয় ভর করে দুখাই-এর সন্ধানী চোখ সার্চ লাইটের মত চারদিকে ঘুরতে লাগল ক্রন্দনরতার খোঁজে। কিন্তু গাছের আশপাশের কোথাও তাকে দেখা গেল না। এদিকে বিলাপের শব্দ থেমে নেই; বৃষ্টি ধারার মত শীতল-করুণ সুর তার। শব্দের উৎস খোঁজ করতে করতে হঠাৎ দুখাই-এর চোখ চলে গেল উপরের দিকে। চমকে উঠল বিদ্যুৎ, সেই সাথে এক ঝলক রক্ত ঝলকে উঠল দুখাই-এর বুকের ভিতর। মাটি থেকে হাত দশেক উপরের একটা ডালে পা দুলিয়ে বসে আছে শাড়ি পরা এক রমণী, শাড়ির রঙ ঠিক কী, তা বোঝা যাচ্ছে না। এবার নারীমূর্তি মাথা নিচু করে তার দিকে তাকিয়ে কান্নার সুরে বলে উঠল, 'দুখাই দাদা, ও দুখাই দাদা, আমি একটা গল্প কমু, হুনবা তুমি?' দুখাই-এর শরীরের সবক'টা রোম ততক্ষণে দাঁড়িয়ে গেছে, দেহজুড়ে শুরু হয়েছে প্রচণ্ড কাঁপুনি। বিজ্ঞবুড়োর মন বলে উঠল, 'পালা দুখাই, এখানে থাকলে হয় তুই মরবি, না হয় সারারাত অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবি।' মনের নির্দেশ মানতে দুখাই ঝট করে মাথা নিচু করে-ই দৌড় শুরু করল, দৌড়াতে দৌড়াতে সে গিয়ে পড়ল গোরস্থানের অদূরের হুমায়ুন মাস্টারের বাড়িতে। তার চিৎকারে বাড়ির সবাই জেগে উঠলেও তারা কেউই খুব অবাক হলো না তার কথা শুনে। কারণ ইদানীং প্রায় রাতেই গোরস্থান থেকে ভয় পেয়ে মানুষ এসে আশ্রয় নেয় তাদের বাড়িতে।

শুধু ফুরাদ কাজী, দেলোয়ার আর দুখাই মণ্ডল নয় সেই নারী মূর্তি

বিভিন্ন বেশে দেখা দিতে লাগল রাত্রিগামী মানুষের সামনে। এবার নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হলো এ নিয়ে। বেশির ভাগ মানুষ-ই বলল, খুশীর অতৃপ্ত আত্মা নারী মূর্তির রূপ নিয়ে মানুষকে ভয় দেখাতে শুরু করেছে। অন্য এক দল বলল, 'খুশীর অতৃপ্ত আত্মার যদি মানুষকে ভয় দেখানোর ইচ্ছে থাকত, তবে গত পাঁচ বছর সে নীরব ছিল কেন? প্রশ্নটা সত্যি জটিল!'

গ্রামের বিটি পাড়া, কাজী বাড়ি, বড় বাড়ি (এসব বাড়ির লোকজনই সাধারণত রাতের বেলা এই গোরস্থানের পার্শ্ববর্তী পথ দিয়ে চলাচল করে)-এর মানুষদের কাছ থেকে জানা যায়, ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ওই নারী মূর্তি ঘনঘন মানুষের সামনে দেখা দিয়েছে। এরপর থেকে কমে এসেছে তার দেখা দেওয়ার পালা। এখন-ও বছরে দু'একবার চূড়ুল গাছের নীচে দেখা যায় তাকে।

এই পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলো বরাবরই রহস্যের আধারে ঢাকা থাকে। বিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই অচল এসব ঘটনার কাছে। এখানে বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, যারা যারা সেই নারী মূর্তিকে দেখেছে তাদের সবাই অডিটরি আর ভিজিউয়্যাল, হ্যালুসিনেশনের এক বিশেষ ধরনের সংমিশ্রণের শিকার। আবার অন্যদিক দিয়ে বলা যায়, খুশীর অতৃপ্ত আত্মা নারীরূপে মানুষের সামনে হাজির হয় কিছু বলার জন্য, হয়তো বা সে বলতে চায়, এলোমেলো শুভ্র মেঘের মত এক জীবন ছিল আমার, গন্ধরাজের পাপড়ির মত কোমল আমার স্বপ্নেরা উড়ে বেড়াত বক পাখির ডানায় ভর করে। এই যে তোমরা, আমার গ্রামের মানুষরা, তোমাদের আমি কতই না ভালবাসতাম, তবু তোমাদেরই নির্মমতায় আমার সব আলো নিভে গেল, কিন্তু তোমরা কি জানো, শীতলক্ষ্যার শীতল জল আজও ডুকরে কাঁদে অকালে ঝরে যাওয়া এক ফুলের জন্য, এখনও বাঁশঝাড়ের সেই সাদা বকেরা বিলাপের হাহাকারে কেঁপে ওঠে তার শোকে; রাতের শিশির কণারা তোমাদেরই দোসরদের সেই প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতার কথা স্মরণ করে প্রচণ্ড লজ্জায় মুখ লুকায় ঘাসের বুকে। ছিঃ ছিঃ কী ভীরু তোমাদের মন, শুধু পালিয়ে বাঁচতে চায়। তোমাদের একজন অন্তত আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পার, 'তুমি আর কেউ নও, তুমি রক্তের নদীতে হারিয়ে যাওয়া আমাদের সেই খুশী, বল, কে বা কারা তোমার হন্তারক?' তোমরা তা পার না, তোমাদের বুকে সে সাহস নেই।

তাই মানো আর না মানো, শুনে রাখো, যে বা যারা আমাকে হত্যা করেছে তারা যেমন অপরাধী, তোমরাও তাই। যতদিন এ পৃথিবী থাকবে, যত দিন তারারা মিটমিট করবে, যত দিন শীতলক্ষ্যার স্রোত বহমান থাকবে, ততদিন, ততদিন খুশী হত্যার দায় বয়ে বেড়াতে হবে সুলতানপুরের প্রত্যেক মানুষকে।

সরওয়ার পাঠান

সমাপ্ত